বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প

জগদীশ ভট্টাচার্যের ভূমিকা সম্বলিত

সন্ধ্যা প্রকাশনী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ
বৈশাখ ১৩৭১
প্রকাশক :
শ্রীগোরাচাঁদ দত্ত
সন্ধ্যা প্রকাশনী
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক ঃ
হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২৪, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা – ৭০০ ০০৯

সূচী

ভূমিকা

১

'বনফুল' বাংলা সাহিত্যে একটি অতি প্রিয় নাম। লোককান্ত। রসিকচিত্ত-চমৎকারকারী। সাহিত্যের চতুরঙ্গ-বর্ত্মে কলাকুশল জীবন-শিল্পী তিনি। কাব্যে নাটকে উপন্যাসে ছোটগল্পে তাঁর সৃষ্টিকর্ম যেমন অক্লান্ত তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসাও তেমনি অন্তহীন। প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর লেখনী অজস্রবর্ষী। শিল্পরূপায়ণে—নব নব রীতি ও রূপনির্মাণে তাঁর তুলনা নেই। জীবনের গবেষণাগারে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের যেমন তাঁর শেষ নেই, সাহিত্যের রূপ-কর্মশালায় বাণীলক্ষ্মীর নব নব রত্নাভরণ-রচনাতেও তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। শুধু তাঁর উপন্যাসের কথাই যদি ধরা যায়,—'তৃণখণ্ড', 'বৈতরণী-তীরে', 'কিছুক্ষণ', 'মৃগয়া' থেকে আরম্ভ করে 'দ্বৈরথ', 'নির্মোক', 'রাত্রি', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'নঙ্‌ তৎপুরুষ,' 'অগ্নি', 'স্বপ্নসম্ভব,' 'জঙ্গম', 'ডানা', 'মানদণ্ড' পর্যন্ত ছোট-বড় মাঝারি হরেক রকমের বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। উৎকর্ষের বিচারে সবগুলিই যে সমান আসন পাবে এমন কোন কথা নেই; কিন্তু একটি বিষয় চক্ষুষ্মান পাঠকমাত্রকেই বিস্ময়ের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে রচিত। উপন্যাসের সংখ্যা তাঁর অল্প নয়, কিন্তু শিল্পরীতি ও রূপকর্মের দিক দিয়ে পুনরাবৃত্তি তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও নেই। যুগান্তকারী প্রতিভার পক্ষেও এ শক্তি দুর্লভ। বস্তুত বিচিত্ররূপী কারুশিল্পী হিসাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'বনফুলে'র কীর্তি অতুলনীয়।

সাহিত্যের চতুরঙ্গ-বর্ত্মে তাঁর সার্থক আত্মপ্রকাশের কথা বলা হয়েছে। কাব্যে—বিশেষত প্রথমদিককার রঙ্গব্যঙ্গমিশ্র হাস্যসরস কাব্যে তাঁর পরিহাস-রসিক চিত্তের সমধিক পরিচয় পাওয়া যাবে। নাট্য-সাহিত্যে—বিশেষত জীবনী-নাট্য-রচনায় মধুসূদন-বিদ্যাসাগরের স্রষ্টা হিসেবে তাঁকে নবযুগের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু কথা-সাহিত্যেই তাঁর শক্তিমত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। অবশ্য সেক্ষেত্রেও ঔপন্যাসিক 'বনফুল' আর ছোটগল্প-স্রষ্টা 'বনফুলের' মধ্যে পার্থক্য অনেক। উপন্যাস তাঁর নিত্যনবায়মান শক্তিমত্তার

সাফল্যমণ্ডিত, কিন্তু ছোটগল্পেই রয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর। উপন্যাসে কত বিচিত্র মানুষ কত বিচিত্র কাহিনী; কত বিচিত্র ধরনে তাদের কথা বলার সজ্ঞান সচেতন প্রয়াস। জীবনকে শিল্পে ধরে রাখার কত নতুন নতুন প্রয়োগনৈপুণ্য! সাহিত্য-শিল্পীর সেখানে কৃতিত্ব অপরিসীম। কিন্তু সৃষ্টিপ্রেরণা ও সৃষ্টিধর্ম যেখানে অপৃথগ্‌যত্নসম্ভূত সেখানেই বাণীপ্রকাশ চরমোৎকর্ষ লাভ করে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টাও সেখানে স্বয়ংপ্রকাশ। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই 'বনফুলের' এই আত্মপ্রকাশ সবচেয়ে সার্থক ও সহজ হয়ে উঠেছে। এখানেই তাঁর জীবনদর্শন সম্যক্ স্ফূর্তি পেয়েছে। তাঁর শিল্পরীতি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতীক হতে পেরেছে।

২

ছোটগল্প এক হিসেবে গীতিকবিতার সঙ্গে তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রেই মুহূর্তলীলার মধ্যে শাশ্বত জীবনরহস্যের দ্যোতনা অভিব্যঞ্জিত হয়। তফাতের মধ্যে এই যে গীতিকবিতায় কেবল কবিমানসের নিজের ভাবময় মুহূর্তগুলোরই প্রকাশ; ব্যক্তি সেখানে একটিই, অনুভূতিও স্বভাবতই আত্মনিষ্ঠ। কিন্তু ছোটগল্পে বহুব্যক্তির বহুচিত্রিত মুহূর্তের বহুনিষ্ঠ ভাব-ভাবনার উন্মেষ। স্বভাবত রূপে বর্ণে স্বাদে ও গন্ধে ছোটগল্পের বৈচিত্র্য অন্তহীন। জীবনসত্য সেখানে বহুরূপী হয়ে স্রষ্টার কাছে ধরা দেয়। 'বনফুলে'র ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে। কখনো তা সুন্দর, কখনো কুৎসিত, কখনো তা উদার, কখনো তা নীচ, কখনো আত্মসুখপরায়ণতায় অতিসংকীর্ণ, কখনো পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত। মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয়, আবার নরকের শয়তানও নয়। মানুষ মানুষই। সে ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচরণ করে; আবার ভুলের মাশুলও তাকে দিতে হয়, পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় মহার্ঘ্য মূল্যে। সব কিছু মিলিয়েই মানবজীবন, আবার তাই মানুষের নিয়তি। অদ্ভুত কিন্তু অত্যাশ্চর্য। 'বনফুল' মানুষের এই জীবনকে তার যথাযথ মূল্যে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোনো অতিন্দ্রিয় মোহ ছিল না, তেমনি কোনো বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরক্তি ছিল না। দার্শনিক পরিভাষায় যাকে 'তটস্থ দৃষ্টি' বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। জীবনসত্যের নিরীক্ষায় কোনো পূর্বধার্য তত্ত্বের অনুশাসন স্বীকার না করে সর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে বহু পরীক্ষা ও বহু পর্যবেক্ষণের

সাহায্যে জীবনকে জানার যে পদ্ধতি [illegible]
ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এদিক দিয়ে তাঁর মনের গড়ন ছিল দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকের। বস্তুত আমাদের সাহিত্যে তাঁকেই প্রথম পরিপূর্ণ বিজ্ঞাননিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী লেখক বলা যেতে পারে। অভিজ্ঞতাবাদ বা Empiricism-এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই তাঁর জীবনচৈতন্য গড়ে উঠেছে। জীবনকে অভিজ্ঞতার মধ্যে যতটুকু জেনেছেন, ততটুকুকেই তার যথার্থ-মহিমায় তিনি প্রকাশ করেছেন। স্বভাবতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র দিনদিন প্রসারিত হয়েছে, জীবনসত্যও সঙ্গে সঙ্গে নব নব রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর কাছে। রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে এই ক্রমশ-উদ্ভিদ্যমান জীবনসত্যের স্বীকৃতিই তাঁর শিল্পি-মানসের বৈশিষ্ট্য। এমন কি তিনি তাঁর মনকে চিরমুক্ত রেখেছেন বলেই ব্যবহারবাদে নির্ভরশীল হয়েও মানুষের মনোলোকের রহস্যানুভূতির অভিজ্ঞতাকেও তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যে জীবনরহস্য যথা মানবপ্রকৃতির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেখে তাঁকে Naturalist বা প্রকৃতিবাদী বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত ফরাসী সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ জোলা বা বালজাকের সূচনায় একটা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সাহিত্যে তার মূল্যও বড় কম নয়। জীবনকে তার আপন স্বরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারাতেও লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 'বনফুল' জোলা বা বালজাক বা মোপাসাঁ-তন্ত্রের লেখক নন। তাঁকে জীবনের শুধু রূপকারই বলা যায় না, তিনি জীবনের ব্যাখ্যাকারও বটেন। আর সেখানেই তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর সৃষ্টিকর্মে আত্মপ্রকাশ করেছে।

৩

'বনফুলে'র এই ব্যক্তিত্ব একটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ থেকেই উদ্ভূত। তাঁর কল্পনামূলে জীবনের কোনো অতি বাস্তব আদর্শের প্রতি আসক্তি ছিল না। কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে উৎসারিত প্রাণপ্রাচুর্যময় জীবন-চৈতন্য তাঁর শিল্পি-মানস সমুদ্ভাসিত। 'বনফুল' সাহিত্যে এই স্বাস্থ্য ও প্রাণবত্তারই উদ্গাতা। তাঁর কল্পনালোকে একটি পূর্ণমানবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেহধারী প্রাকৃতি-নিয়মশাসিত মানুষের পঞ্চসত্তা—অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময় সত্তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবিধানে যে পূর্ণমানবতা তাই তাঁর নিত্যধ্যেয়। এই মানবতাবাদই তাঁর জীবনবাদ, একে তাঁর জীবনবেদও বলা যেতে পারে। মানবদেহে প্রাণলীলার অকুণ্ঠ ও বলিষ্ঠ স্বাভাবিক প্রকাশকে তিনি প্রণতি

জা।নয়েছেন। কিন্তু যেখানে তার অত্যাচার বা অনাচার ঘটেছে, দেখা দিয়েছে জীবনের রুগ্ন ও ব্যাধিত রূপ, যেখানে মানুষের দুর্বলতা ও মূঢ়তায়, তার অত্যাসক্তি ও অতিলোলুপতায় প্রাণধর্ম স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়ে হয়েছে বিকারগ্রস্ত ও স্বভাববিচ্যুত, সেখানেই তাঁর প্রাণপুরুষের ওষ্ঠাধরে দেখা দিয়েছে ঘৃণাদ্বেষক্রোধপ্রদীপ্ত বক্রহাসি। সে হাসি কখনো ভ্রূকুটি-কুটিল, কখনো ওষ্ঠাধর-প্রান্তলগ্ন ; কখনো তাতে আছে ক্রোধোদ্দীপ্ত রুদ্রের বহ্নিদাহন, কখনো আছে করুণাকাতর স্রষ্টার কমনীয় অনুকম্পা। মানুষের স্খলনে ও পতনে, তার আচার-আচরণের মূঢ়তায় ও আত্যন্তিকতায়, তার দুর্নিবার নিয়তি ও স্বকর্মার্জিত দুর্গতিপ্রাপ্তিতে স্রষ্টার এই হাসি 'বনফুলে'র ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ। সাধারণের প্রতি করুণা ও প্রেম যেখানে বড় সেখানে তা প্রসন্ন 'হিউমার' রূপেই দেখা দিয়েছে, আর জীবনবোধের নিষ্ঠা যেখানে জাগ্রত সেখানে 'স্যাটায়ারে'র কশাঘাত হয়ে উঠেছে নির্মম। কশাঘাত কথাটি অবশ্য সুপ্রযুক্ত হল না। বঙ্কিমচন্দ্র একদা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের স্যাটায়ারের আলোচনা করতে গিয়ে ডাক্তারের যে সরু ল্যান্সেটখানির তুলনা দিয়েছিলেন, 'বনফুলে'র ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য। তিনি যে কখন সেই সূক্ষ্ম অস্ত্রখানি কুচ করে ব্যথার স্থানে বসিয়ে দেন তা অনেক সময় ধরাই যায় না, কিন্তু ক্ষতমুখে হৃদয়ের শোণিত অনিবার্য বেগেই বেরিয়ে আসতে থাকে। সমাজবৃক্ষে কোথায় কোন্ বাঁদর বসে আছে, তাঁর সর্বদর্শী দৃষ্টিতে তাও এড়িয়ে যাবার যো নেই, এবং ল্যাজসুদ্ধ তার অবিকল ছবিটি দুচারটি মাত্র আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। অবশ্য যে অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বা দীনবন্ধু 'রিয়ালিস্ট' ও 'স্যাটায়ারিস্ট' সেই একই অর্থে 'বনফুল'-কেও সমগোত্রভুক্ত করলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাতনামা মার্কিন হাস্যরসিক অধ্যাপক স্টিফেন লিককের একটি উক্তি বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 'হাস্যরসকে আমি যে ভাবে দেখি',—এই শিরোনামায় রচিত নিবন্ধে অধ্যাপক লিকক্ বলেছেন, "The World's humour in its best and greatest sense, is perhaps the highest product of our civilisation. One thinks here not of the mere spasmodic effects of the comic artist or the blackface expert of the vaudeville show, but of the really great humour which, once or twice in a genearation at best,

illuminates and elevates our literature. It is no longer depended upon the mere trick or quibble of words, or the odd and meaningless incongruities in things that strike us as 'funny.' Its basis lies in the deeper contrasts offered by life itslf : the strange incongruity between our aspiration and our achivement, the eager and fretful anxieties of to-day that fade into nothingness to-morrow, the burning pain and the sharp sorrow that are softened in the gentle retrospect of time***. And, here, in its larger aspect, humour is blended with pathos till the two are one, and represent, as they have in every age, the mingled heritage of tears and laughter that is our lot on earth."

বলাই বাহুল্য, 'বনফুল' লোক হাসাবার জন্য কৌতুকাবহ ঘটনা সৃষ্টি কিংবা রসিকতাপূর্ণ বাগ্‌জাল বিস্তারের চেষ্টা করেননি। যে হাস্যরসকে 'আমাদের সভ্যতার মান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি যুগে যা একবার কি দুবার মাত্র সাহিত্যিককে উদ্দীপিত ও উন্নীত করে, তাঁর হাস্যরস সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সে হাসি তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেই অধিবাসিত হয়ে সাহিত্যদেহে লাবণ্যের মত বিচ্ছুরিত হয়েছে। এর মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শনটি বিধৃত ও বিস্ফারিত। জীবনরঙ্গশালায় যে ট্রাজেডি মানুষের নিয়তি, তারই প্রত্যক্ষদর্শনের ফলে চিত্তে যে ভীতি ও করুণার আত্যন্তিকতা ঘটে, এ হাসি নাটকীয় 'ক্যাথারসিসে'র মত সেই আত্যন্তিক ভাবাবেশ থেকে রসিকের মোহমুক্তি ঘটায়, এবং সেই মুক্তি-পথেই জীবনের গভীরতম সত্যে উপলব্ধি সম্ভব করে তোলে।

৪

বক্তব্য এবার দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিশদ করা যাক। 'বনফুলে'র জীবনাদর্শটিকে বোঝবার জন্যে 'মানুষ' গল্পটি গ্রহণ করা যেতে পারে। গঙ্গাবক্ষে অস্তায়মান সূর্যের রশ্মিচ্ছটায় ভাবাবিষ্ট চোখে পৃথিবীটাকে একটি স্বপ্নালোক বলে মনে হয়। তৃণাঙ্কিত শ্যামল তীরে দেবালয়, রোমন্থনরত নধরদেহ গাভী, মুদিতনয়ন মার্জার, নহবতে পুরবীর আলাপ ;—সবকিছু মিলিয়ে কি সুন্দর এই পৃথিবী! কিন্তু

বাস্তবতার আঘাতে এই স্বপ্নের ঘোর কাটলে ভাবষের আরেকটা রূপ চোখে পড়ে। দেবালয়ের স্বর্গীয় পরিবেশের পাশেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত একটি লোক আর স্বাস্থ্যবতী এক যুবতী—ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে—একই উদ্দেশ্যে। ক্ষুধার অন্ন চাই, ভিক্ষা তাদের ব্যবসায়; সে ব্যবসায়ে একজন মূলধন করেছে ব্যাধিটাকে, আরেকজন যৌবনকে। দেখা গেল মুদিতনয়ন মার্জারটি তপস্যায় রত ছিল না, ছিল ওৎ পেতে। ওটা তার ইঁদুর ধরার ছলমাত্র। মাতৃস্তনাভিমুখী গোবৎসটিকে বঞ্চিত করে নধরদেহ গাভীর দুগ্ধ দোহন করছে মানুষ নিজের প্রয়োজনে। ইঁদুরের চিৎকারে আর গোবৎসের আকুতিতে সন্ধ্যাকাশের শান্তি বিঘ্নিত হল। কিন্তু ওটাও প্রকৃতির একদিক মাত্র। সদ্যমৃতবৎসা জননী অন্যের নবজাত সন্তানের কল্যাণ কামনা করছে। বহুবাধাসত্ত্বেও সতী মৃত-স্বামীর চিতায় পুড়ে মরছে, বহুবার বিফল হয়েও এভারেস্টে দুঃসাহসীর অভিযান বন্ধ হচ্ছে না। কিন্তু ওখানেও শেষ নয়, স্বার্থপর মানুষের কাছে ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে তার স্বার্থসিদ্ধিই বড়, তার সৌন্দর্য-চেতনাকেও ছাপিয়ে ওঠে তার সামান্যতম জৈবতৃপ্তি। তাই ছাদে উঠে জ্যোৎস্না পুলকিত রজনীর সৌন্দর্য উপভোগের আনুকূল্যের জন্য প্রয়োজন হয় সিগারেটের ধোঁয়ার নেশা। উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রেখে সিগারেট কেনার জন্যে নেমে যেতে হয় গলির মোড়ে। এই আকাশ ও গলি, এই সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুঃসাহসী মহৎ প্রেরণা ও আত্মরত প্রাণধারণের গ্লানি,—এরই নাম মানবজীবন, স্বর্গ ও নরককে একই সঙ্গে বুকে ধরে এই যে নিত্যপ্রকাশমানা প্রকৃতি—এরই নাম মানুষের পৃথিবী।

এই পৃথিবীতে যাকে 'বনফুল' মানুষের নিয়তি বলতে চান, এবার তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে 'হাসির গল্প' নামক রচনাটিকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'হাসির গল্পে'র নায়ক হরিহরের জীবনটিতে করুণ রস যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিজের অসুস্থ অসুন্দর দেহটি ব্যাধিজর্জর, পাশেই একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত, বারান্দায় আর একটি শিশু ক্রন্দনরত, গৃহিণী রণচণ্ডী, দ্বারে পাওনাদার-মুদির অশ্রাব্য কটূক্তি। এই পরিবেশে হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসে গরম জলে পা দুটি ডুবিয়ে 'ফুটবাথ' নিতে নিতে হরিহর কাগজকলম নিয়ে গল্প লিখতে বসেছেন। অসম্ভব মাথা ধরেছে। বাঁ হাতে রগ দুটি টিপে ধরে হরিহর নিমীলিত লোচনে চিন্তা করতে লাগলেন। আজই লিখে দিতে হবে। সম্পাদক মহাশয় তাগিদ দিয়েছেন। নিজের তাগিদও

প্রবলতর। ভ্রুকুঞ্চিত করে হরিহর একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবতে লাগলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁর নাম।

ভাষ্য নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান সংকলনের সর্বপ্রথম রচনাতেই ভাষ্য লেখক নিজে করে রেখেছেন। শৌখিন বাবুটির হাতে অমানুষিক জর্জরিত অন্ধ বোবা ভিখারিটির মতই তো মানুষের অবস্থা! অমোঘ নিয়তির হাতে মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে, গা-ময় কাদা, নিষ্ঠুর প্রহার-কর্তার দিকে কাতরমুখে হাত দুটি জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। 'ক্যানভাসার' গল্পেরও ঐ একই বিশ্বরূপদর্শন। কাত্যায়নীর শৌখিন শাড়ির শখ মেটাতে অক্ষম বেকার ভৈরব যখন সমস্ত বিবিয়ানা আর বিলাস-লালসার ওপর অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে তখন সেখানে দাঁতের মাজনের ক্যানভাসার হীরালালের আবির্ভাব। দীনদরিদ্র পল্লীর এই প্রলোভনকে দেখে ভৈরব তেলেবেগুনে জলে উঠল। ক্যানভাসার যখন তার শুভ্রসুন্দর দশনপংক্তি বিকশিত করে নিজের আবির্ভাব সদর্পে সমর্থন করতে লাগল তখন ক্রুদ্ধ ভৈরব তার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁতের মাজনের সুখ্যাতিকারের নকল বাঁধানো দন্তপাটি নিয়মিত অট্টহাসির মতই, ছিটকে বেরিয়ে এল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, প্রহারের পরেও মুখে হাসি টেনে ক্যানভাসার করুণ সুরে বলছে, "কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই করে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"। জীবনের অশ্রুসিক্ত হাস্যকরতার সামনে ভৈরবের মতই হতভম্ব নির্বাক হয়ে থাকতে হয়। এখানে হাসি ও অশ্রু জীবনচৈতন্যের একই উৎস থেকে উৎসারিত—সে উৎস অধ্যাপক লিককের ভাষায়, 'mingled heritage of tears and laughter that is our lot on earth.'

৫

স্বপ্নে আর বাস্তবে, মানুষের আশা আর প্রাপ্তিতে যে অসামঞ্জস্য এবং সেই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও মানুষ যে ভাবী জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলেছে, জীবন-দার্শনিকের কাছে তাও কম হাসির বিষয় নয়! 'সুলেখার ক্রন্দনে'র কথা মনে পড়ছে। জ্যোৎস্নামদির গভীর রাত্রে স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভশয্যায় একটি ষোড়শী তন্বীকে কাঁদতে দেখে কবিকল্পনায় প্রশ্ন জেগেছে, কেন এ ক্রন্দন?' —পুত্রশোক? সিনেমায় না যেতে পারার অভিমান? শাড়ির পাড় পছন্দ করা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মতভেদের পরিণাম? না কুমারী-জীবনের মধুর পূব-

রাগের স্মৃতিমথিত বেদনা? অমন চাঁদনীরাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হতে পারে না কি? দূরে 'চোখ-গেল'-পাখি অশ্রান্ত সুরে ডেকে চলেছে। সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্নবিহ্বল— চারিদিকে জ্যোৎস্নার পাথার: এমন দুর্লভক্ষণে হারানো প্রেমের কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না অপরাধ? কাল্পনিক যখন এমনি কল্পনার জাল বুনে চলেছেন তখন সুলেখার ক্রন্দনের সত্য কারণটি আবিষ্কৃত হল। সুলেখা কাঁদছে দাঁতের ব্যথায়। —কল্পিত সত্যের সঙ্গে বাস্তব সত্যের কত তফাত!

কিন্তু এও তো তবু কল্পনা। মানুষের প্রত্যাশা আর মানুষের প্রাপ্তির মধ্যেই কি কম পার্থক্য? কি সে চায় আর কতটুকুই বা সে পায়?—'যুগল স্বপ্ন' যুগলেরই বটে! স্বামী-স্ত্রী অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি শুয়ে প্রাগ্‌বিবাহ জীবনের প্রেমের স্বপ্ন দেখেছে। স্ত্রী ছিল অন্যবাঞ্ছিতা, স্বামী আর একটি তরুণীর প্রণয়-প্রত্যাশী। কিন্তু বাস্তব জীবনে কুমার-কুমারীর প্রেম মর্যাদা পায়নি। তাই দাম্পত্য জীবনে পরস্পর পরস্পরের বক্ষোলগ্ন হয়েও মনে মনে কত ব্যবধান! 'অমলা'রও একই পরিণাম। বিয়ের প্রস্তাব যাদের সঙ্গে হয়েছে তাদের নিয়ে কখনো কল্পনায়, কখনো প্রত্যক্ষ-দর্শনে কত স্বপ্নই না সে গড়েছে! কিন্তু কোথাও বা দরে বনল না, কোথাও পছন্দ হল না মেয়ে। অবশেষে যেখানে মেয়েও পছন্দ হল, দরেও বনল, এবং বিয়েও হয়ে গেল, সেখানে আর যাই হোক্ পাত্র সম্পর্কে স্বপ্ন রচনার অবকাশ নেই। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক, সদাগরি অফিসের চাকুরে। তবু অমলা সুখেই আছে!

দাম্পত্য-জীবনের ট্রাজেডি একপক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ এবং অন্যপক্ষে হাস্যকর হয়ে উঠেছে 'অদ্বিতীয়া' গল্পে। স্ত্রী প্রভাবতীর ধারণা ছিল যে, স্বামীর জীবনে সে অদ্বিতীয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পাবার মাস তিনেকের মধ্যেই পত্নীব্রত স্বামীটি দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হলেন, এবং যথাযথ গোঁফ কামিয়ে তরুণ সেজে বিবাহও করে বসলেন। ষড়যন্ত্রটি ছিল শ্যালিকার। রহস্যমোচন হল ফুলশয্যার রাত্রে। নববধূর সঙ্গে মিলনের অনেক আশা ও আশঙ্কা নিয়ে স্বামীটি বাসর ঘরে ঢুকে দেখেন সাতটি সন্তান পরিবৃতা তাঁর প্রথমাই পালঙ্কে বসে তাঁর প্রতীক্ষা করছেন। পুরুষ-পরীক্ষায় শ্যালিকার এই বাজিরাখা রসিকতা স্বামী স্ত্রী উভয়কেই যে বাস্তব-সত্যের সম্মুখীন করল তা শুধু উপভোগ্যই নয়, মর্মান্তিকও বটে! পুরুষ-জাতি সম্বন্ধে নারী-সাধারণেরই আরেক ধরনের মনোভাব এবং তার সত্যাসত্য

পরীক্ষিত হয়েছে 'ছেলেমেয়ে' গল্পে। মাতৃসদনে উত্তীর্ণযৌবনা আন্নাকালী এবং সপ্তদশী নমিতা পাশাপাশি খাটে শুয়ে আছেন। দুজনেই আসন্নপ্রসবা, এখন-তখন হয়ে আছেন। স্বভাবতই আলাপ জমে উঠল এবং দেখা গেল যে পতিনিন্দায় উভয়েই পঞ্চমুখ। উভয়েই যেন ঘোরতর পুরুষবিদ্বেষী। তারপর যথাকালে দুজনেই সন্তানবতী হলেন। আন্নাকালীর অষ্টম গর্ভের সন্তানটিও হল মেয়ে। পক্ষান্তরে নমিতা একটি পুত্রসন্তানের জননী-গৌরব অর্জন করে ধন্য হল। আন্নাকালী কন্যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন. এ মেয়ে তার হতেই পারে না, তাঁর বিশ্বাস তাঁর ছেলে হয়েছে, নিশ্চয়ই নার্সগুলো ষড়যন্ত্র করে শিশু বদল করে দিয়েছে। প্রতিবাদে হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে আন্নাকালী চিৎকার করতে লাগলেন। এ গল্পে নারীমনস্তত্ত্বের আলোচনায়ময় একটি দিক পরিহাসরসিক পুরুষের লেখনীমুখে কৌতুকাবহ বক্রহাসির সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু দাম্পত্য-জীবনাদর্শের চরম ট্র্যাজেডির চিত্রটি ব্যক্ত হয়ে উঠেছে 'পরিবর্তন' গল্পে। অবৈজ্ঞানিক অন্ধ-পতিভক্তির পরিণাম কত শোকাবহ হতে পারে, সেই সত্যই 'পরিবর্তনে'র মুখ্য উপপাদ্য। স্বামী হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে। স্ত্রী সরমার অক্লান্ত পতিসেবা ত্রুটিহীন। কিন্তু সেবাযত্ন সত্ত্বেও যক্ষ্মার প্রকোপ যেদিন নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা বহন করে এনেছে সেদিন স্ত্রীর এক অদ্ভুত আচরণ ধরা পড়ে গেল। সরমা গোপনে হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ পান করেছে। তাঁর যুক্তি, স্বামী যদি না বাঁচেন, তার বেঁচে লাভ কি? এর পরিণাম প্রাকৃতিক নিয়মে যা অনিবার্য তাই হল, সরমার দুটো লাঙ্গই আক্রান্ত হল, অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। হরিমোহন কিন্তু সেরে উঠেছিল। বড়লোক সে। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রভূত অর্থব্যয়ে কালব্যাধির হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে দেশে ফিরে যথারীতি আবার বিয়ে করেছে। অবশ্য সেবাময়ী পতিব্রতা পত্নী সরমাকে সে ভুলতে পারেনি, তাই বেছে বেছে সরমা নাম্নী একটি মেয়েরই সে পাণিপীড়ন করেছে। পতিব্রতার এও কি পুরস্কার!

৬

জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অনুরূপ অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মোহে মানুষের দুর্ভোগ ও দুর্গতি কতদূর পৌঁছতে পারে 'বনফুল' তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই তা প্রত্যক্ষ করেছেন। 'কাকের কাণ্ড' গল্পে বায়স-রব অশুভশংসী—

এই সংস্কার বশেই জগত্তারিণীর কাক-তাড়ানোর প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে গল্পের পরিণাম রচনা করেছে। কর্তা যে অসুখে মারা যান সেই অসুখটি হবার পূর্বে কাক অমনি অলুক্ষুণে ডাক ডেকেছিল। সন্তান-ভাগ্যে জগত্তারিণী ভাগ্যবতী,—কিন্তু ছেলেমেয়েরা সবাই বিদেশে; কার কি অমঙ্গল হবে এ আশঙ্কায় কাকের ডাক শুনে জগত্তারিণী বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং কোমরের ব্যথায় প্রায় অচল হওয়া সত্ত্বেও উঠানে নেমে কাক তাড়াতে গিয়ে পিছলে পড়ে এক কাণ্ড করে বসলেন। অমনি তাঁর কঠিন অসুখের সংবাদ বহন করে চারদিকে তারবার্তা প্রেরিত হল। পুত্রকন্যারা স্ব স্ব দায়িত্বপূর্ণ কাজকর্ম ফেলে রেখে ছুটে এলেন। জননীর অসুখ যতটা কঠিন মনে হয়েছিল ততটা অবশ্য হয়নি। কিন্তু সামান্য একটি কাকের ডাক একটি বিরাট পরিবারে কি হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না করল !!

'বাঘা' গল্পে হঠাৎ শিরোমণির দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়ল যে তারিণীচরণের বাঘা কুকুরটি আসলে কুকুর নয়। এক বৎসর পূর্বে মৃত তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজ কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়ে বাঘার রূপ ধরে এসেছে। বিহ্বল তারিণীচরণ এই প্রেতলৌকিক সংবাদে অভিভূত হয়ে বাঘার বন্ধনদশা মোচন করে যথাকালে স্বস্ত্যয়নাদি কৃত্য সম্পন্ন করলেন এবং কুকুরযোনিপ্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করতে লাগলেন। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর কর্মচারী ছাঁটাই-এর কাঁচিতে তারিণীচরণের চাকরি কাটা গেল। এদিকে অগ্রজও অন্নজল ত্যাগ করলেন। শিরোমণি শুনে বললেন, 'চাকরি গেছে দেখে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে? হাজার হোক্ দাদা তো!' কাজেই দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতায় অনুজ অন্ধকার-গৃহকোণাশ্রয়ী অগ্রজকে অনশনব্রত ভঙ্গের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ফল যা হবার তাই হল, পাগলা কুকুর তারিণীকে কামড়ে মারা গেল। দিব্যদ্রষ্টা শিরোমণিও বাদ গেলেন না, তাঁকে কামড়ালেন তারিণী নিজে। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ডাক্তার বললেন, দুজনেরই জলাতঙ্ক হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই। সুতরাং 'এখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হচ্ছে'। কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা !!

'দিবা দ্বিপ্রহরে' গল্পে সাপের ওঝার প্রতি মানুষের মূঢ় আস্থা পরিহসিত হয়েছে। হারু ঘোষের সেজছেলেকে যে-গোখরো সাপটি কামড়েছিল বিশু বাগদি তাকে বন্ধনের আশায় বিঁধে রেখেছে। ছেলেটিকে ডাক্তার যথাসাধ্য ওষুধপত্র লাগিয়ে গেছেন। এমন সময় সেখানে এক আগন্তুকের আবির্ভাব হল,

তার কথাবার্তায় সবার ধারণা হল যে, সে একজন গুণী ওঝা। অতএব তার হাতেই সমর্পণ করা হল হারু ঘোষের ছেলেকে। ওস্তাদ সাপটিকে বন্ধনমুক্ত করে আদরে তার চুমু খেয়ে নিজের ওস্তাদি দেখালে। ফলে হারু ঘোষের ছেলের মৃতদেহের পাশেই তারও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেহটি স্থান পেল। উত্তেজিত জনতা এই অলৌকিক কাণ্ডের পরিণাম অবাক বিস্ময়ে যখন লক্ষ্য করছে তখন জানা গেল যে, যাকে সাপের ওঝা বলে মনে করা হয়েছে আসলে সে একটি পাগল, পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু পাগল, কি শুধু ঐ একটি লোকই? আমাদের অন্ধভক্তি ও কুসংস্কার যে কত লোককে পাগল করে তুলেছে তার ইয়ত্তা নেই। 'জাগ্রত দেবতা' গল্পে অমনি এক অন্ধবিশ্বাসীর উন্মাদপ্রাপ্তির কাহিনীটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সনাতনপুরের মহাদেব জাগ্রত দেবতা। বৈশাখী পূর্ণিমায় এই দেবতাকে কেন্দ্র করে মহোৎসব হয়ে থাকে। দেবতা যে জাগ্রত তার জলন্ত প্রমাণও পাওয়া যায় সে দিনই। প্রতি বৎসর একজন লোক বৈশাখী পূর্ণিমায় পাগল হয়ে যায়। সে বছরও বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউ সেদিন পাগল হয়েছে বলে জানা গেল না। বিশ্বাসীর মনে জাগল সন্দেহ, দেবপূজায় কি কোন ত্রুটি হয়েছে? পূজায় প্রত্যক্ষ ফল যখন পাওয়া গেল না, তখন নিশ্চয় কুপিত মহাদেবের অভিশাপে সনাতনপুরে কোনো-না-কোনো অমঙ্গল ঘটবেই। এই আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের মধ্যে কিন্তু অবিচলিত থাকলেন দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি। তাঁর বিশ্বাস, কেউ না কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বৈশাখের খর-দ্বিপ্রহরে চারিদিক যখন প্রচণ্ড রোদে পুড়ে যাচ্ছে, ঘরে ঘরে কপাট-জানালা বন্ধ, তখন নীলমণি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রক্তচক্ষু, স্ফীতনাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করছেন পাগলটা কোথায়। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।—নীলমণির এই অবস্থা দেখে সনাতন পুরবাসীগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে!

৭

মানুষের আচরণ ও ধ্যানধারণার স্বরূপ উদ্ঘাটনে 'বনফুলে'র সন্ধানী দৃষ্টি জীবনের আরো বহু বিচিত্র দিক নিষ্ঠুর সত্যের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে! আমাদের বীরপূজার মোহে আমরা যে নিরপেক্ষ বিচারশক্তিও হারিয়েছি তারই উদাহরণ 'নাম' গল্পটি। প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির যে সব আচরণ আমরা শুধু ক্ষমার

চক্ষেই দেখি না, অনেকটা শ্রদ্ধা-মিশ্র ঔদার্যের সঙ্গেই গ্রহণ করি, নামমোহমুক্ত দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের জীবনে হলে তা তুচ্ছতাচ্ছিল্যেরই উদ্রেক করে। যতীনবাবুর গ্রেটম্যানের গল্পে নামটা চেপে রেখেছেন বলেই মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেটনেস দেখতে পাওয়া যেত। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্ত বিচার-সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' গল্পে তাই তাকে 'পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সে নেশার ঘোরে পান্নালাল চক্রবর্তীকে লেখিকা মনে হয়েছে, ট্রাঙ্কের দাম হয়েছে বারো আনা আর জুতো চার আনা, সেই নেশা কেটে যাবার পর দেখা যাচ্ছে প্রসিদ্ধ লেখক পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নন, খোঁচা খোঁচা গোঁফওয়ালা মাড়োয়ারী-সদৃশ স্থূলকায় এক বিরাট পুরুষ, ট্রাঙ্কের দামও বারো আনা নয়, সাড়ে তের টাকা। জুতোও চার আনার নয়, পৌনে সাত টাকাই কেন হয়েছিল। নেশার ঘোরে মানুষ মাত্রেরই অবস্থা সমান হাস্যোদ্দীপক। আমরা সবাই পাঁচ পয়সার মোদকের নেশায় বিহ্বল হয়ে আছি। তাই যে বুড়ি তার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা নিয়ে একটু আগেও ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার সবচেয়ে প্রত্যক্ষ কারণ হয়েছিল যখন জানা গেল যে, মাসিমার বাড়ির পুরনো দাই রুকমিনিয়া এবং মাসিমার রোগশান্তির কামনায় সে 'মহাবীরজী'র, পূজা চড়িয়ে এসেছে, তখন তার নোংরা দুর্গন্ধ কাপড়ে রাখা মহাবীরজীর প্রসাদ সানন্দে ভক্ষণ করতে আর আপত্তি হয় না।

এই 'পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা'বশেই বেগম-মণ্ডলী-পরিবৃত সম্রাট সাজাহানের তাজমহলের ঐশ্বর্য-সমারোহে আমরা মুগ্ধ হই, কিন্তু ফকির-সাজাহানের একনিষ্ঠ পত্নীপ্রেমের মহিমা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। দুরারোগ্য 'ক্যাংক্রাম অরিস' রোগে তার বেগমের মুখের আধখানা পচে গেছে, ডানদিকের গালটা নেই, দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে, দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। তবু বৃদ্ধ স্বামী নির্বিকার চিত্তে স্ত্রীর বোঝা পিঠে বহন করে বেড়িয়েছে। করাল মৃত্যুর কবল থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি, কিন্তু সম্রাটের মত প্রিয়ার সমাধিকে 'মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে' সাজিয়ে দেবার শক্তি তার নেই, তাই কতকগুলো ভাঙা ইট আর কাদা দিয়েই ফকির সাজাহানের 'তাজমহল' গড়া হয়। সম্রাটের অমর কীর্তির পাশে এ চেষ্টা মানুষের কাছে যেমন নগণ্য তেমন হাস্যকর। 'বনফুল' মানুষের দৃষ্টির এই নিপুণতার সঙ্গেই ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

তাছাড়া মানুষের স্বভাবের অশেষবিধ জরা-ব্যাধি-দৌর্বল্যের নিদান-সন্ধানেও তাঁর ভিষগ্‌দৃষ্টি অভ্রান্ত। 'আত্ম-পর' ভেদে তার অনুভূতির যে কত ইতর-বিশেষ হতে পারে যে কথা প্রকাশে তিনি কার্পণ্য করেননি। কোন্ দুর্বলতার ছিদ্রপথে তার কল্পিত কর্তব্য আর তার কৃত-কর্মের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত হয়ে যায়, কেন জীবনের কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডবপক্ষ ছেড়ে কৌরবপক্ষে যোগদান করে তাকে 'শরশয্যা' গ্রহণ করতে হয়, সেকথাও তিনি দুর্বল মানুষের প্রতি অনুকম্পাভরেই বলেছেন। এমন কি, 'সনাতনপুরের অধিবাসিবৃন্দে'র রসনারোচন কুৎসারটনার সনাতন প্রবৃত্তির আত্যন্তিকতা দেখে তাদের মূঢ় আচরণ নিয়ে শুধু কৌতুকই করেছেন। শৈলেশ্বর মোক্তার আর শ্যামা ধোপানির আকস্মিক অন্তর্ধানের পর উভয়কে জড়িয়ে শৈলেশ্বরের মিত্র ও শত্রুপক্ষে যে উপাদেয় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে গল্পশেষে শুধু সূক্ষ্ম ল্যানসেটের একটি মাত্র খোঁচায় তার নির্লজ্জ নোংরামির প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি টেনেছেন। যে শ্যামা ধোপানি আর পিরুর দাম্পত্যকলহের সুযোগে শৈলেশ্বর মোক্তারের রজকিনীপ্রেম ভদ্রসমাজকে উত্তেজিত করেছিল, যথাসময়ে দেখা গেল তারা দুজন গাধার পিঠে মোট চাপিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘোরাফেরা করছে। গাধার পিঠে মোট চাপানো'ই বটে।

তবু এই ভদ্র গর্দভগুলো হয়ত করুণারই পাত্র, কিন্তু মানুষের ন্যাকামি ও ভণ্ডামি দেখলে 'বনফুল' একেবারে নিষ্করুণ। সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে জ্যেঠামশায়ের যে পাদুকা প্রয়োগ করতেন, 'বনফুল' সে পাদুকারও সদ্ব্যবহার করেছেন। 'তর্ক ও স্বপ্ন' গল্পে মহাযুদ্ধ-প্রসঙ্গে তর্করত বাঙালী যুবক-দ্বয়ের সঙ্গে মাংস-রন্ধন প্রণালী নিয়ে তৃণভোজী বলীবর্দযুগলের শৃঙ্গ-যুদ্ধের সাদৃশ্য-আবিষ্কারে হিতোপদেশীয় গল্পরীতি অনুসৃত হলেও স্যাটায়ারের মোটা লাঠিই এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। 'খড়মের দৌরাত্ম্য' গল্পেও পাদুকাপ্রহারটি নির্মম। রাধাবল্লভের প্রেমরূপ ব্যাধির ঔষধ হিসাবে পিতামহ প্রজাপতির অদৃশ্য পাদুকা-প্রয়োগেও লেখক সন্তুষ্ট থাকেননি, শেষ পর্যন্ত রামকিঙ্কর হাজরার হাতে প্রাকৃত পাদুকার সদ্ব্যবহার করে তবে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। এমন কি 'জৈবিক নিয়ম' গল্পে ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতও পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়নি। রেলওয়ে প্লাটফর্মে রোগা-গোছের যে ছোকরাটি তার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও অপরিচিতা তরুণীর কাছে 'হিরো' সাজবার লোভে তার তারুণ্য ও বীরত্বের কারদানি দেখাচ্ছিল, তার প্রতি চরম দণ্ডই প্রযুক্ত হয়েছে। শেষ বাহাদুরি দেখাবার উন্মাদনায়

চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে একেবারে চাকার নীচে পড়ে তার যৌবন-নৃত্য চিরকালের জন্য শুব্ধ হল। 'আর কিছু করবার সুযোগ সে পেল না।'—এ উপসংহার নিয়তির মতই নির্মম।

অন্যায় ও পাপাচারীর প্রায়শ্চিত্ত বিধানেও 'বনফুলে'র ন্যায়দণ্ডটি অমোঘ। দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিবেক খড়্গহস্ত। সেখানে ক্ষমা নেই, বিচারে শৈথিল্য নেই, শাসনে বাঙালি-সুলভ অনুকম্পাও নেই। 'আইন' গল্পে ডাক্তার টি. সি. পাল দ্বিসহস্র রজত-মুদ্রার বিনিময়ে আইনের চক্ষে ধুলো দিতে গিয়ে সবদিক সামলে অতিশয় হুঁশিয়ার হয়ে যে কাণ্ডটি করলেন, তার ফল একেবারে হাতে হাতেই তাঁকে পেতে হল। অপরিচিত ব্যক্তিকে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে যখন তিনি আত্মতৃপ্তি সহকারে ভাবছেন, 'এমন পাকা কাজ করে দিলেন যে আইনের বাবারও সাধ্য নেই তাকে ধরে', তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, এই অব্যর্থ অস্ত্রটি একেবারে ইন্দ্রের বজ্র হয়ে তাঁরই মাথায় ভেঙে পড়বে। সার্টিফিকেট নিয়ে লোকটি হাতের নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু পুলিশের পত্রে জানতে পারলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্রটি নিহত হয়েছে, এবং হত্যাকারী যে এইমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আত্ম-রক্ষার চরম অস্ত্রটি আদায় করে নিয়ে গেছে, সে সত্যও তাঁর কাছে দিবালোকের মতই প্রাঞ্জল হয়ে উঠল।

'চান্দ্রায়ণ' গল্পে আর. এম. এস.-এর শর্টার চন্দ্রবাবুর প্রায়শ্চিত্তটিও কবিবিধাতার চরম দণ্ড বিধানেরই উদাহরণ। চাকরির সুযোগ গ্রহণ করে লুকিয়ে লুকিয়ে পরের প্রেমপত্র খুলে পড়ার দুষ্প্রবৃত্তি একেবারে মাথার ওপর বজ্রই ডেকে আনল। চান্দ্রায়ণ নামকরণের শ্লেষার্থটিও বড়ই নির্মম। চন্দ্রচরিতই চান্দ্রায়ণ-প্রায়শ্চিত্তকে অনিবার্য করে তুলেছে। অবশ্য আর্টিস্ট হিসাবে স্যাটায়ারিস্টের শিল্পভাষণ এখানে 'কান্তাসম্মিত' নয় একেবারে 'প্রভুসম্মিত'। কবিপ্রজাপতির চেয়ে কবিবিধাতাই এখানে অধিকতর সক্রিয়।

তবে স্যাটায়ারের সরু কাজেও যে 'বনফুল' সমান ওস্তাদ তা বলাই বাহুল্য। নকল ভদ্রতার মুখোস খুলে-দেখাবার কাজে 'শ্রীপতি সামন্ত' আর 'ছোটলোক' গল্প দুটি স্মরণীয়। 'পরনে' একটি আধ-ময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারী চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাচ-ভাঙা চশমা চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নেই, সেদিকে সুতা বাঁধা।—এই দীন চেহারা নিয়ে শ্রীপতি সামন্ত ট্রেনের ভিড়ে যখন প্রথম

শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটিতে একটু আসন পাবার করুণ আবেদন জানালেন তখন তাতে আপত্তি হল পাইপ-শোভিত-বদন সাহেবি-পোশাকধারী প্রথম শ্রেণীর বাঙালী যাত্রী-বাবুটির। কিন্তু পরে প্রথম শ্রেণীতেই উঠে শ্রীপতি যখন শুধু নিজেরই সমস্ত দেয় কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিলেন না, ঐ ভণ্ড সাহেবটিকে বিনা-টিকিটে ভ্রমণের লজ্জা আর অপমান থেকে রক্ষার জন্যে তারও সমস্ত চার্জ পাঞ্জাবি ক্রুকে বুঝিয়ে দিলেন তখন আর নকল প্রথম-শ্রেণীর যাত্রীর মুখে কথাটি নেই। 'ছোটলোক' গল্পের চাবুকটি আরো সূক্ষ্ম, কিন্তু আরো তীব্র। অনমনীয় চরিত্র রাঘব সরকার চির-উন্নত-শির; কখনো কারো অনুগ্রহ-প্রত্যাশী নন, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কারো দ্বারা উপকৃত হন না! কৃতবিদ্য পুরুষ, সুতরাং মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্রনারায়ণ, বলশেভিজম, ডিভিশন অব লেবর, প্রভৃতি ভাবের অভাব নেই। চলার পথে রিক্শাওয়ালার কাকুতি দেখে দয়ার্দ্র হলেন; কিন্তু রিকশায় চড়া তাঁর আদর্শে বাধে। অথচ করুণাসিন্ধু উদ্বেল হয়েছে। কাজেই দরিদ্র রিকৃশাওয়ালাকে করুণা দেখাতে গেলেন রিকৃশায় না চড়েই তাকে তার পথের ভাড়া দিয়ে। কিন্তু 'ছোটলোকের'ও যে আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে পারে, সে জ্ঞান তিনি সেদিন প্রথম লাভ করলেন। 'আমি কারো কাছ থেকে ভিক্ষা চাই না'—একটি রিকৃশাওয়ালার মুখে এ কথা শুনবেন, রাঘব সরকার বোধ হয় কোনদিন তা কল্পনাও করতে পারেননি। আঘাতটি শুধু মর্মবিদারীই নয়, আদর্শবিলাসী 'ভদ্রলোকে'র পক্ষে চক্ষুরুন্মীলনকারীও বটে! 'ছোটলোক' গল্পটি উৎকৃষ্টতম স্যাটায়ারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৮

'বনফুলে'র জীবনচৈতন্যে যে প্রাকৃতিক প্রাণলীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে 'বুধনী', শ্রীধরের উত্তরাধিকারী', 'ঐরাবত' ও 'অর্জুন মণ্ডল'-এ সার্থক বাণীরূপ পরিলক্ষিত হবে। 'বুধনী' গল্পে আদিম জৈবপ্রবৃত্তির সর্বগ্রাসী প্রেমক্ষুধার প্রকাশ। অরণ্যচারী শিকারসন্ধানী পুরুষ বিল্টু যেদিন প্রথম নিকষ-কৃষাঙ্গী কিশোরী বুধনীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেদিন তাকে বন্য পশুর মতই সে তাড়া করেছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করে সেদিন বুধনী নিস্তার পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিল্টুই তাকে জয় করল। প্রাণসংশয় শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে বুধনীকে বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর বিল্টু বুধনীকে

একদণ্ডও ছাড়েনি। কিন্তু পুরুষ ও নারীর আদিম অবিচ্ছেদ্য মিলনে প্রথম বিপর্যয় ঘটালে সন্তানের আবির্ভাব। নববধূ জায়া ও জননীতে দ্বিধাবিভক্ত হল। নারীর অধিকার নিয়ে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল তারই ঔরসজাত শিশুসন্তান। বিল্টু শিশুপুত্রকে হত্যা করে ফাঁসি গেল। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বুধনীর নাম উচ্চারণ করেই সে অবিশ্রান্ত চিৎকার করেছে। 'নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কারো সহানুভূতি হয়নি'। কিন্তু পুরুষের সর্বগ্রাসী-রাহুর-প্রেমের এই বল্গাহীন আদিম বর্বর রূপটিকে অস্বীকার করলে জীবনসত্যকেই অস্বীকার করা হবে। 'শ্রীধরের উত্তরাধিকারী' গল্পে জীবনসত্যের আরেক দিকের উন্মেষ। চিরকৃপণ ও শোষণপটু 'মক্ষিচুস' শ্রীধর মিস্তির তার তিলে-তিলে সঞ্চিত চার লাখ টাকার সম্পত্তি অকাতরে একটি অনাত্মীয় ও অপরিচিত ব্যক্তিকেই সমর্পণ করে গেল, তার কারণ শ্রীধরের মৃত্যুসংবাদে চরম প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঐ একটিমাত্র ব্যক্তিই সাড়া দিয়েছিল। মানুষ তার সমস্ত অর্থগৃধ্নুতা ও চিত্তসংকোচন সত্ত্বেও নিজের অজ্ঞাতসারেই কাঙাল হয়ে সংসারে একটি জিনিসের সন্ধান করছে—সে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের ক্ষেত্রে ভালবাসার একটু স্থান। উত্তরাধিকারের দাবি সেখানেই।

'ঐরাবত' গল্পটি প্রকৃতির প্রাণধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার রুদ্ধ করে চিত্তনিরোধের পথে প্রাকৃতিক নিয়ম যে অতিক্রম করা যায় না, ব্রহ্মচারী ত্রিগুণানন্দের উদ্ভট জীবনে সেই সত্যই প্রকাশিত হল। তাঁর নিজস্ব পন্থায় সর্ববিধ 'বখেড়া' মেটাতে গিয়ে গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতের মত জীবনস্রোতে তাঁকেও ভেসে যেতে হল। অবদমিত কামনা জাগ্রত হয়ে ক্ষুধার যে আহার দাবি করল তা সংগ্রহ করে তবেই তাঁর জীবনের শেষ বখেড়া মিটল। গল্পশেষে লেখক নারীরূপা সেই প্রকৃতির পায়েই তাঁর প্রণাম নিবেদন করেছেন।

'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে আছে অতিচারী জীবনের ট্রাজেডির কথা। চিত্ত-নিরোধের পন্থাও যেমন জীবনের অস্বীকৃত, আত্যন্তিক অতিচারও তেমনি প্রকৃতির অনুশাসন লঙ্ঘন। 'অর্জুন মণ্ডলে'র জীবনসাধনা যতই অ-সাধারণ হোক না কেন, তাও আদর্শপ্রতিষ্ঠার একপ্রকার উন্মাদনা মাত্র। আদর্শবাদী মানুষের মনে তা যতই শ্রদ্ধেয় হোক, সহজ জীবনের পথে তা সর্বদাই অচল। অর্জুন মণ্ডল তাঁর জীবনটিকে সর্বভারসহ এমন একটি বিরাট সিন্দুকে রূপান্তরিত করেছেন যে, চলার পথে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়াই দুঃসাধ্য। জীবনের যাত্রায় সাধারণ স্যুটকেশ হাতে নিয়ে যখন মানুষ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করছে

তখন ঐ বিরাটকায় সিন্দুক নিয়ে অর্জুন মণ্ডল চলাচলের পথের পাশে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যুগে যুগে অ-সাধারণ মানুষের মহৎ ট্রাজেডির মূলে এই কারণটিই নিহিত আছে; অস্বাভাবিক বলেই তা প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দণ্ডনীয়। এখানেও 'বনফুলে'র প্রণাম জীবন-দেবতার চরণেই নিবেদিত হয়েছে।

৯

'বনফুল'কে অভিজ্ঞতাবাদী বলে পরিচিহ্নিত করেছি; মনের আলো আঁধারি লীলার মধ্যে জীবনের যে রহস্য প্রকাশিত হয় তাকেও তিনি পূর্ণ-স্বীকৃতি দিয়েছেন। সদরে অন্দরে মনের লুকোচুরি খেলায় জীবনের জয়-পরাজয়ের আনন্দ-বেদনা তিনি নিরপেক্ষ রসিক দর্শকের মতই প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের বাইরের মন ও ভিতরের মনের চেতন অবচেতন লোকের বাসনা ও সংস্কার, বুদ্ধি ও ব্যবহারের মধ্যে যে সংঘাত এবং তার ফলে জীবনের সুখ-দুঃখের যে লীলাবৈচিত্র্য তার রহস্য উন্মোচনেও 'বনফুলের' শিল্পদৃষ্টি অব্যর্থ।

'ভিতর ও বাহির' গল্পে উকিল নবকিশোরবাবুর জীবনে এই দুই মনের বিরোধের লীলা। খুনীকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা সাক্ষী সৃষ্টি করার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হয়ে গরীব প্রজার সর্বনাশসাধন, প্রয়োজনমত জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি কাজে তিনি তাঁর বাইরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য নিয়েছিলেন। এরই নির্দেশে একদিন তিনি মক্কেলকে যে আইনগত পরামর্শ দিলেন তারই ফলে তাঁর নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা হাহাকার করে উঠল। বন্ধ্যা বধূকে পরিত্যাগ করে সেন্টিমেন্ট-বর্জিত হয়ে পুত্রের পুনর্বিবাহদানের যে পরামর্শ উকিল নবকিশোর দিলেন, দেখা গেল তার ফলেই তার একমাত্র কন্যাটি শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে তাঁর গৃহে ফিরে এসেছে।

'মানুষের মন' গল্পে মানস-রহস্যের বোধ করি চরম শিল্পপ্রকাশ হয়েছে। নরেশ ও পরেশ দুই সহোদর ভাই। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক, অন্যজন গোঁড়া বৈষ্ণব। উভয়ের জীবনপন্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু এক জায়গায় দুজনেরই মিল আছে। ভ্রাতুষ্পুত্র পল্টুর প্রতি স্নেহে উভয়েই সমান দুর্বল। সেই পল্টুরই টাইফয়েড হয়েছে। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক গেলেন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে। বৈষ্ণব ধরলেন কবিরাজকে। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হচ্ছে না দেখে অবশেষে জ্যোতিষ এবং তারকেশ্বরের দৈব ঔষধ পর্যন্ত ধাওয়া করতে

হল। বৈজ্ঞানিকের শেষ অস্ত্র ইনজেকশন, বৈষ্ণবের স্বপ্নাদেশলব্ধ বাবা-তারকেশ্বরের চরণামৃত। কিন্তু যখন কিছুতেই কোনো ফলোদয় হল না, পল্টুর যখন শেষ অবস্থা, তখন উভয়েই জ্ঞান-বিশ্বাস হারিয়ে অসহায় এবং সেই চরম অগ্নিপরীক্ষায় দেখা গেল, 'মৃত্যুর হাত থেকে স্নেহের' ধনকে আঁকড়ে রাখার জন্যে বৈষ্ণব-ভক্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাতেই শেষ আশ্রয় খুঁজছেন, আর বৈজ্ঞানিক চরম ভরসা স্থাপন করতে চাইছেন চরণামৃতের মাহাত্ম্যের ওপর।

'অভিজ্ঞতা' গল্পটি যেন 'মানুষের মন'-এরই পরিণাম। তরুণ ডাক্তারের অতি-বৈজ্ঞানিকতা এবং বিলিতি ডিগ্রিধারী প্রবীণ ডাক্তারের অতিনির্ভরশীলতা বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আরো দুটি বিচিত্র দিকের প্রকাশ হয়েছে 'মুহূর্তের মহিমা' এবং 'তিলোত্তমা' গল্পে। মনের এই রহস্যলোকে ব্যবহারবাদ স্তম্ভিত। প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যেমন শেষ পর্যন্ত বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে পড়েন, জীবনবিজ্ঞানীও তেমনি দুর্জ্ঞেয় জীবনসত্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বিস্ময়াবিষ্ট। কিন্তু এই বিস্ময়বোধও জীবনেরই অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। তাই যে-'বনফুল' একদিন 'বিদ্যাসাগর' গল্পে জন্মান্তরের ফেরে ফেলে উপক্রমণিকাকারকে নিয়ে রসিকতা করেছেন সেই 'বনফুল'কেই অদৃশ্য-লোকের অদ্ভুত কাহিনীর রূপদান করতে হয়েছে। 'অধরা', 'প্রজাপতি', 'মালাবদল', 'একই ব্যক্তি', এমন কি 'দুই ভিক্ষুকে'র অপ্রাকৃত কাহিনীও তাঁকে বলতে হয়েছে। 'অভিজ্ঞতা'-পন্থী বুদ্ধিবাদী শিল্পীর রচনায় এই 'রহস্যবাদে'র আবির্ভাবে চলিষ্ণুমনা 'বনফুলে'র সাহিত্যধর্মেরও বিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। শুধু বিবর্তনই নয়, একে জন্মান্তরও বলা যেতে পারে। 'অদৃশ্যলোকে' যেন শিল্পীর নবজন্ম হয়েছে। অলৌকিকের আলোকে তিনি জীবনকে নতুন করে যাচাই করে দেখছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নবজীবনের উপলব্ধি প্রাক্তন অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত। অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে তার চূড়ান্ত পরিণাম ভবিষ্যতের বিচারসাপেক্ষ।

১০

ছোটগল্পে 'বনফুলে'র সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি গল্পের রূপ-দৃষ্টিতে। গল্প আকারে কত ছোট ও হালকা হয়ে জীবনের কত বৃহৎ ও গভীর সত্যকে প্রকাশ করতে পারে তার বোধ করি শেষ কথা 'বনফুলে'র কথাশিল্পে রয়েছে। কত কম বলে কত বেশী বলতে পারা যায়—এ পরীক্ষায় ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি নেই। এবং

এখানে তাঁর শিল্পরীতি তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। আবেগবাহুল্য-বর্জিত ঋজু-মেরুদণ্ডের একজন সুস্থ বলিষ্ঠ পুরুষের রূপই 'বনফুলে'র ব্যক্তিত্বে পরিস্ফুট। জীবনের সম্পর্কেও তাঁর শিল্পদৃষ্টি রসসিক্ত নয়, রোধদীপ্ত। তাঁর ছোটগল্পের গদ্যশৈলী ও রূপকর্মেরও একই বৈশিষ্ট্য। তাঁর বাক্য অনলংকৃত অথচ সুন্দর, সরল অথচ বলিষ্ঠ, চিত্তহারী অথচ ক্ষুরধার। রসোক্তি নয়, বক্রোক্তিতেই তাঁর বাগ্‌দেবীর শ্রেষ্ঠ বন্দনা। সংকেতময় সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যবিন্যাসে পরিবেশ প্রস্তুত করে উপসংহার-বাক্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অথচ অনিবার্য ভাবে ভাবসত্যের বিদ্যুৎবিকাশই তাঁর গল্পগঠনরীতির বৈশিষ্ট্য। সার্থক নমুনা হিসেবে তাঁর 'নিমগাছ' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে। পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ, কেউ বা ভাজছে গরম তেলে। * * কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক—দাঁত ভাল থাকে, * * হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরণের লোক এল। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। * * নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।"

বিশুদ্ধ একটি নিমগাছই বটে! কিন্তু উপসংহারের শেষ-বাক্যটি এখনো বাকি আছে। একটিমাত্র সরলবাক্য। কিন্তু ওর মধ্যেই গল্পের বীজটি, বীজাকারে নয়—মহীরুহের আকারেই, বিধৃত রয়েছে :

—"ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটির ঠিক এই দশা।"

এই একটি বাক্যই আসল গল্প। কত সংক্ষিপ্ত অথচ কত পূর্ণাঙ্গ। গল্প এখানে কাব্যের ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। কিন্তু কাব্যের মত শুধু ভাবসত্যমাত্রই নয়, সমগ্র জীবনসত্যই গল্পরূপের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'ওদের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটি'র অসহায় করুণ জীবনের অকথিত কত কথা বহুগুণিত হয়ে পাঠকের মনে অনুক্ষণ নব-নব সৃষ্টি করে চলেছে। 'বনফুল' পাঠকমনের বিপুল বিস্তারের মধ্যে ছোটগল্পের এই মুক্তির চরম অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। এই সংযম, এই সংরক্ষণশক্তির মধ্যেই 'বনফুলে'র শিল্পসাধনা সার্থক। তাছাড়া এই সংযমই তাঁকে শিল্পীর মোহ থেকে রক্ষা করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, শক্তিমান শিল্পী রূপসাধনার মোহে জীবনসাধনাকে বিস্মৃত হয়েছেন; রূপ-নির্মাণের অত্যাসক্তি শিল্পীকে জীবনের পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছে। 'বনফুলে'র

সাম্প্রতিক কোনো কোনো উপন্যাস সম্পর্কে এ অভিযোগ যে উত্থাপিত হয়নি এমন নয়। কিন্তু ছোটগল্পে তাঁর রূপসাধনা-ই তাঁর জীবনসাধনা।

জগদীশ ভট্টাচার্য

অজান্তে

সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ি ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়ে আসছি, বৃষ্টিও আরম্ভ হ'ল। কি করি, দাঁড়াতে হ'ল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে, জামাটি বগলে ক'রে, ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম, তার পরই গলি, তা-ও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি, অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পরে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও প'ড়ে গেল, আমিও প'ড়ে গেলাম, জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি, লোকটা তখনও ওঠে নি, ওঠবার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, মারলাম এক লাথি।

রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার।

মারের চোটে সে আবার প'ড়ে গেল, কিন্তু কোন জবাব করলে না। তাতে আমার আরও রাগ হ'ল, আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি মশাই?

দেখুন দিকি মশাই, রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি ক'রে দিলে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল।

কে—ও? ওঃ, থাক মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে।

তার দিকে চেয়ে দেখি, মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে, গা-ময় কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় ক'রে আছে।

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকুড়াগ্রামবাসিনী কান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত, এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি। নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ির এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল, এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে, তার নাম পুষ্পমঞ্জুরি দিবি নাকি? তোর যত সব অনাছিষ্টি—

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ তো কালোই, একটা চোখ ছোট আর একটা বড়, তা ছাড়া কি রকম যেন বোকাহাবা ধরনের, মুখে সর্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জুরি নাম দেওয়া চলে না, তা ঠিক।

বছর দুই পরে।

কান্তমণি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ি গিয়াছেন। সেদিন রবিবার, কাহারও কাজকর্ম নাই, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল।

নৃপেন বলিল, এই দেখ না নীহারের অদৃষ্ট। হ'ল বা যদি একটা মেয়ে, তাও আবার এমন কদাকার—

শ্যাম ঘোস বলিলেন, আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি! টাকা চাই প্রচুর।

হারু খুড়ো তামাকটাতে দু'টান দিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হ'লেই হয় না। লোকে টাকাও চায়, রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট-বড় হয়েই আরও মুশকিল কিনা, কি যে হবে—

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল, কার চিঠি হে?

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম, বউ লিখেছে—বুঁচি মারা গেছে কাল।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু, বাছুর, শেষে মানুষ পর্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল, কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

কিন্তু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল, আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছিল কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন, বাবা, আমার নেড়ার যেন একটি টুকটুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

হরিহর ভট্টাচার্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আজীবন তোমার পুজো ক'রে এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, ঠাকুর, পাস করিয়ে দাও। আজ সে বলিল, ঠাকুর যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ ক'রে হরিরলুট দেব।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

হরেন পুরকায়স্থ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল, এগারোটা ভোট আমার

চাই! কালী পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভোটং দেহি, ভোটং দেহি—

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল, দেবতা জল দাও।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল, আমার একটিমাত্র সন্তান, ঠাকুর কেড়ে নিও না।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

পাশের বাড়ির ক্ষেন্তি পিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন, বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্য নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধ'রে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও তো।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

দার্শনিক কহিল, হে বিধাতা, তোমাকে বুঝিতে চাই।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল, জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

বাংলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল, কোনও সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।

বিধাতা কহিলেন, আচ্ছা।

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা, পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বাসায় খাঁটি সরষের তেল আছে?

ব্রহ্মা বলিলেন, আছে। কেন বলুন তো?

বিধাতা। আমার একটু দরকার। দেবেন কি?

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) অবশ্য, অবশ্য।

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন, মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ ক'রে নিলে সুস্বাদু হয়।

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হ'লে পরে ঝোলটা মেরে ভাজা-ভাজা ক'রে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।

আমি জানি না। মাংস তো ভাজা উচিতই, মসলাও ভাজা উচিত।

পাক-প্রণালীতে ওকথা লেখে না।

পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি, মাংসটা আগে সিদ্ধ—

পাক-প্রণালীর কথা তুমি মানতে চাও না?

না।

কেন শুনতে পাই কি?

কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে, তাদের কথাই প্রামাণ্য।

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

সব বাবুর্চিও তো সব সময় একমত নয়।

যে-সব বাবুর্চিরা মাংস আগে ভাজতে চায়, তারা বাবুর্চি নয়, বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?

প্রথম তার্কিক ধৈর্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, জাপান-টাপান বুঝি না। তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার।

কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না—আবার ফদর-ফদর ক'রে তর্ক করতে আসে। বেকুব।

ফের বেকুব বলছ?

তবে রে—

তবে রে—

তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল; উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যস্বরে কহিল, পুঙ্গবদ্বয় তোমরা তো উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমাল দাঙ্গা করিতেছ কেন? তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুশকিলে পড়িবে। শৃগালের কথা তাহারা শুনিল না—পরস্পর শিঙে শিঙ লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আচমকা ঘুম ভাঙিয়া গাড়োয়ান দেখিল, রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলিবর্দ-যুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিধ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় তাহার অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল, খা, শালারা খা—বেশি ডেঁপোমি করিস না।

খাইতে দিল বিচালি।

* * *

চট্ করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র-প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্মানি সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রভৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেন থামিয়াছে, নাথনগরে।

সনাতনপুরের অধিবাসিবৃন্দ

এক

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভাসমিতি করিয়া, কবিতা লিখাইয়া, সর্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসিবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের

উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদেব বর্তমানে এসব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুস-ফুস, গুজ গুজ করিতেছে মাত্র, কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার মহাশয় সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমায় তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্বৈব মিথ্যা। প্রবীণ হালদা: মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল, তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে! ছি ছি—

এতৎপ্রসঙ্গে ভাদুড়ী মহাশয় য-ফলা আকার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করিলেন। বলিলেন, আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা!

পর-মুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, কোন্ ধোপানিটা বল তো হে?

দেখা গেল, হালদার মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাস-স্থান, চেহারা, বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, শৈলেশ যে ভেতরে ভেতরে এত জড়িয়ে পড়েছে কে জানত? অত বড় ছেলে, অত বড় মেয়ে—

ভাদুড়ী মহাশয় আবার বলিলেন, ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!

খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে, শ্যামা পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু-ধোপার নিকট মার খাইয়াছিল। মল্লিক মহাশয় শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, কথাটা আর কারও কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি?

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ কথাটা? মল্লিক মহাশয় থতমত খাইয়া কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন।—কেন সে পিরু ধোপার নিকট গিয়াছিল? একি আহাম্মকি!

সুতরাং মল্লিক মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি মুকুজ্জে মহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিকুর বাড়িতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল, মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিস নি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।

এবারও বিস্মিত পিকু কহিল, মানে? কি বলছেন? মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, মানে? ও কিছু নয়, বুঝলি?—বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, পিকু একেবারে ক্ষেপে আছে হে। মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে।

সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত। বেচারী মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিকুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই ভাবিল এবং হাসিল, মল্লিক মহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন।

যাই হোক, শৈলেশ্বর বাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুকুজ্জে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুকুজ্জে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ।

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাত ছোট নয়। অনেকগুলি বনিয়াদী ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বরবাবুর বিপক্ষ দলও একটি ছিল, এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন, সেইহেতু তাঁহার বিপক্ষ দলটি বেশ ভারীও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, হালদার মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে, শৈলেশ্বর-বাবু নাকি খুলনা গেছেন।

হুঁকাতে টান মারিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, হালদারকে ব'লে দিও হে, সূর্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন, আহা, চট কেন! এ কথা হালদার বলবে না তো কে বলবে বল? ওই দলটার সব কটা পাজী।

বুড়ো মিত্তিরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাস্টারি করেন!

ভাদুড়ীর বা কি কম! রোজ ওঁর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়ার অর্থ কি?

বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই।

তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন, সব ঘুঘু।

পাড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন।—এই বলিয়া রায় মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

দুই

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুখুজ্জে মহাশয়, মুখুজ্জে মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলী মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শৈলেশ্বর বাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত ক্রমশঃ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে, ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও যান নাই—কারণ স্টেশনের কর্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথাও গিয়া স-রঙ্গিনী আত্মগোপন করিতেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানীটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছেন।

তিন

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বরবাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে ভীত-চকিত শৈলেশ্বর-গৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকূল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসায়ন দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল।

ওমা, কি ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না!—বলিয়াই অনেকেই গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাত্‌ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই। একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি—বাস্‌!

হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির সুর দিয়া বলিলেন, উনি তো বলছিলেন—শৈলেশ্বরবাবু খুলনা গেছেন।

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, থাম্‌ লো থাম্‌। আমার কর্তাটিও ওই দলে। সব চোরে চোরে মাসতুত ভাই! বলে দিয়েছি এবার স্পষ্ট করে যে, ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবে দাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ ক'রে বসে থাকবে। বুড়ো মিনসের অত আড্ডা দেওয়া কেন?

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর কাঁদি-নথ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। মরিয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন, কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা-ধোপানীর সংস্রবে দেখি নি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু-ধোপা। শ্যামা তো কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ি।

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, এই বুদ্ধি না হ'লে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন? তারা যা করবে, তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগি মোক্তার। তার সঙ্গে চালাকি! পুরুষমানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, নজরবন্দী ক'রে রাখা। চোখে চোখে রাখা। যা বললেন আমাদের গাঙ্গুলীদিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্‌।

চার

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব বি. এ. পাশ করিয়াছে। যাদব আই. এ. পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে? তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটা ঘুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুই পক্ষের মধ্যে

ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছিল। হালদার মহাশয়ের উপর ধনী রায় মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নামে ভাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাদুড়ী মহাশয় মানিক পোদ্দারের নিকট হাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙ্গুলী মহাশয়ের উস্‌কানিতে পোদ্দারের পো ভাদুড়ী মহাশয়কে চাপ দিতে শুরু করিয়াছে। মল্লিক মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষ দলের কাহারো বাড়ি আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা হইতে 'সরল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা' নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারিখানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কি করিয়া বিপক্ষ দলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোষ্টমাষ্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপার মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, Everything is fair in love and fight—শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব, তবে ছাড়ব।

পাঁচ

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

হঠাৎ শ্যামা ধোপানি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ি গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল, যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীনের দল কতকটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন, ভূতের কাছে মামদোবাজি! মামার বাড়ি! পিরু ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়ই। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে তো'

শৈলেশ্বর মোক্তার ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া। গ্রামের একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূয়া ছিল। তাহারাই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

সুগাল স্বপ্ন

এক

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুল-সুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি। তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল, হাসি, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল, তা না হ'লে বলব না।

হাসি বলিল, বলুন না—কি ?

কি দেবে বল আমাকে ?

কি আর দিতে পারি আমি ? আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এমব্রয়ডারি ক'রে দেব। চমৎকার প্যাটার্ন পেয়েছি একটা।

না, ওতে আমি রাজি নই।

তবে কি চাই আপনার ? চকলেট আছে দিতে পারি।

আমি কি কচি খোকা নাকি ? চকলেটে তুষ্ট হব।

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল, তা হ'লে শুনতে চাই না, যান। এমব্রয়ডারি করে দেব বললাম, চকলেট দিতে চাইলাম, তাতে যখন আপনার—

সুধীর বলিল, চললাম তা হ'লে।

হাসি আবার ডাকিল, বলবেন না কিছুতে ?

একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে সেদিন যা চেয়েছিলাম ! —বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল।

বলিল, আপনাকে বলেছি, তা হয় না।

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে ভাবিল, সুধীর

বলিতেছে—মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ কর আমায়। শুনে এলাম, তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে।

বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল, সুধীরদা, শুনে যান।

সুধীর ফিরিয়া আসে নাই।

দুই

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা যাহাকে একবার দেখিবার জন্ম অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত, কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে!

অলকা আসিয়া বলিতেছে, আচ্ছা অজয়দা, ইংরেজীতে 'পেট' ব'লে কোন কথা আছে নাকি?

অজয় বলিল, হ্যাঁ আছে, 'পেট' মানে মাথা।

সত্যি?

অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা।

আমাদের বরুণাদি তা হ'লে ঠিক বলেছেন তো!

অজয় বলিল, আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরেজী কি বল তো?

অলকা মিটিমিটি তাকাইয়া বলিল, হেড।

হেড মানেও তো মাথা।

মুণ্ডু মানেও তো মাথা।

অজয় হাসিয়া বলিল, এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষার জ্ঞান! মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু!

অলকা হাসিয়া বলিল, তফাত কি?

অজয় গম্ভীরভাবে বলিল, তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচি ধোপানীটার সঙ্গে কোন তফাত নেই তা হ'লে বল! দুজনেই তো মেয়েমানুষ!

অলকা জিজ্ঞাসা করিল, পাঁচি ধোপানীটি কে?

ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমার বয়সী হবে।

অলকা বক্র হাসি হাসিয়া কহিল, আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে আরম্ভ করেছেন! ধোপানী পর্যন্ত বাদ পড়ে না।

অজয় বলিল, নিশ্চয়। নিজের জিনিসটি যে ভাল, সেটা যাচাই ক'রে দেখে নিতে হবে না?

কে আপানার নিজের জিনিস?

আছে একজন।

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * *

দুইটি স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয়, স্বামী-স্ত্রী।

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময়ী আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা। ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন?

প্রেম! হইতে পারে বইকি। এই জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়নপল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ, প্রেম হইতে পারে, সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল তো। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ-দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাকে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল।

হয়তো এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণ-দাকেই তাহার বার বার মনে পড়িতেছে। নির্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়তো এই অশ্রু-তর্পণ। তবে ইহাও ঠিক যে, তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্তাটি সে অরুণ-দাকে কখনও জানায় নাই। মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয়, কিন্তু বিপিন—বিপিন। একেবারে খাঁটি বিপিন। এবং আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালও বাসিয়াছিল। ভালবাসিয়া সুখী হইয়াছিল। সহসা আজ নিশিথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দাকে মনে পড়িয়া আঁখিপল্লব জল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীতপ্রবণ ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত। সে সম্বন্ধে চট্ করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না। বস্তুত স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন-কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয়, বয়স বোধ হয় উনিশ-কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহারও বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনেরো বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

সুতরাং নারী সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্তত: করা সঙ্গত ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেইজন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যতদূর জানি, তাহাতে তাহাদের ডিটেকটিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণ-দার কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি

সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্বে ডিপ্‌থিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী-হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই দিন 'ফিট' হয়—ইহা তো আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে, তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমলহৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ, আর একটা কারণও হইতে পারে। পুত্রশোক-প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন—কিন্তু সুলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। গত কয়েক দিবস হইতে একটি নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা-হাউসে দেখানো হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নরনারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে, প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমায় লাষ্ট শো হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়ন-ঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল। হয়তো তাহাতেই সুলেখার শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়? সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য সিট্ বুক করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে। তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক না বিপিন লোমশ—সে মানুষ তো! তা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকেরা—বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে, সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমন কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষমানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে, বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চীৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদুভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন, সুলেখা সম্ভবতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে।

কারণ যাহাই হউক, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ। রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর। কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন, তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং আকাশপ্লাবিনী হউক না কেন, এ বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ আমরা একমত যে, এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ি কাঁদিলে আমরা এত আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়তো বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে, এবং এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না নির্ণয় করা পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না, এমন কি অরুণ-দা-কে জড়াইয়া একটা সন্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, কেন, নয়? এমন চাঁদনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি? ওই তো দূরে 'চোখ গেল' পাখি অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্নবিহ্বল—চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লক্ষণে অরুণ-দর কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব না অপরাধ? মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবতঃ। কি এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?

না। বড্ড কন্‌কন্‌ করছে।

এই পুরিয়াটা খাও তা হ'লে। ডাক্তারবাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কি হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি।

জ্যোৎস্নার টুকরাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে !

দেখিলেন তো ? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোরবাবু উকীল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরীব প্রজার সর্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্বপ্রকার কার্যেই তিনি বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একজন বিধবার সম্পত্তি-ঘটিত একটা মামলা তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু উদ্বিগ্ন ও অন্যমনস্ক আছেন।

এমন সময় আর একজন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি তা জানেন তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে ?"

"বত্রিশ টাকা !"

"আচ্ছা, বেশ—।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি তারও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান তো?"

"হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান", বলিয়া রামকিশোরবাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জানতে আশা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?"

নস্যের টিপটা নানারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন, "ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা তো নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাকিলেও সব সময় কি সব জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেন্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই। এই সব বাজে সেন্টিমেন্ট নিয়েই তো আমরা ডুবতে বসেছি!"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা যোগাইল। ভিতরের মন নির্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, "ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তাহলে সম্পত্তি কারা পাবে?"

আইন অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোর-বাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন . .

—ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার তো শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে

করছি, তাই আপনাদের বললাম—আপনার সেন্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন, "না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই তো আপনার কাছে আসা।"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন একটি গাড়ি আসিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ি হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়িতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া-চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া-চাকরটা ট্রাঙ্ক, বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপরে নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী।"

ব্যবহারে বোঝা গেল ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীর ব্যবহারে সে আশ্চর্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

"কাছারীতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক হইয়া গেলেন, "এ কি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে!"

"ও বাড়িতে থাকা আর পোষাবে না।"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশঃই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে! তুমিও তো মত দিয়েছ।"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে

"ওরা একজন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—"

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

হতবাক রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ, বাবা?"

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এই—শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুণী-সম্পর্ক-বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেইমুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ান কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের 'কম্‌বাইন্‌ড হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাট্‌লেট' বানাতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ্‌ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত, তখন সেই একই বাড়িতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাহ বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্বদা লাঠালাঠি করিতেন, মোটেই

তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম. এ. পাস—নরেশ কেমিষ্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাবে নগদ টাকাও দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়িতে ইহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়িটি বেশ বড়। এত বড় যে, ইহাতে দুইতিনটি পরিবার পুত্র পৌত্রাদি লইয়া বেশ বড় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন—'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটি'র ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন—নির্মলা সত্যিই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই মাত্র।

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্বেও এই বাড়িতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলি মাত্র শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম এই—"আমরা চললাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।" পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন— বাকী অর্ধেকটা তা'হলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক!" তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কি?

পল্টু নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত

তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ে কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ; তিনি স্বভাবতঃই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত?"

"বেশ দেখাও—"

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল; পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্টিটা দেখালে কেমন হয়? কি বল?"

"বেশ তো! তবে, যাই কর এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড!"

"তাই না কি?"

পল্টুর কোষ্ঠী লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ি ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—

"কবিরাজী ওষুধে তো বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি ?"

"তাই ডাক না হয়—"

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায় !"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক !

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চললাম, ফিরতে দু' একদিন দেরি হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন ?"

"বাবার কাছে ধর্না দেব—"

নরেশ কিছু বলিলেন না, ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ন নিয়েছে।"

ডাক্তারী চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে, রোগীকে যেন ইন্‌জেকৃশন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ান চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্‌জেকৃশন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই।

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন ! "ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে।"

"অ্যাঁ, বল কি ?"

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হাঁ, হাঁ, আমার ইন্‌জেকশন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইন্‌জেকশন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

. এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাঁড়টা পাড়িয়া চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পণ্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পণ্টু খাও—খাও তো বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চরণামৃত কশ বাহিয়া পড়িয়া গেল

বুধ্‌নী

এক

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—এ-কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু, সে শিখা নিবিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি !

সে দোষী কি নির্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়তো তাহাকে লইয়া মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত-করুণ চীৎকার না শুনিতাম !

"বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী !" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।

দুই

হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্বত্য পল্লীতেই একদা ধনুকধারী বিল্‌টু শিকার সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক

মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া খচিত মহুয়া তরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্য-ভরে চলিয়া যাইত, বিল্টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্তা হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে, কিন্তু বিল্টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

তিন

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদুর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদুর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদুর লাগাইলে কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়! সেই কুমারীর আত্মীয়-স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্বাণ, সড়কি, বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্ত দিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল, বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্টু বুধ্নীকে জয় করিয়াছিল। এই তো সেদিনের কথা! এখনও দুই বৎসর পুরা হয় নাই।

চার

অসভ্য বিল্টু জংলি বুধ্নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্য লোক, বর্বর বন্যদম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই। যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দূলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে; পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই! এক দণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্বতে গুহায় এই বর্বর দম্পতী অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল, বিল্টুর হাতে বাঁশের বাঁশী—এই সম্বল।

পাঁচ

সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল!

বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু! বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল! বিল্টু দেখিল—একি! বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধ্‌নী তো তাহার আর একার নাই! অসহ্য!

ছয়

বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চীৎকার করিয়া গেল—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না!

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে—অমনি মুখের উপর থপ্‌ করে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই—ডানা নেই—কিম্ভূতকিমাকার। রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্‌ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখিদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ ওপাশ ক'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমাদের বাড়ির হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার—কবিরাজ—ওঝা—বদ্যি কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাড়িতে কান্নার তুমুল হাহাকার।

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত অজ্ঞান। তাঁকে নিয়ে বাড়ির কয়েকজন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানি না—সেই পাখির ছানাটার কথা মনে পড়ে গেল।

সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখির ছানাটি, আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকার।

হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

অমলা

এক

অমলাকে আজ দেখতে আসবে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবি না আঁকলে। সুন্দর, সুশ্রী, যুবা—বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবী—সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাবলে—'আমার ঠাকুর-পো'।

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে।

বিয়ে কিন্তু হ'ল না—দরে বনল না।

দুই

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবার অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে, বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা—ধপ্‌ধপে রঙ—কোঁকড়া চুল—সোনার চশমা—দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

. ভাবলে—কত কি ভাবলে!

এবার দরে বনল—কিন্তু মেয়ে পছন্দ হ'ল না!

তিন

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হ'ল—দরেও বনল—বিয়েও হ'ল। পাত্র বিশ্বেশ্বর বাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—বি. এ. পাস—সদাগরি আপিসে চাকরি করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হ'ল—তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভরে গেল। এই শান্ত-শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

অদ্বিতীয়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন —মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধি সত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেককাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার

শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি তিন চার ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধহয় পাইয়াছেন।"

পাইলাম তো। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি তো বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি…"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না।

দুই

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তো তা বলে সংসারটা ছারখার করা তো ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।……এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বল, সম্বন্ধ করি। আমার তো মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে তো সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তাছাড়া দেখ আমরা "মা ফলেষু

কদাচন" দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখবার চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়। ··দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ অপছন্দ! তোমার পছন্দ হয়েছে তো?···"

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিডনি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বার বার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে? ···মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?···এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা, প্রভার আত্মার যদি···গৃহ্যামি গৃহ্যামি···

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসরঘরেও শুনিলাম—ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ, কে আমোদ-প্রমোদ করিতে চায়। মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ উৎসব জমে নাই।

*　　*　　*

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে।

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান

ও আরও এক নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া। স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিত হ'ল!"

তার মানে?

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে 'হাতী হবে'। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে।" আমি বললাম—কক্ষনো নয়! তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়যন্ত্র। আমি শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যাবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিত। পাড়ার মানকে ছোঁড়াকে কনে সাজিয়ে সেজদি বাজি জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন। ছি ছি—কি তোমরা! অমন গোঁফটা কি ব'লে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

* * *

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠলে যে বাঁচি!

ত্রিস্রোতা

এক

ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়—বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রচণ্ড সংযমী, অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যহ মুগুর ভাঁজিতেন, তিনবার দন্তধাবন করিতেন, দুই বেলা স্নান করিতেন। পালোয়ানের মত স্বাস্থ্য। লেখাপড়াও জানিতেন, শোনা যায় তিনি বি. এ. পাস। দরিদ্র নন, খাইবার পরিবার সঙ্গতি আছে, চাকুরি করিতে হয় না। পৈতৃক জমিজমা যাহা আছে, তাহাতেই চলিয়া যায়। হাতে দু'পয়সা আছে। কিন্তু ত্রিগুণাবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ—তাঁহার মৌলিকতা। এবং তাঁহার মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।

তাঁহার দৈনন্দিন জীবন-ধারণ প্রণালী সংক্ষেপতঃ এই। তিনি উঠিতেন খুব ভোরে। উঠিয়াই কার্বলিক লোশনে ভিজানো নিমের দাঁতন লইয়া দন্ত-পরিষ্কার করিতেন। তাহার পর করিতেন ব্যায়াম—মুদ্গর, ডাম্বেল, ডেভালাপার। অর্ধঘণ্টা কাল ব্যায়াম করিয়া তিনি ঘর্মাক্ত-কলেবরে নিকটবর্তী নদীটিতে গিয়া অবগাহন স্নান করিতেন।

স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ি ফিরিতেন ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে অবগাহন স্নান করা তাঁহার চা-ই। বাড়ি ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন।

আপনারা হয়তো ভাবিবেন চা খাইবার জন্য।

মোটেই তা নয়। কোনরূপ মাদকদ্রব্যের বশীভূত তিনি ছিলেন না। স্টোভ জ্বালিয়া তিনি ভাতে-ভাত চড়াইয়া দিতেন। স্টোভের নিকট বসিয়া তাঁহাকে আহ্নিকটাও শেষ করিয়া লইতে হইত। প্রাণায়ামও করিতেন। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পুর্বেই ত্রিগুণাবাবুর আহ্নিক স্নান আহার সমস্তই সমাধা হইয়া যাইত। কমপ্লিট্।

তিনি বলিতেন, যখন খাইতেই হইবে, অনাহারে থাকা যখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত, তখন ও বখেড়া সকাল সকাল চুকাইয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সমস্ত দিন সময় পাওয়া যায় কত !

আহারাদি শেষ করিয়া তিনি এক জোড়া মিলিটারী বুট পরিধান করিতেন। মিলিটারী বুট পরিলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন, ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না। তিনি বুটজুতা পরিতেন কেবল বখেড়া মিটাইয়া রাখিবার জন্য। একবার সকালে উঠিয়া বাগাইয়া পরিয়া ফেলিতে পারিলে, বাস, নিশ্চিন্ত।

অন্য জুতা পরিলে বার বার খোল আর পর—খোল আর পর। সময় নষ্ট হয় কত ! তাহার পর তসরের কাপড়টি মালকোঁচা মারিয়া পরিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন। তসর কাপড়ের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ছিল ওই একই কারণে। একবার কিনিলেই কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত।

আরও দুইটি জিনিস তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

একটি মোটা বাঁশের লাঠি। যেমন-তেমন লাঠি নয় ; বেশ শক্ত তৈলপক্ক গাঁটে গাঁটে লোহার তার জড়ানো সমর্থ একখানি লাঠি। আর থাকিত চামড়ার একটি বড ব্যাগ,—পোস্টাফিসের পিওনরা সাধারণতঃ যে জাতীয়

ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলি করিয়া বেড়ায়, সেই জাতীয় একটি ব্যাগ। ব্যাগটি তিনিও কাঁধে ঝুলাইয়া লইতেন। ব্যাগটিতে তাঁহার টুকিটাকি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য থাকিত। যথা—কপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক, শুকনো খেজুর, টিঞ্চার আয়ডিন ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া মাথায় তাঁহার একটি টোকা থাকিত। যে টোকা পরিয়া কৃষকগণ মাঠে চাষ করিয়া থাকে। রৌদ্রবৃষ্টি নিবারণকল্পে বেশ মজবুত গোছের একটি টোকা ত্রিগুণাবাবু কৃষকদের দ্বারাই প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। ছাতার বখেড়া মিটিয়া গিয়াছিল। সর্ববিষয়ে গোড়া বাঁধিয়া এবং বখেড়া মিটাইয়া কাজ করাই ত্রিগুণাবাবুর বিশেষত্ব। দাড়িগোঁফ সম্বন্ধেও তিনি বখেড়া মিটাইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা মনের আনন্দে বাড়িয়া, তাঁহার মুখ তো বটেই, বুক পর্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল।

ত্রিগুণাবাবু জামা পরিতেন না।

প্রশ্ন করিলে গোছা গোছা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ভ্রূর অন্ধকারে অবস্থিত তাঁহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিত। বলিতেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামা একটা বখেড়া নয় কি?

সকলেই স্বীকার করিত, বখেড়া।

বাঁশের লাঠিটা ভীষণদর্শন।

ত্রিগুণাবাবুও রাগী লোক।

সুতরাং বখেড়া বাড়াইয়া লাভ কি!

কিন্তু যখন মিলিটারী বুট পায়ে, মালকোঁচা-মারা, উপবীতধারী, নগ্নগাত্র বলিষ্ঠ বখেড়া-বিরোধী ত্রিগুণাবাবু হাতে বাঁশের লাঠি, কাঁধে চামড়ার ব্যাগ এবং মস্তকে টোকা পরিয়া পথে বাহির হইতেন, তখন তাহা সত্যই একটি দেখিবার মত দৃশ্য হইয়া উঠিত।

অনেকে হাসিত—

অনেকে ঠাট্টা করিত—

অনেকে প্রণাম করিত।

ত্রিগুণাবাবু অবশ্য এ সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। প্রাকৃতজনের স্তুতিনিন্দা তাঁহার নিকট চিরকাল উপেক্ষার বস্তু ছিল।

স্ত্রী? তিনি বহুপূর্বে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাবাবুর দুইটি পুত্র অবশ্য আছে। তাহারা মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছে। তাঁহাদের নামকরণ ব্যাপারেও ত্রিগুণাবাবুর মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

একজনের নাম রাখিয়াছিলেন—রায় বাহাদুর, আর একজনের—রায় সাহেব।

বলিয়াছিলেন, রায় বাহাদুর আর রায় সাহেব হবার জন্যে পরে হয়তো ব্যাটারা প্রাণপাত করবে। আগে থাকতে বখেড়া মিটিয়ে রাখাই ভাল।

দুই

অতি প্রত্যূষে আহারাদি শেষ করিয়া ত্রিগুণাবাবু চার ক্রোশ দূরবর্তী কিষণপুর গ্রামে চলিয়া যাইতেন। সেখানে তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য—গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু ব্রহ্মচর্যের উপযোগিতায় আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে। গোড়া বাঁধিয়া কাজ করাই তাঁহার নিয়ম।

সুতরাং তিনি অল্পবয়স্কদের, বিশেষ করিয়া বালকদের লইয়া পড়িয়াছিলেন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, ইহার জন্য তাঁহাকে চার ক্রোশ দূরে যাইতে হয় কেন? নিজের গ্রামে কি বালক ছিল না?

ছিল।

কিন্তু কেহ তাঁহাকে আমল দিত না।

গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না—এ কথা সুবিদিত।

চার ক্রোশ দূরে ত্রিগুণাবাবুর কয়েক বিঘা জমি প্রজাবিলি করা ছিল। প্রজাদের উপর তাঁহার প্রভাবও ছিল।

সুতরাং তাহাদের পুত্রদের তিনি অনায়াসে ছাত্ররূপে পাইয়াছিলেন। বালকেরা সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্যবিষয়ক উপদেশ লাভ করিয়া তাহার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে মামুলী লেখাপড়া শিখিতে যাইত।

একটি সুবিশাল বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াই ত্রিগুণাবাবু তাঁহার উপদেশাবলী বিতরণ করিতেন।

একদিন হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে বখেড়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। ত্রিগুণাবাবু বখেড়া-বিরোধী।

সুতরাং তিনি বখেড়া মিটাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে চাঁদার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই বটবৃক্ষতলেই একটা পাকাঘর তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

তিন

কিন্তু অকস্মাৎ নূতন একটা বখেড়া বাধিয়া গেল।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়া দেখেন, ব্রহ্মচর্যলোলুপ তাঁহার সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করিতেছে।

ত্রিগুণাবাবু আসিতেই ত্রস্ত হইয়া তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিল। মাসিক-পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

তুলিয়া তিনি দেখিলেন।

দেখিবামাত্রই চক্ষু-স্থির।

প্রথমেই মলাটের উপর ঢেউ-খেলানো রঙিন অক্ষরে লেখা—'মর্ম্মী'।

তাহার পর পাতা উল্টাইতেই একটি নগ্ন নারীমূর্তি!

তাহার পরই একটি কবিতা।

কবিতার ছন্দ বোঝা যায় না—

অর্থ কিন্তু পরিষ্কার।

পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তাহার পরেই একটি গল্প—

একটি রোগা-গোছের ছোকরা একসঙ্গে চারিটি তরুণীর মহড়া লইতেছে।

এ তো ভয়ানক কাণ্ড!

পত্রিকা হইতে মুখ তুলিয়া ত্রিগুণাবাবু দেখিলেন, সব সরিয়া পড়িয়াছে। একটি ছাত্রও নাই।

চার

সেইদিনই ত্রিগুণাবাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ঠিক ইহার দুই দিন পরে যে সংবাদটি চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল, তাহা বাস্তবিকই চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর। তাহা এই।

'মরমী' কাগজের সম্পাদক গুরুতররূপে আহত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মাথা ফাটিয়া গিয়াছে।

চিত্রকর নিধিরাম বসাকও অজ্ঞান অবস্থায় শয্যাশায়ী। তাঁহার মস্তকের আঘাতও সাংঘাতিক।

গল্পলেখক সুজিৎ সেনের দক্ষিণ হস্তটি শোচনীয়ভাবে জখম হইয়াছে। ডাক্তারেরা বলিতেছেন, তাহা কাটিয়া না ফেলিলে নাকি তাঁহারও জীবন-সংশয়।

কবি অমিয় পালিত মারা গিয়াছেন।

একজন ভীষণদর্শন লোক অকস্মাৎ 'মরমী' অফিসে ঢুকিয়া বিনা কারণে উক্ত মনস্বী-চতুষ্টয়কে আচম্বিতে আক্রমণ করে এবং একটি বাঁশের লাঠির দ্বারা তাঁহাদের গুরুতররূপে প্রহার করিতে থাকে। লোকজন আসিয়া পড়া সত্ত্বেও কিন্তু কেহ গুণ্ডাটাকে ধরিতে পারে নাই। সে সকলের হাত ছিনাইয়া ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

বুঝিলাম, আর কেহ নয়—ত্রিগুণাবাবুই।

বখেড়া মিটাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।

পাঁচ

ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ।

কোন সঠিক খবর তাঁহার কেহ পাইতেছে না।

নানারূপ গুজব রটিতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, তিনি তরুণ সাহিত্যিকগণকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে একটি টেররিস্ট দল গড়িয়া তুলিতেছেন।

কাহারও মতে তিনি ভারতবর্ষেই নাই, খালাসীর বেশে জাহাজে চাপিয়া রাশিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

আর একদল দৃঢ়ভাবে বলিতে লাগিল, ওসব বাজে কথা, তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়া অরবিন্দের শিষ্যদলভুক্ত হইয়াছেন।

এইরূপ নানা কথা।

লোকে কিন্তু এক কথা বেশিদিন বলিতে চাহে না।

তাহারা ক্রমশঃ ত্রিগুণানন্দের কথা ছাড়িয়া অন্য কথায় মাতিল।

ত্রিগুণানন্দ-গুজব-ভারাক্রান্ত দিবসগুলি ক্রমে ক্রমে কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

লোকে ক্রমশঃ ত্রিগুণাবাবুর কথা ভুলিতে লাগিল। এমন কি পুলিসও।

ছয়

আমারও মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এ সময় একখানি চিঠি আসিয়া হাজির।

ত্রিগুণাবাবুরই চিঠি।

লিখিয়াছেন—

ভায়া,

অনেকদিন পরে আমার চিঠি পাইয়া সম্ভবতঃ বিস্মিত হইবে। বিস্ময়ের কিছু নাই, এতদিন আত্মপ্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কলিকাতায় যে কাণ্ড করিয়াছিলাম, খবরের কাগজের মারফৎ আশা করি তাহা অবগত আছ। পরে বুঝিয়াছিলাম, কাণ্ডটি করিয়া ভুল করিয়াছি। বখেড়া অত সহজে মিটিবার নয়। আমি যে-ভাবে উহা মিটাইতে চাহিয়াছিলাম, সে-ভাবে মিটাইতে হইলে কলিকাতা-সুদ্ধ সবাইকে খুন করিতে হয়। কলিকাতা শহরে, যেখানে যত মাসিক পত্রিকা বিক্রয় হয়, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। সমস্ত স্টলগুলি পরিদর্শন করিয়া, সিনেমা দেখিয়া এবং আধুনিক যুবক-যুবতীদের সংস্পর্শে আসিয়া এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল, রক্তারক্তির রাস্তা ধরিলে সকলকেই সাবাড় করিতে হয়, কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ঠগ বাছিতে গেলে গ্রাম উজাড় করিতে হয়। কিন্তু কলিকাতা উজাড় করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং ও-পথ আমার পক্ষে অপ্রশস্ত। পুলিসের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে সিনেমা দেখি, এবং চিন্তা করি, কি উপায়ে বখেড়া মিটানো যায়। ইহাই যদি দেশের প্রগতি হয়, তাহা হইলে

সে-প্রগতির শেষ ফল দেখিবার জন্য শেষ পর্যন্ত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে কি? থাকিবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস।

এ অবস্থায় কোন্ পন্থা অবলম্বন করা সংগত তাহাই এক রাত্রে শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মনে হইল মানস-পটে সিনেমা দৃষ্ট, এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে। মুখখানি যেন আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বলা বাহুল্য একটু বিস্মিত হইলাম।

কিন্তু যাক্, ঈশ্বরেচ্ছায় কিছুক্ষণ পরে মুখটি মন হইতে সরিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুমাইবার পরই বোঝা গেল, বখেড়া মিটে নাই, কারণ সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখিলাম। স্বপ্নে কি ঘটিল লিখিতে পারিব না। এইটুকুই শুধু জানিয়া রাখ, তাহা অবর্ণনীয়।

ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠিলাম, দেখিলাম, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে এবং হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরে মাথা কুটিতেছে। স্বপ্নের ভয়ে সমস্ত রাত জাগিয়া রহিলাম। কিন্তু দেখিলাম, জাগিয়াও নিস্তার নাই, মুখটি ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

এইরূপ প্রত্যহ। কোনদিন সিনেমায়-দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে-দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায়-দেখা তরুণী, একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।

বলিব কি ভায়া, শেষটা উত্যক্ত হইয়া উঠিলাম।

ভয়ও হইল। চিন্তা করিতে লাগিলাম, এ অবস্থায় প্রতিকার কি! মাঝে মাঝে রাগও হইত, কিন্তু স্বপ্নের মাথায় তো লাঠি মারা যায় না। ঘোর জালে পড়িয়া গেলাম। বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা—কথাটা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতে লাগিলাম।

এইভাবে দিন যায়। ক্রমশঃ এই সত্যটি আমার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে, আমার মনের কামনা মরে নাই, ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবি করিতেছে।

কি উপায় করি চিন্তা করিতে লাগিলাম।

একদিন সহসা একটি পৌরাণিক গল্প মনে পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিল।

তোড়ের মুখে পড়িলে মহাশক্তিশালীও কাবু হইয়া যায়।

আশা করি, তুমি গল্পটা জান।

···সুতরাং, কালবিলম্ব না করিয়া বখেড়া মিটাইয়া ফেলিয়াছি। কিছু অর্থব্যয় করাতে পুলিসের বখেড়াও মিটিয়াছে। আগামী পরশ্ব গ্রামে পৌঁছিব। তুমি আমার বাড়িটা পরিষ্কার করাইয়া রাখিও। সম্ভব হইলে দেওয়ালগুলিতে চুনকাম করাইয়া দিও। মোট কথা চতুর্দিক বেশ পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। সাক্ষাতে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

ইতি—ত্রিগুণানন্দ।

সাত

ঐরাবত আসিতেছেন।

স্টেশনে গেলাম।

যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।

সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।

ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

ঐরাবত 'ক্লীন শেভ্‌ড', গোঁফ-দাড়ি একেবারেই নাই।

মাথায় দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা।

মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।

পরিধানে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি।

পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পস্‌।

হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।

সর্বাঙ্গ হইতে ভুরভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে।

আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

চমক ভাঙিল, যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন, হাঁ ক'রে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি। বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।

হেঁট হইয়া বউদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

খড়মের দৌরাত্ম্য

এক

ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, দশ-আনা ছ-আনা চুল, পরনে বিচিত্র লুঙ্গি, মুখে সর্বদা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ—এ-হেন লোকের নাম রাধাবল্লভ। পিতামহ প্রদত্ত নাম। রাশিয়ায় শুনিয়াছি নাম বদলাবার সুযোগ আছে। এ দেশেও অনেক ছাত্রী-ছাত্রী নাকি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে নিজেদের পছন্দসই নামকরণ করিয়া থাকেন। রাধাবল্লভ একবার ম্যাট্রিক দিবার সুযোগ অবশ্য পাইয়াছিল, কিন্তু নাম বদলাইবার কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। পৃথিবীতে এই সব অঘটন কেন ঘটে তাহা বলা শক্ত। সে দুরূহ গবেষণায় প্রবৃত্ত না হইয়া আমি শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, রাধাবল্লভের নামটা আরও একটু আধুনিক হইলে যেন মানাইত ভাল। কারণ রাধাবল্লভ সত্যই একজন আধুনিক যুবক। চিন্তায়, পোশাকে, কথায়-বার্তায়, বিশেষ করিয়া উপার্জন ব্যাপারে রাধাবল্লভ একেবারে অতি-আধুনিক। 'ব্রিজ' এবং 'ফ্লাশ' খেলায় সুদক্ষ। এই পথে তাহার অর্থাগমও হয়। হয় বলিয়া রাধাবল্লভের মাতুল রাধাবল্লভের নিকট কৃতজ্ঞ। কারণ সিগারেট ও সিনেমার খরচটা তাঁহাকে যোগাইতে হয় না। এই বাজারে তাহাও কম লাভজনক নয়।

দুই

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করিবার পর হইতে রাধাবল্লভ তারুণ্যচর্চা করিতেছে। তারুণ্যচর্চা বলিতে কি বুঝায়, তাহা এযুগের পাঠকপাঠিকাগণ নিশ্চয়ই বুঝেন। বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। নিরঙ্কুশভাবে তাহার তারুণ্যচর্চা চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন বেচারা ঘা খাইয়া গেল।

মহাদেব-ঘায়েলকারী দুষ্ট দেবতাটি হঠাৎ একদা রাধাবল্লভ পোদ্দারকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার অব্যর্থ শর-সন্ধান করিলেন। মদনাহত মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সুবিদিত। মদনাহত রাধাবল্লভ পোদ্দার কি করিয়াছিল, তাহা হয়তো অনেকে জানেন না, আমি জানি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বেচারা ধারে খানিকটা 'স্নো' কিনিয়া ফেলিয়াছিল। আয়না, স্নো এবং রাধাবল্লভ যখন পরস্পর পরস্পরে নিমজ্জিত, তখন কিন্তু পিতামহ প্রজাপতি যে ভ্রূকুটিকুটিল মুখে পায়ের খড়ম খুলিতে লাগিলেন আবেগজর্জরিত রাধাবল্লভ তাহার বিন্দুবিসর্গও টের পাইল না।

তিন

পুঁটি নাম্নী যুবতীটিই একদা রাধাবল্লভের হৃদয়-নাট্যনিকেতনে বিনা নোটিশে হঠাৎ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া গেল ট্রামের জানালা গলিয়া। কখন পৃথিবীতে কি ভাবে যে কি ঘটে, তা বলা দুষ্কর। পুঁটির সম্বন্ধের মধ্যে অবশ্য তাহার বয়স। কিন্তু সেই বয়সটা কত—ষোল কি ছাব্বিশ, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার পূর্বেই বেচারা রাধাবল্লভ মুগ্ধ হইয়া গেল। একবার মুগ্ধ হইয়া গেলে আর চালাকি চলে না। মন-রূপ অশ্বের মুখ হইতে মানুষ তখন যুক্তি-রূপ বল্গা খুলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। ঘোড়া চার পা তুলিয়া লাফাইতে থাকে। হইলও তাহাই। মুগ্ধ রাধাবল্লভ নূতনভাবে হ্যারিসন রোডে ঘুরিতে লাগিল। অথচ ব্যাপারটা এমন কিছু অসাধারণ নয়। এমন তো কতবারই ঘটিয়াছে। হ্যারিসন রোডের ট্রামে আসিতে আসিতে কত বার কত মেয়েই তো রাধাবল্লভের চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু এই ত্রিতলবাসিনী গবাক্ষবর্তিনী পুঁটিকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তরের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন একযোগে বলিয়া উঠিল, মোনালিসা! আধুনিক ঔপন্যাসিকদের সমস্ত নায়িকা আসিয়া যেন রাধাবল্লভের মন-প্রাঙ্গণে শঙ্খ হস্তে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল পুঁটিকে বরণ করিবার জন্য। এমন তো আগে হয় নাই।

এত বড় বিপর্যয় রাধাবল্লভের জীবনে আর কখনও হয় নাই। প্রেমে পড়িলে শোনা গিয়াছে জ্যোৎস্নাকে উত্তপ্ত এবং রৌদ্রকে হিমশীতল বলিয়া মনে হয়। রাধাবল্লভের স্পর্শ-শক্তির কোন বৈকল্য ঘটিল না বটে, কিন্তু তাহার জনবহুল হ্যারিসন রোডকে নিতান্ত নির্জন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ওই ত্রিতল বাড়িটা ছাড়া যেন হ্যারিসন রোডে আর কিছু নাই, বাকি সব হাওয়া—প্রেমাক্রান্ত রাধাবল্লভের এইরূপ ধারণা হইল। এই ধারণার বশবর্তী হওয়াই বোধহয় রাধাবল্লভ সেদিন ঠিক হ্যারিসন রোডের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে ঊর্ধ্ব-মুখ হইয়া শিস-যোগে পুঁটিকে প্রেম নিবেদন করিতেছিল। এমন সময় পিতামহ প্রজাপতির খড়মখানা সজোরে আসিয়া লাগিল। কোথায় যে লাগিল, তাহা ঠিক করিয়া দেখিবার পূর্বেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া গেল।

খড়মখানা আসিল অবশ্য 'লরি' রূপে।

চার

দয়ার শরীর ছিল বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি জীবনে বহুবার নাস্তানাবুদ হইয়াছিলেন। দয়ালু রামকিঙ্কর হাজরাও হইলেন। নিতান্ত দয়াপরবশ হইয়াই হাবলি-মিণ্টা-পল্টু-বিশু-খোকনের পিতা ছাপোষা হাজরা মহাশয় অচেতন রাধাবল্লভকে আনিয়া নিজের বাহিরের ঘরটাতে স্থান দিলেন। পাশে যে সদ্য-পাশ-করা নবীন ডাক্তারটি ছিলেন, তাঁহাকেও ডাকিয়া আনিলেন! ডাক্তারবাবু রাধাবল্লভকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এঁকে নড়ানো উচিত নয়। নড়াচড়া করলে মারা যেতে পারেন। সুতরাং রাধাবল্লভকে হাসপাতালে পাঠাইবার উদীয়মান ইচ্ছাটি দমন করিয়া দয়ালু রামকিঙ্করবাবু বাড়িতেই তাহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিলেন। মনে দয়ার সঞ্চার হইলে পয়সা খরচ অনিবার্য। রামকিঙ্করবাবুকে গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া ডাক্তার ছোকরাটির নির্দেশ অনুযায়ী একটি 'আইস ব্যাগ' খরিদ করিতে হইল। যদিও হাজরা মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনে মনে কহিলেন, গেরো আর কি!

পাঁচ

দুই দিন পরে অচেতন রাজবল্লভ চক্ষু খুলিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখে, দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি নয়, হাবলি।

সে চক্ষু মুদিল।

একটু পরে আবার খুলিয়া দেখে পুঁটি নয়, হাবলি!

ফলের রস করিয়া দিল হাবলি।

ঔষধ খাওয়াইল হাবলি। পুঁটি কই?

রামকিঙ্করবাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কেমন আছ?

আজ একটু ভাল।—কি সুন্দর স্বর হাবলির!

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করে হাবলি।

বিছানা, কাপড়-চোপড় ঠিক করিয়া দেয় হাবলি।

মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দেয় হাবলি।

সব হাবলি।

আরও তিন দিন কাটিল।

পুঁটি নাই।

খালি হাবলি।

আবার খড়ম দেখা দিল।

এবার ছদ্মবেশে নয়, স্বরূপে।

রামকিঙ্কর হাজরার হস্তে।

বিদ্যাসাগর

বিদায় লইবার প্রাক্কালে বিনীত নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিয়া গেল, ওই মোড়টায় ডিস্‌পেনসারি খুলেছি, মাস্টার মশায়, দয়া ক'রে যাবেন মাঝে মাঝে।

আচ্ছা।

স্মৃতিপটে কয়েকটি ছবি ভাসিয়া উঠিতেছে।

পুরাতন ছবি।

* * *

তখন টিউশনি করিতাম।

উপর্যুপরি কয়েকবার বি. এ. ফেল করার দরুনই হউক অথবা শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দের সাক্ষাৎলাভের ফলেই হউক, ধর্মে মতি হইয়াছিল। স্বামী চিন্ময়ানন্দের পদপ্রান্তে বসিয়া হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ করিতাম। বুঝিতাম, কর্মজগতে যাহাই হউক, ধর্মজগতে হিন্দুরা অপরাজেয়! দিনের পর দিন স্বামীজী যে সকল তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা আমাকে শুনাইতেন, সেইগুলি এই গল্পের পক্ষে অবান্তর। যেটুকু প্রাসঙ্গিক, তাহাই শুনুন।

একদিন তিনি জন্মান্তর রহস্য-প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করিতেছিলেন, এরূপ কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা আমি শুনি নাই। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। স্বামীজীর বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহাকে ধরিলাম, জন্মান্তর রহস্য উদ্‌ঘাটনের পন্থা বলিয়া দিতে হইবে।

প্রথমটা তিনি আপত্তি করিলেন।

শেষে তাঁহাকে বলিতেই হইল।

তাঁহার উপদেশানুসারে মুদ্রিতনেত্রে নানাবিধ যৌগিক প্রক্রিয়া শুরু করিয়া দিলাম।

জন্মান্তর-রহস্য-উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে।

* * *

ছাত্রের পড়া লইতেছিলাম।

সাধু শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে কি হবে?

বলিতে পারিল না।

মুনি শব্দের দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে কি হবে?

পারিল না।

নর শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে কি হবে?

অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইয়া একটা উত্তর দিল, ভুল উত্তর। ঠাস্ করিয়া একটা চড় মারিয়া 'উপক্রমণিকা' খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

···এইরূপ প্রত্যহ।

হঠাৎ বাসনা হইল ছোকরা পূর্বজন্মে কি ছিল একবার দেখিলে হয়। আমার বিশ্বাস, হয় গাধা, না হয় গরু ছিল। স্বামীজীর প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া এই কৌতূহল নিবৃত্ত করা তো খুবই সহজ।

সেদিন গভীর নিশীথে যোগাসনে উপবেশন করিয়া মুদ্রিতনেত্রের সম্মুখে রুদ্ধশ্বাসে আমার ছাত্রের পূর্বজন্মের মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

এ কি, এ যে বিদ্যাসাগর!

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর!

স্বয়ং উপক্রমণিকার স্রষ্টা জন্মান্তর-রহস্যের ফেরে পড়িয়া 'নর' শব্দের রূপ বলিতে পারিতেছেন না! আশ্চর্য ব্যাপার!

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

পরদিনও ছাত্র শব্দরূপের একবর্ণ নির্ভুলভাবে বলিতে পারিল না।

কিন্তু তাহাকে আমার আর শাসন করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ইচ্ছা হইল, প্রণাম করি।

অশ্রুজলে তাহার চরণ দুইখানি ধুইয়া দিই।

বিদ্যাসাগরের এই দশা!

যতদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলাম, শাসন করিতে পারি নাই, সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম।

ফলে সে ফোর্থ ক্লাস হইতে কিছুতেই প্রমোশন পাইল না।

আমার চাকরিটি গেল। ভাগ্যক্রমে অন্যত্র একটা কেরানীগিরি জুটিয়া গেল, চলিয়া গেলাম।

বছর পাঁচেক পরে আমার নূতন কর্মস্থলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আবার দেখা

থিয়েটারে মাতিয়াছিল। স্ত্রী-চরিত্র নাকি উত্তম অভিনয় করিত। মেডেল পাইয়াছে। সম্প্রতি কিন্তু সে লাইফ-ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্ট, আমি যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার কোম্পানিতে—

আমার চোখে জল আসিল।

সাধ্যাতীত হইলেও কিছু ইন্‌সিওর করিলাম।

আবার আজ সে আসিয়াছিল।

চেহারাটা বেশ ভদ্র ভারিকি-গোছের হইয়াছে। বলিল, ইন্‌সিওরেন্সের দালালি করিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রাইভেট হোমিওপ্যাথি পড়িয়া সে ডাক্তার হইয়াছে এবং এই শহরে প্র্যাকটিস করিবে মনস্থ করিয়াছে। আমি যেন তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করি।

যথাসাধ্য করিব—প্রতিশ্রুতি দিলাম।

নিষ্প্রয়োজনবোধে দুইটি খবর তাহাকে দিলাম না। খবর দুইটি এই—

(১) স্বামী চিন্ময়ানন্দ চৌর্যাপরাধে জেল খাটিতেছেন।

(২) আমি ক্রিশ্চান হইয়াছি।

অক্ষমের আত্মকথা

সে যেদিন আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়াছিল, সেদিনের কথা আমি ভুলি নাই। অনিন্দ্যসুন্দর তাহার মুখখানি আমার বুকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার সে কি কান্না! কোন কথা নয়, খালি কান্না। অন্ধকার ঘর। সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকার গভীর রাত্রে সে আর আমি একা। আর কেহ নাই। তাহার অশ্রুজলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত অন্ধকার থমথম করিতেছে।

আমি নির্বাক।

* * *

আর একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেদিন অন্ধকার নয়, সেদিন জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া যে উন্মাদনা সে প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও ভাষা নাই। তাহার বুকের

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ তুলিয়াছিল, তাহা তাহাকে বলি নাই। বলিলেও সে বুঝিত না। বলিলেও কি লোকে সব কথা বোঝে? তাহা ছাড়া আমি বলিতেই পারিতাম কি?

* * *

আর একদিনের কথা।

সে উপুড় হইয়া শুইয়াছিল। আমি পাশেই ছিলাম। নির্জন দ্বিপ্রহর। সে একখানা বই পড়িতেছিল। আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছিলাম তাহাকে। কি অপূর্ব তাহার দেহখানি, যেন প্রস্ফুটিত একটি শতদল! পরিপূর্ণ যৌবন-নদীর দেহের কূলে কূলে উদ্দাম হইয়াছে। বেশবাসের আবরণ তাহাকে আর যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ওই তুচ্ছ শাড়িটা তাহার যৌবন-স্পর্শ পাইয়া নূতন মহিমা লাভ করিয়াছে। টকটকে চওড়া লালপাড়টা মর্মান্তিক রকমের লাল। অন্যমনস্ক হইয়া সে হাতটা একবার আমার উপর রাখিল আমার সমস্ত শরীরে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, তাহা বুঝিল কি?

বুঝিল না।

আমারও বলিবার ভাষা ছিল না।

* * *

কোনদিন তাহাকে কিছু বলি নাই। অথচ তাহার নিত্যসঙ্গী ছিলাম। তাহার সুখ, তাহার দুঃখ, তাহার উত্তেজনা, তাহার অবসাদ—সবই অনুভব করিতাম। সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতাম। সে কিন্তু একদিনও, এক নিমিষের জন্যও আমার কথা ভাবিত না।

ভাবিত না—ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।

ভাবিবে কেন?

মানবী ছলনাময়ী।

অবশেষে সে আসিল।

যাহার আশায় তাহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, যাহার বিরহে তাহার নয়নপল্লবে অশ্রু নামিত, যে পাওয়া-না-পাওয়ার সন্দেহ-দোলায় এতদিন দুলিতেছিল, সে একদিন সশরীরে বরবেশে আসিয়া অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে অধিকার করিল।

আমি কিছু বলিলাম না। আমার চোখের সম্মুখেই তাহাদের প্রেম-সম্মিলন নীরবে দেখিলাম।

পৃথিবীতে এইরূপই হইয়া থাকে।

আমি দেখিতে কেমন জানি না। হয়তো খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার প্রাণ আছে, আমিও অনুভব করি। আমি দেখিতেই খারাপই তো! আমার সারা গায়ে ময়লা! যদিও সপ্তাহ-অন্তর আমার বহিরাবরণ একবার করিয়া বদলানো হয়, তবু এ কথা লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি, আমার অঙ্গ মলিন। তেল-চিট্‌চিটে ময়লা। কেন? তাহার উত্তরে আমি শুধু এইটুকুই বলিতে পারি যে, আমি অক্ষম। কল্পনায় আমি বিলাসী, কিন্তু কি করিব আসলে আমি যে বালিশ। ছোট তাকিয়া মাত্র। আমার কোন হাত নাই। তাহার দুঃখের অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিয়াছে, সুরের স্পন্দনে সর্বাঙ্গ স্পন্দিত হইয়াছে, তাহার গোপন প্রেমলিপিকা সে নির্ভয়ে আমারই তলায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহার অন্তরের সমস্ত নিগূঢ় বার্তাই আমি জানিতাম, তবু সে আমাকে হেলায় ত্যাগ করিল এবং বরণ করিল মানুষকে!

তাহার কতটুকু সে চেনে!

ক্যান্‌ভাসার

কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।

কাত্যায়নীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সে সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত এই কাণ্ডটি ঘটিত না।

কাত্যায়নীর বহুকাল হইতে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ।

বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। কিন্তু স্ত্রীকে সে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিতে চাহে যে, বাবুয়ানি জিনিসটা সে অপছন্দ করে এবং এই সব বিলাস-লালসার ফলেই দেশটা উচ্ছন্ন যাইতেছে। সুতরাং—

কাত্যায়নী পতিব্রতা হইলেও স্তোকবাক্যে ভুলিবার পাত্রী নহেন।

তিনি বলিলেন, যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল্ ধরে তার আবার বন্দুক

ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?

নিদারুণ কথা!

উত্তপ্ত ভৈরব খানিকটা তেল মাথায় চাপড়াইয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। বাহির হইয়াই সম্মুখে দেখিল নিমগাছ। সকাল হইতে দাঁতন পর্যন্ত করা হয় নাই। ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।

মাজন চাই—ভাল দাঁতের মাজন—

ভৈরব ফিরিয়া দেখে একটি সম্পূর্ণ অচেনা ভদ্রলোক একটি ছোট স্যুটকেস হাতে করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে।

মুখে মৃদু হাসি।

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।

ক্যান্‌ভাসার হীরালালের এই পল্লীগ্রামে আসবার কথা নয়। তাহার শহরে যাইবার কথা। যাইতেও ছিল; কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'ওভারক্যারেড্' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। যদি কিছু বিজ্‌নেস হয়, এই আশায় বেচারা দুপুর রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।

বিস্মিত ভৈরব কহিল, আপনি এখানে কোত্থেকে এলেন মশায়?

মাজন আছে—ভাল দাঁতের মাজন। দাঁতের পোকা, দাঁতের গোড়া ফোলা, পুঁজ পড়া, মুখে গন্ধ—সব ভাল হয়ে যাবে মশাই, ভাল মাজন আছে—

তা তো আছে, কিন্তু আপনি এলেন কোথা থেকে? এই পাড়াগাঁয়ে আমরা একটু শান্তিতে আছি, আপনারা এসে জুটলেই তো—

ব্যবহার করে দেখুন—ভাল মাজন—

নিমের দাঁতন, চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল, কচু—

হাসিয়া হীরালাল বলিল, আজ্ঞে না—ভাল মাজন। ব্যবহার ক'রে দেখুন—

হীরালালের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলির পানে চাহিয়া বলিল, আপনার দাঁতগুলি তো খাসা। এই মাজনই ব্যবহার করেন নাকি?

আর একটু হাসিয়া হীরালাল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘষিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, দৃশ্যটি নয়নাভিরাম নহে।

মাজন নেবেন কি এক কৌটা?

বিকৃত-মুখ ভৈরব বলিল, স'রে পড়ুন মশায়। আপনারা হচ্ছেন দেশের শত্রু। দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন। বুঝলেন?

বলিয়া সে নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।

হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল। বলিল, বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। দেশে দন্তরোগের তো অভাব নেই।

হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া এবার ভৈরব কহিল, তাতে আপনার কি? বেরিয়ে যান আপনি এ গাঁ থেকে। ওসব মাজন-ফাজন বুজরুকি এখানে চলবে না।

হীরালাল ক্যানভাসার হইলেও রক্তমাংসের মানুষ। বলিল, আপনিই কি এই গ্রামের মালিক?

যুক্তিযুক্ত হইলেও এই উক্তি ভৈরবের আত্মসম্মানে আঘাত করিল। ভৈরব বেকার তাহা সত্য; তাহার পেটে বিদ্যা নাই, তাহা সত্য। কিন্তু তাহার গায়ে শক্তি আছে তাহাও সত্য। যদিও সে গ্রামের মালিক নহে, কিন্তু সে ইহাকে গ্রামছাড়া করিতে পারে। এই সব জুয়াচোরগুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতীগুলিকেই ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর— দাঁতের মাজন!

সবেগে পিচ ফেলিয়া ভৈরব কহিল, বেরিয়ে যান বলছি আপনি গাঁ থেকে।

গাঁ থেকে বার ক'রে দেবার কে মশায় আপনি শুনি?

ভীম গর্জনে ভৈরব কহিল, বেরিয়ে যান—

আপনার মত ঢের মিঞা দেখেছি—

ইহার পরই ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল!

ভৈরবের ব্যবহার আশ্চর্যজনক, সন্দেহ নাই।

কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর এক কাণ্ড ঘটিল। চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হইয়া গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশায়? গরিব মানুষ—এই ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—

হতভম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল, আচ্ছা, দিন এক কৌটা মাজন।

বৈষ্ণব-শাক্ত

তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি—অসম্ভব ভিড়।

তথাপি কিন্তু এক কোণে গাদাগাদি করিয়া বসিয়া পরমশাক্ত কালীকিঙ্কর বর্মা পরমবৈষ্ণব নিত্যানন্দ গোস্বামীর সহিত ধর্মবিষয়ক তর্ক করিতেছিলেন। বর্মার কৃষ্ণবর্ণ, রক্ত চক্ষু, কপালে টকটকে সিঁদুরের টিপ। গোস্বামীর গৌর বর্ণ, ধপধপে সাদা আবক্ষ গোঁফ-দাড়ি, চোখে নীল চশমা, খাঁড়ার মত নাকের উপর শ্বেতচন্দনের তিলক।

মাথা দোলাইয়া গোস্বামী বলিলেন, যাই বলুন আপনি, ধর্মসাধনের প্রশস্ত পথই হ'ল প্রেমের পথ। রক্তারক্তি করাটা পৈশাচিক কাণ্ড। মানুষেও পারে না, পারা উচিতও না।

অট্টহাস্য করিয়া বর্মা বলিলেন, রক্তারক্তির আপনি বোঝেন কতটুকু, শুনি? পৈশাচিক কথাটা যে ব্যবহার করলেন, পিশাচ দেখেছেন কখনো? মুণ্ডমালিনী মহাকালীর কোন ধারণা আছে আপনার?

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, যতটুকু আছে তাই যথেষ্ট, মশাই! ওর বেশি ধারণা আমি করতেও চাই না। ছেলেবেলায় পাঁঠাকাটা দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম—

এমন সময় ঘচাং করিয়া ট্রেনটা থামিল। গোস্বামী মহাশয় টাল সামলাইতে না পারিয়া হুমড়ি খাইয়া বর্মা মহাশয়ের ঘাড়ে গিয়া পড়িলেন।

বর্মার কপালের সিঁদুর গোস্বামীর নাকে লাগিল।

স্টেশনে শশা ফেরি করিতেছিল। বর্মা জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া কিছু শশা কিনিলেন। একদল যাত্রী আসিয়া গাড়িতে উঠিল। গাড়িতে নিতান্ত স্থানাভাব। সমাগত যাত্রীবৃন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যে যাত্রীটি দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড মাদল ঝুলিতেছিল। ট্রেন ছাড়িলে গাড়ির ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে মাদলের এক প্রান্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাসাগ্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল। দুই-একবার ঠোকাও লাগিল। মাদল খুব উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণবীয় বাদ্যযন্ত্র হইলেও নাসাগ্রে তাহা সুখকর নহে। গোস্বামী মহাশয় তাহা বুঝিয়া মৃদুকণ্ঠে মাদলধারীকে কহিলেন, একটু যদি স'রে দাঁড়াতে বাবা দয়া ক'রে—

কিন্তু দয়া করিতে সম্মত হইলেও লোকটির সরিবার উপায় ছিল না। নিরুপায় গোস্বামী তখন নিজের মাথাটাই যথাসম্ভব সরাইয়া মাদল-আন্দোলন হইতে নিজের নাসা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোস্বামীর মাথার তির্যক ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বর্মা মহাশয় বলিলেন তোমরা ব'সে পড় না হে! দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে বাপু! যে যেখানে আছ ব'সে পড়।

একটু ইতস্তত: করিয়া মাদলধারী বসিল।

নাসা-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া গোস্বামী মহাশয় আবার শুরু করিলেন, এই যে মাদল—অপূর্ব জিনিস এ। বৈষ্ণব ধর্মেরও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে খোল আর খঞ্জনী। আপনার ধর্মে দেখান দিকি এমন জিনিস। আপনারা এক রক্তারক্তি ছাড়া—

নাকের উপর ঠকাস করিয়া আঘাত দিয়া মাদল-বাদক আবার দাঁড়াইয়া উঠিল। গোস্বামী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে পারিল না। বর্মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আবার দাঁড়ালে কেন গো!

আজ্ঞে, পরের ইষ্টিশনেই নামব।

সে তো এখন দেরি আছে।

মাদল-বাদক কিন্তু আর বসিল না, পরের স্টেশন পর্যন্ত গোস্বামী মহাশয়ের নাকের সামনে মাদল সমানে আস্ফালন করিতে লাগিল।

পরের স্টেশন আসিল। গাড়ি ঘচাং করিয়া থামিতেই মাদলটা সজোরে গিয়া গোস্বামী মহাশয়ের নাকে লাগিল। একটুর জন্য চশমাটা বাঁচিয়া গেল।

ট্রেন থামিলে হুড়মুড় করিয়া প্রায় সকলেই নামিয়া গেলেন। রহিলেন শুধু

বর্মা আর গোস্বামী। বর্মা বলিলেন, এ হে-হে-হে, আপনার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল যে! মাদলের আঘাতে বৈষ্ণবের রক্তপাত! এ কি বিড়ম্বনা!

নাকটা মুছিয়া গোস্বামী বলিলেন, আসল জিনিস কি জানেন মশাই? অর্থ। পয়সা নেই ব'লেই না এই থার্ড ক্লাশে ভিড়ে চলেছি, তাই না এ দুর্দশা! অর্থ না থাকলে ধর্ম-টর্ম কিছু টেকে না।

অট্টহাস্য করিয়া শশা ছাড়াইতে ছাড়াইতে বর্মা মহাশয় বলিলেন, যা বলেছেন। অর্থ নেই ব'লেই না আমার মত শাক্তকে ছুরি দিয়ে শশা কেটে খেতে হচ্ছে। খাবেন নাকি শশা?

দিন। সবই অদৃষ্টের রহস্য।

সকলের চেয়ে বড় রহস্যটা কিন্তু উভয়েরই অজ্ঞাত রহিয়া গেল। পরের স্টেশনে যখন গোস্বামী মহাশয় শশা খাইয়া নামিয়া গেলেন, তখন ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ বর্মা মহাশয় জানিতেও পারিলেন না যে, গোস্বামীর অভিনয় করিয়া যিনি নামিয়া গেলেন তিনি দুর্ধর্ষ খুনী পলাতক বজ্রধর মিশ্র। অপর কেহ নন।

মাদলই ঠিক বুঝিয়াছিল।

শ্রীপতি সামন্ত

ট্রেনে অসম্ভব ভিড়।

তিল ধারণের স্থান হয়তো আছে, কিন্তু মনুষ্যধারণের সত্যই স্থানাভাব। তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলিতেছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমন কি দ্বিতীয় শ্রেণীরও সমস্ত বার্থগুলি অধিকৃত। কেবল প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে। সেখানেও সাহেবী পোশাক-পরিহিত একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন।

একটি স্টেশনে গাড়ী থামিয়াছে।

রাত্রি আটটা হইবে।

শ্রীপতি সামন্ত সমস্ত প্লাটফর্মময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন, কোথাও উঠিতে পর্যন্ত পারিলেন না। অথচ তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, ঘুমাইয়া যাইবেন। টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর।

সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয় তো নহেনই; সুতরাং

তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব হইল না। বারকয়েক ছুটাছুটি করিয়া অদ্য এই ট্রেনযোগে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কলিকাতা যাওয়ার আশা সামন্ত মহাশয়কে অবশেষে ছাড়িতে হইল।

কিন্তু অদ্য তাঁহার নিদ্রার অত্যন্ত প্রয়োজন।

বিগত তিন রাত্রি মোটে ঘুম হয় নাই।

সর্বেশ্বরবাবুর নাতিনীটির বিবাহের গোলমালে দুই রাত্রি তিনি চোখে পাতায় এক করিতে পারেন নাই।

কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।

লোকে পাখা নাড়িবে, না ঘুমাইবে।

স্খলমান চশমাটা সামলাইয়া সামন্ত মহাশয় সহসা কুলিটাকে বলিলেন, ওরে, দাঁড়া।

শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ান নহেন, তাহা ঠিক; কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র, যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।

শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

গার্ডের সহিত কথোপকথন-নিরত কাপড়-টুপি পরিহিত ছোটবাবুর নিকট হাত কচলাইতে কচলাইতে সামন্ত মহাশয় বলিলেন, টেরেনে তো আজ্ঞে চড়াই চায়, হুজুর। যদি অনুমতি করেন, এই এক পাশটায় আমি চ'ড়ে পড়ি।

বলিয়া সামন্ত মহাশয় প্রথম শ্রেণীর সংলগ্ন ভৃত্যের কামরাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

স্টেশনের ছোটবাবুটি এই নিতান্ত ভারতীয় বৃদ্ধের স্পর্ধায় প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পরে অনুকম্পান্বিত হইলেন। ভাবিলেন মূর্খ লোক বুঝিতে পারে নাই, তাই।

বলিলেন, ওটা যে ফাস্টো কেলাস গো।

'ফাসটো কেলাস' চেনেন না—এতটা মূর্খ অবশ্য সামন্ত মহাশয় নহেন।

তিনি বিনীতভাবে আবার বলিলেন, আজ্ঞে, ওটাতে নয়, এইটের কথা আমি বলছি। এটাতে তো গদি-মদি কিছুই নাই। যদি হুজুর দয়া করেন, আমি বুড়ো মানুষ, গরীব লোক, আমার শরীরটাও খারাপ, বিশ্বাস করুন, হুজুর, তিন রাত্রি ঘুম হয় নাই।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি জানালা দিয়ে মুখ বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের এক প্রান্ত হইতে ধূমায়মান পাইপ ঝুলিতেছিল।

সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।

সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোহর নহে।

পরণে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারী চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকের ডাণ্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা।

সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা; চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয়গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতি-ফরসা-কালো। হাতে খেলো হুঁকা।

ছোটবাবু বলিলেন, এই সায়েবকে বল। ওঁরই চাকরের জন্যে ও কামরাটা আলাদা করা আছে। উনি যদি আপত্তি না করেন, আমার আর আপত্তি কি!

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীটি সাহেবী-পোশাক পরিহিত হইলেও বাঙালী। কিন্তু মাথা নাড়িয়া পাইপ চিবাইয়া তিনি উত্তর দিলেন, দ্যাট কান্‌ট বি। আই কান্‌ট অ্যালাউ।

সামন্ত মহাশয় করজোড়ে বলিলেন, আমিও তো হুজুরের চাকরই—চাকর ছাড়া আর কি। অনুমতি যদি করেন দয়া ক'রে—

এই বৃদ্ধের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করিতে সাহেবের আর প্রবৃত্তি হইল না। তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।

ঢং ঢং করিয়া গাড়ি ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা হইল।

সামন্ত মহাশয় অসহায়ভাবে আর একবার তৃতীয় শ্রেণীগুলির দিকে চাহিলেন।

পাদানে পর্যন্ত লোক ঝুলিতেছে।

উহার মধ্যে শেষে ঢুকিতে হইবে! অথচ—

সামন্ত মতি-স্থির করিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন হুজুর, এটাতেই চড়লাম আমি, কৃষ্ণকে পাঠিয়ে দেন, ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওরে, ওরে আন্‌ আন্‌ এটাতেই আন্‌ সব। ওহে

কালীকিঙ্কর! শ্যামাপদ কোথায়! বাঙ্গা, ও বাঙ্গা, এই দিকে, এইখানেই চড়াও সব।

হৈ-হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঙ্গা কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বাণ্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটা বঁটি, একটা ছিপ, দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটলি ও এক টিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্ট ক্লাশেই তুলিয়া দিল। কালীকিঙ্কর ও শ্যামাপদ পদধূলি লইয়া নামিয়া গেল।

সামন্ত মহাশয় হাসিয়া বাঙ্গাকে বলিলেন, তুই তা হলে ওই পাশের কামরাটায় থাক্‌ গিয়ে। তোরই মজা হ'ল রে! তামাক-টিকে সব গুছিয়ে রাখ।

বাঙ্গা নামিয়া পাশের কামরায় চড়িল।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

থেলো হুঁকাটায় একটা টান দিয়া ঘড়ঘড়ায়মান কফটাকে সশব্দে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া সামন্ত মহাশয় সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঘুমটা হওয়া আজ নিতান্ত প্রয়োজন, হুজুর। কাল সকালে মাথাটা ঠিক রাখা দরকার, অনেক টাকার কেনা-বেচা করতে হবে।

যথা সময়ে গুম্ফশ্মশ্রু-সমন্বিত পাঞ্জাবী ক্রু আসিয়া দর্শন দিলেন ও ভাড়া চাহিলেন।

সামন্ত মহাশয় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া ক্রু-র দিকে ঈষৎ পিছু ফিরিয়া বসিয়া কোমর হইতে এক সুদীর্ঘ গেঁজে বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর সেটি উজাড় করিয়া ঢালিলেন এবং ক্রু-র নির্দেশমত নিজের যাবতীয় জিনিসপত্রের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া স-রসিদ গেঁজেটি পুনরায় কটিবদ্ধ করিলেন।

যদি কেহ গণিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত, সামন্ত মহাশয়ের গেঁজেতে খুচরা টাকা ছাড়া দশ হাজার টাকার নোটই রহিয়াছে।

তাহার পর পাঞ্জাবী ক্রু বাঙালী সাহেবটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ইওর টিকেট প্লীজ।

মাই টিকেট ইজ ইন মাই স্যুটকেস। প্লীজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।

আই কাণ্ট্‌ পাঞ্চ্‌ ইওর ওয়ার্ড। মাই ডিউটি ইজ টু পাঞ্চ্‌ টিকেটস্‌—

অবশেষে দেখা গেল, বাঙালী সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।

বচসা বাধিল।

বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বেশিক্ষণ বচসা চালানো শক্ত।

সুতরাং উভয়ের রাষ্ট্রভাষা হিন্দির শরণাপন্ন হইলেন।

সামন্ত মহাশয়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিলেন।

এ আবার কি ফ্যাসাদ হইল। ঘুমাইতে আর দিবে না দেখিতেছি।

ভগাবান বিরূপ হইলে কাহার সাধ্য ঘুমায়!

দুর্গা---শ্রীহরি—

সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।

সহসা সামন্ত মহাশয়ের কানে গেল, 'কুক' যেন সাহেবটিকে বলিয়াছে এ বাঙালী বাবুদের সে ভাল করিয়াই চেনে, সুতরাং—

সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার উবু হইয়া বসিয়া কোমর হইতে গেঁজে বাহির করিলেন।

ও কুক মহাশয়, বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি? কত টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি। ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি!

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন, আপনিও তো হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামত।

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রু-র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন, কটা বাঙালী আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন্ দিশি ভদ্রতা রে বাপু! দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি—দুর্গা শ্রীহরি!

সামন্ত মহাশয় আবার বেঞ্চে লম্বমান হইলেন।

বাঙালী সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকাটা ফেরত দিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।

মানুষ

অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম।

গঙ্গা-বক্ষে সূর্য অস্ত যাইতেছে। পশ্চিম দিগন্তে বর্ণনাতীত বর্ণসমারোহে। নানা আকৃতির মেঘমালা স্বপ্ন-সায়রে নিমগ্ন। সাদা পাল তুলিয়া কয়েকটি ছোট নৌকা স্রোতোমুখে মন্থর গতিতে ভাসিতেছে। ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান মাছরাঙা পাখিগুলি সন্ধ্যানুরাগ-রঞ্জিত। টলমল নদীজল আরক্ত স্বর্ণবর্ণ।

প্রতি তরঙ্গশীর্ষে স্বতঃস্ফূর্ত শোভা।

তৃণাঙ্কিত শ্যামল তীরে দেবালয়।

দেবালয়ের সম্মুখে রোমন্থনরত নধরদেহ একটি গাভী।

আরও একটু দূরে মুদিতনয়ন একটি মার্জার।

দেবালয়ে করুণ গম্ভীর সুরে নহবৎ বাজিতেছে।

পূরবীর অপরূপ আলাপ!

চতুর্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন।

নদীর তীরে ঘাসের উপর তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলাম।

ভাবিতেছিলাম—কি সুন্দর এই পৃথিবী!

* * *

সহসা চমকাইয়া উঠিলাম।

আমার পিছনে কে যেন জড়িত কণ্ঠে কথা কহিল।

ফিরিয়া দেখি, একটি ভিখারী এবং তাহার সহিত একটি মেয়ে।

ভিখারী কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত।

হস্তপদ অঙ্গুলিহীন।

নাসিকার স্থানে একটি গহ্বর।

বিকৃত বীভৎস মুখখানায় মিনতি ফুটাইয়া অনুনাসিককণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছে।

একটি পয়সা বাবু—

সঙ্গের মেয়েটিও সে কথা পুনরাবৃত্তি করিল।

মেয়েটির বয়স ষোল-সতেরো।

শরীরে কোন ব্যাধি আছে বলিয়া মনে হইল না।

পরণে একটি মাত্র বসন—শতছিন্ন।

বসনের শত ছিদ্রপথ দিয়া নবমুকুলিত যৌবন উপচাইয়া পড়িতেছে।

দারিদ্র্যের মলিনতায় তাহা লাঞ্ছিত।

তবু তাহা যৌবনশ্রী।

মেয়েটিও সে সম্বন্ধে সচেতন।

তাহার মুখ-চোখ ভাব-ভঙ্গি ইঙ্গিতময়।

এরূপ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ও যুবতী ভিখারিণী ইতিপূর্বে আরও দেখিয়াছি।

কিন্তু আজ সহসা তাহাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখিলাম।

ব্যাধি ও স্বাস্থ্য পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে—একই উদ্দেশ্যে।

ক্ষুধার অন্ন চাই।

ভিক্ষা ইহাদের ব্যবসায়।

সেই ব্যবসায়ে একজন মূলধন করিয়াছে ব্যাধিটাকে, আর একজন যৌবনকে।

দুইজনকেই দুইটি পয়সা দিলাম।

চলিয়া গেল।

কুষ্ঠরোগী লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে ধীরে ধীরে।

মেয়েটির গতি সাবলীল। কিছুদূরে গিয়া সে আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল।

মুখে মুচকি হাসি।

নির্বাক হইয়া রহিলাম।

তাহার ছিন্ন বসনে শতরন্ধ্র চোখের উপর ভাসিতে লাগিল।

*　　　*　　　*

সহসা একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার।

সচকিত হইয়া দেখিলাম—বিড়ালটা একটা ইঁদুর ধরিয়াছে।

ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল!

গাভীটিও হাম্বারব তুলিল।

দেখিলাম, দুধ দোহা হইতেছে। একজন দোহন করিতেছে এবং আর একজন মাতৃস্তনাভিমুখী বাছুরটাকে প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া আছে।

তাহার করুণ কাকুতি সন্ধ্যার শান্তিকে বিঘ্নিত করিতে লাগিল।

* * *

আকাশে কৃষ্ণ পক্ষ মেলিয়া সারি সারি বাদুড়ের দল উড়িয়া চলিয়াছে। পালতোলা নৌকাগুলি দেখিলাম, জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পশ্চিম দিগন্তে চাহিয়া দেখিলাম।

আলোকসমারোহ আর নাই।

অস্তমিত রবির বর্ণ-সমারোহ চক্রবালরেখায় ম্রিয়মান।

অন্ধকার নামিতেছে।

উঠিয়া পড়িলাম।

পথে দেখিলাম, সেই উদ্ভিন্নযৌবনা ভিখারিণী একটা গলির স্বল্প আলোকে দাঁড়াইয়া একটি গুণ্ডা-গোছের লোকের সহিত হাস্য-পরিহাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে!

বাড়ি ফিরিয়া শুনিলাম, পাশের বাড়ির বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। আনন্দশঙ্খধ্বনি সে শুভবার্তা ঘোষণা করিতেছে। সদ্য পুত্র-শোকাতুরা আমার গৃহিণী সজলচক্ষে প্রার্থনা করিতেছেন, ভগবান বাঁচাইয়া রাখ।

অন্যমনস্কভাবে চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজগুলা উল্টাইতে লাগিলাম।

বহু বাধা সত্ত্বেও একটি সতী স্বামীর সহিত এক চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে।

বহু বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও আর একদল দুঃসাহসী এভারেস্ট্ অভিযানে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

চীন-জাপান যুদ্ধ।

স্পেন।

বাঙালীর দুর্গতি ও তাহার নানা প্রকাশ।

কংগ্রেস!

দুয়ারে কড়া নড়িয়া উঠিল।

পিওন তার আনিয়াছে। সুসংবাদ! আমার অকর্মণ্য ভাইটির চাকুরি হইয়াছে। এই চাকুরিটির জন্য পাঁচ শত প্রার্থী ছিল।

বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে আমার ভাইটির অপেক্ষা অনেকে শ্রেষ্ঠও ছিল। তবু তাহাদের অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সুপারিশের জোরে আমার ভাইই চাকুরিটি পাইয়াছে।

এতবড় অবিচারে এতটুকু বিচলিত হইলাম না।

উপরন্তু খুশী হইলাম।

ছাদে উঠিলাম।

কালো মেঘের স্তর ভেদ করিয়া অপরূপ শোভায় চাঁদ উঠিয়াছে।

পূর্ব দিগন্ত জ্যোৎস্না পুলকিত।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দটাকে সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার জন্য একটি সিগারেট ধরানো প্রয়োজন।

পকেটে হাত দিয়া দেখি, সিগারেট-কেশ খালি।

সিগারেট আনিতে ভুলিয়াছি।

আবার মনটা বিগড়াইয়া গেল।

উদীয়মান চন্দ্রকে আকাশে রাখিয়া সিগারেট কিনিবার জন্য আবার দ্রুতগতিতে গলিতে নামিয়া গেলাম।

পাশাপাশি

এক

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চা ও পরনিন্দা করিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরির দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি, কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকী আছে। স্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততপক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে বসিয়া চিন্তা করাও মুশকিল! শুইলেই মাছি! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিকক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন 'আচ্ছা চিন্তাশীল লোক তো!'

পেটের চিন্তার মত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন-রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। চিন্তাশীল নই, আমি চিন্তাগ্রস্ত।

…ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলিকাতাই বেস্‌ট ফিল্‌ড! চাকুরিও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এত কাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে আমি কোন জমিদার-তনয়। তাহা নয়। বাবা শৌখীন লোক ছিলেন এবং সেই-জন্যই সম্ভবতঃ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

দুই

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশবাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়-শাশুড়ীর ভাইপোর পিসতুতো শালার আপন ভায়রা ভাই এই বিকাশবাবু। রীতিমত অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, 'কি ভায়া, চিনতে পারছো!' ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, 'অনেক দিন পরে কিনা! তাই একটু —মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?'

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, 'নাঃ, চিন্‌তে পার নি দেখছি! চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে; মানে বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের', —বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে কূট ফরম্যুলাটা মুখস্থ করিয়া

আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, 'তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তের ভায়রা ভাই। আপন লোক কলকাতার গলি ঘুঁজিতে পড়ে আছে—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠে না, এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশ-ভায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'

কুলীর মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশ বাবু বলিলেন, 'থাকবেন নাকি এখানে?'

'বেশি দিন নয়—দু-চার দিন!'

'ও।'

কুলী বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোশাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্থৈর্য অবশ্য বেশিক্ষণ টিকিল না। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, 'লজেঞ্চুস!' কেহ বলে, 'ঘুড়ি চাই!' কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশী হইয়া উঠিল। অত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরা শুধু জমাইতে পারে!

...বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

তিন

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত একজনও নাই। সহপাঠিগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্বে থাকিতাম তাহা এখন 'ডাইং ক্লিনিং' হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকে চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশ ভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্যুপরি তিন দিন এইরূপে কাটিল। বিকাশবাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন; যেন 'লেট' না হইয়া যায়। গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—ফিরিয়া বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসেন। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, 'ভাত বাড়। ওগো শুনছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে নটা হ'ল—যেতেও

তো আবার খানিকক্ষণ লাগবে—' তাহার পরই উর্দ্ধশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশবাবুর সহিত আলাপ বেশিক্ষণ জমাইবার অবসর পাই না। ভাবি—'কাজের মানুষ?' বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে—রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকুরি ও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

চার

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক যখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন বলিলাম, 'ভায়া, আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।'

'আমার সঙ্গে? কেন।

'একটা কথা ছিল। মানে—'

'তাহ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দোর হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—'

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দরকারটা কি?'

'অর্থাৎ—' কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

'টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।'

'না—না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা ট্রামেই বলব এখন!'

'ট্রামে তো আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।'

'বেশ তো! চল আমিও হেঁটে যাই। কতদূর?'

'ইডেন গার্ডেন।'

'ইডেন গার্ডেনে আপিস? কিসের আপিস?'

'আপিস কে বললে আপনাকে!' বলিয়া বিকাশবাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'তবে?'

'আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই?'

কোথা যাও তা'হলে ?'

একটু ইতস্তত: করিয়া বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই !"

নির্বাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম! বিকাশবাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন—তারই ৪০ টাকা সুদ্ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারি নি। অথচ এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না!"

উভয়ে আবার খানিক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশবাবু আবার বলিলেন, "বাড়িতে কথাটা আবার ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেত 'অ্যাপ্রেন্টিসি' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয়।"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশবাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না? বাড়িতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে বসে থাকা অসহ্য। সারাক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে! বাঁশী কিনে দাও, লজেনস্ দাও! পুতুল দাও! পাশের বাড়ীর ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও! গিন্নীরও নানা রকম আবদার আছে!—সবে পড়ি। বুঝলেন না।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়িতে থাকলেই গোলমাল। বুঝলেন না; সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটা পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়িতে থাকলে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও! ছিলাম না, নিশ্চিন্ত! চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—লেট হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে দখল করে—বুঝলেন!"

পাশাপাশি দুইজনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায়!

শরশয্যা

এক

শরীরের সমস্ত রক্ত টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—নাসারন্ধ্র স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এখনই যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলি। সুখের বিষয় হউক, দুঃখের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই রহিয়া যাইবে।

··ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার করা প্রয়োজন···দেশের নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে আমার পৌরুষের মূল্য কি? সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকের ছাতি বাড়াইয়াছি···কলেজের স্পোর্টস-এ সকলের সেরা ছিলাম—কিন্তু শরীরের শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ, যদি নারীত্বের মর্যাদা না রক্ষা করিতে পারি?

ইত্যাকার নানারূপ যুক্তি মনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে, উপস্থিত কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের নক্ষত্রগুলি আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো তালগাছ না প্রেতের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি! দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, ঘাপটি মরিয়া বসিয়া আছে। সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। একজন অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে···ছি, ছি, ভাবিতেও সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে! দেশে কি পুরুষ নাই? সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু

সন্তরণশীল, ব্যায়ামশীল, লম্ফনশীল, বীরপুরুষদের ছবি দেখা···ফুটবল, হকি খেলার সময় সমস্ত দেহের যৌবন চঞ্চল হইয়া উঠে অথচ সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হয় অবারিতভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত না মৃত! অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম। ঝাঁৎ করিয়া একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে আর একটা গাড়ি আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙ্গিয়া গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-স্টেশনে নামিব তাহা নিকটবর্তী হইয়াছে। স্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে। এদেশে আরও কখনও আসি নাই। চাকুরির চেষ্টায় ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পরিচিত একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরি জুটিতে পারে।

দুই

এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহারের একটি শহর। রাত্রিও বেশ অন্ধকার। শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া বাহির করা সহজ নহে। স্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম, শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম, হোটেলে রাত্রিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ করিব। একটি এক্কার সহায়তায় উক্ত হোটেলে আসিয়া পৌছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন—দ্বিতলে একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়া দিলেন। যৎসামান্য আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

তিন

আবার কুরুক্ষেত্র-সমর বাধিয়াছে।

নারীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবদিগের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট, সুতরাং আমার পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকেচক্রে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রৌপদীধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে।

একটি ঘুসিতে মোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নাসিকা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ব কৌশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্যচ্যুতিকর ব্যাপার। সহসা সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আর দুর্যোধনকে দেখিয়া দেঁতো হাসি হাসিতে হইবে না—দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না। ধৃতরাষ্ট্রের মনস্তুষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবার মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছি। শরশয্যা ফুলশয্যা নহে, তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি লোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছে। সহসা মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না! কানের পাশে, বগলের নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা! স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট। তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টর্চটা জ্বালিয়া দেখি সমস্ত বিছানায় যেন তিসি বিছান রহিয়াছে! অগুণ্তি ছারপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সারি সারি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া যাইব কিনা ভাবিতে লাগিলাম, অদ্ভুত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল! আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। একেবারে অক্ষৌহিণী।

চার

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চলিলাম। বাহিরে চাহিবা মাত্র কর্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নীচের গলিটাতে চেক্-কাটা লুঙ্গি-পরা একটি গাঁট্টাগোট্টা-গোছের লোক একটি বাড়ির জানালায় উঁকি দিয়াই চোরের মত সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উঁকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমার দ্বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে, পরনে একটি আধ-ময়লা কাপড় —কোলের কাছে একটি শিশু। ঘরে আর কেহ নাই···চকিতের ভিতর খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিকের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন জীবনে

সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতিটি পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে। রাসকেল! সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বংসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব! আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম! আশ্চর্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি! ইনিই আমার শ্বশুরের পরিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উদ্যত চপেটাঘাতকে কৃতাঞ্জলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, "আপনার কাছেই এসেছি, বিমল বাবুর জামাই আমি!"

ভদ্রলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ও, বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?"

"ওই হোটেলে—"

"আচ্ছা, কাল সকালে দেখা ক'রো—"।

ফিরিয়া আসিয়া সেই শরশয্যায় শয়ন করিলাম।

ভ্রষ্ট-লগ্ন

এক

স্তব্ধ হইয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার স্ত্রী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে খানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবরুদ্ধ ক্রন্দনাবেগে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

* * * *

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশি করিয়া মেশে নাই।

স্কুলের পরম বন্ধু ছিল তকু—অর্থাৎ ত্রৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিংয়ে আর তকু থাকিত বাড়িতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভরতি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তকু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—যাঁহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভরতি হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওই তকুকে যেমন ক'রে হোক হটাতে হবে। পারবে তো?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তুক কি বস্তু।

তকুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়াছিলেন, "ঐই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে ভালো ছেলে, কিন্তু হাজার ভালো হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজিতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না।"

চেষ্টা করিলে তকু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ। তকু কিন্তু চেষ্টা করে নাই। সেইজন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তকু ছিল কবি। সে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা-মুখস্থ-করা ভালো ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার ফার্স্ট হওয়ার গৌরবকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া রহিলাম মানপুর স্কুলের ফার্স্ট বয় আর তকু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের একজন উদীয়মান কবি। তফাতটা যে কি এবং অত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

ফলে, তকুর ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

দুই

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তকু একদিন আমাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তকুর মায়ের স্নেহকোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আর একজন। তকুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। 'অসাধারণ রূপ' বলিতেছি কারণ চকচকে ধারালো সুন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না। অমন সুন্দরী সত্যিই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুখ নাক অদ্ভুত। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ব। চাঁপাফুলে গোলাপ আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইতে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীর কল্পনা সহসা মূর্তি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর দশকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া! আমার সহিত কথা বলিল না! আচারে, ব্যবহারে, ভাবে-ভঙ্গিতে বেশ সুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল সে আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। মনে মনে আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কি-ই বা ছিল। সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * *

তকুর বাড়ি প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবিবারেই। সুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে, প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়াছিল, "দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফার্স্ট হয়?"

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, "হ্যাঁ—"

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন?

"বই মুখস্থ ক'রে ফার্স্ট সবাই হতে পারে। দাদার মতন অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি?"

মনে পড়িতেছে, একটু সলজ্জ গলায় খাঁকারি দিয়া বলিয়াছিলাম, "আমি তোমার দাদার মত নই তো। হ'তেও চাই নি—"

"পারবেনই না।"

দশ বছরের মেয়ে!

তিন

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তকুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম, দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়িটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিতেছে—না হয় অমনি একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ীর মুখপানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অদ্ভুত রূপসী এই সত্য কথা সেই সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স যত বাড়িতে লাগিল, মাদকতাও তত বাড়িতে লাগিল। আমার সে সদ্যজাগ্রত যৌবনে—বেশি বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা যা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—যাহার ভাবে-ভঙ্গিতে, কথায়-বার্তায় আমার প্রতি অবজ্ঞাই অনুক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে! আশ্চর্য প্রেমের নিয়ম! আমি ঠিক তাহাদের পালটি ঘর ছিলাম, আমার ভালো ছেলে বলিয়া একটু সুনামও ছিল, মালতী যদি সামান্য একটু আশ্বাস দিত, বিবাহ আটকাইত না। কিন্তু আশ্বাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে, তাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিতভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতি দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, "আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু বলবেন না। নিজের চেহারাটা কখনও দেখেছেন আয়নায়?"

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।…সেদিন সন্ধ্যায় স্কুলের খেলার মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রূঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা

আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ব করিবার মত রূপ আছে. সে তাহা লইয়া গর্ব করিবে বই কি! রূপসী মাত্রেই গরবিণী। গর্বটা সৌন্দর্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তবে সুন্দরীর নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি।

আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দিবার বছর। পড়াশুনোয় কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—, তারপর পরীক্ষা দিয়া বাড়ি চলিয়া আসিতে হইল। মানপুরে ফিরিয়া যাওয়ার অজুহাত শীঘ্র আর পাওয়া গেল না।

চার

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপর দিয়া অনেক ঝড়ঝাপটা গেল—বাবা, মা মারা গেলেন। সংসারে আমার আপন বলিতে বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোলা যায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশা অবশ্য অনেকদিন ত্যাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সেই সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করিতে পারিল না। অথচ তাহা তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মারা গেলেন। তকুদের অবস্থা খুব ভালো ছিল না, আরও খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে, মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আমি যেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক সুরূপ হওয়া প্রয়োজন, কারণ কালো বলিয়া দুইটি পাত্রকে মালতী কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, "ভালো পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানা একটি ভালো পাত্র আছে, কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর পছন্দ হইবে না। বল তো সম্বন্ধ করি।"

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

পাঁচ

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম. এ. পড়িতেছি। আশ্চর্য মানুষের মন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে সারিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন—মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী মিস্ মিত্র। আমার সহপাঠিনী···আলাপটা হইয়াছিল লইব্রেরীতে। এথিক্সের একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস্ মিত্র আমার সমীপবর্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ। আলাপ সাধারণত যে ভাবে ঘনিষ্ঠতর হয় সেইভাবে হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে সুন্দরী তাহা নয়। কিন্তু তাহার চোখে মুখে একটা মার্জিত কমনীয়তা, এমন একটা সংযত মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিলাম যে মনে রং ধরিয়া গেল।···ক্রমশ চিন্তা করিতেছি, অজ্ঞাতসারেই তাহার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছি, কোন্ কোন্ রঙের শাড়ি পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি।

ছয়

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে, আর কয়েকদিন পরেই বিবাহ হইবে, এমন সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম!

বলিলাম, "সে কি সম্ভব?"

তকু বলিল, "সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে বললাম। ওকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালাতে গিয়ে—ছি, ছি, কি কাণ্ডটাই না হয়ে গেল। মা বললেন, তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অনুরোধ করতে সাহস পাই না যে!" বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "না ভাই, এখন আর সে হয় না। অনেকদূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে বলছি—"

মানপুর গেলাম।

* * *

পায়ের উপরে উপুড় হইয়া স্ত্রী বলিতেছে শুনিতেছি, "কক্ষনো তুমি আমায় ভালবাস না, কক্ষনো না। একদিনও বাস নি, বাসতে পার না। আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—কেন তুমি দয়া করেছ——কেন—কেন—কেন—"

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

"শোন, একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ তোল—"

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখ আগে যে দেখিয়াছে, তাহার এ মূর্তি দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। বীভৎস পোড়া, কদাকার! অসাবধানে ষ্টোভ জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

থিওরি অব্ রিলেটিভিটি

এক

জীবনে নিকটতম দুঃখটাই যে সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলাম। আমার ধার আছে গৃহিণী কুৎসিত, সামান্য কেরাণী-গিরি করিয়া খাই এবং তাহা লইয়া গর্ব করিয়া বেড়াই। কলেজে আমার অপেক্ষা যে-সব সহপাঠী নিম্নস্তরে ছিল, কর্মজীবনে তাহারা কেবল মুরুব্বির জোরে উঠিয়া গিয়াছে—এই প্রকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানারূপ দুঃখ আমার ছিল। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমার সর্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ এই বুড়িটা। এই বুড়ি তাহার ময়লা শতছিন্ন দুর্গন্ধ কাপড়টা লইয়া আমার নাকের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে বাঁচি। জানালা দিয়া দেখিতে পাইতেছি সন্ধ্যার আকাশ বহুবর্ণে বিচিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই বুড়িটা না সারিলে·· আঃ! কি মুশকিল।

পীড়িতা মাসিমার অসুখের সংবাদ পাইয়া কলিকাতা যাইতেছিলাম। মন্থর-গতি প্যাসেঞ্জার ট্রেন, গ্রীষ্মকাল এবং আমার টিকিট তৃতীয় শ্রেণীর। সুতরাং যে কষ্টভোগ করিতেছিলাম তাহা দুঃসহ হইলেও ন্যায্য—এই জাতীয় একটা সান্ত্বনা মনে মনে গড়িয়া তুলিতেছিলাম এমন সময় পিছন হইতে অমলিন পরিচ্ছদধারী এক ভদ্রলোক বলিলেন—

"রাস্তাটা থেকে সরে দাঁড়ান একটু। 'বাথরুমে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন না। একটু সরুন দয়া করে।"

যথাসাধ্য দেহ-সঙ্কোচ করিয়া ভদ্রলোককে পথ করিয়া দিলাম। ভদ্রলোক 'বাথরুম' হইতে প্রত্যাগমনের মুখে বলিলেন—"এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট পাচ্ছেন কেন? ওধারে চলুন না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওদিকে কি জায়গা আছে?"

"আহা, চলুনই না—"

বুড়ির সান্নিধ্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য উন্মুখ ছিলাম। সুতরাং ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া কামরাটির অপর প্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে প্রস্তাব করিলেন—"বসুন, আমার এই তোরঙ্গ-টার উপরেই বসুন। আসল 'ষ্টিল'—আপনার মত দশজন বসলেও কিছু হবে না!" তোরঙ্গটার চেহারা ভালই বলিতে হইবে। তাহার দৃঢ়ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কিছু ছিল না। বস্তুত আমি সন্দেহ প্রকাশও করি নাই। তথাপি ভদ্রলোক বলিলেন—"আমার জিনিস ভাল না দিলে নিস্তার আছে ছগ্‌গনলালের। তার মনিব হ'ল গিয়ে আমার মুঠোর মধ্যে।"

আমি ট্রাঙ্কটির উপর বসিয়াছিলাম।

একটু মৃদু হাসিয়া শুধু বলিলাম—"তাই নাকি?"

"তাই নাকি মানে? ছগ্‌গনলালের সাধ্য আছে আমাকে খারাপ জিনিস দেয়? তার মনিব বৈজুপ্রসাদ হ'ল গিয়ে আমার খাতক।"

ভদ্রলোককে খুশী করিবার জন্য আমি আবার বলিলাম—"হ্যাঁ, সুন্দর মজবুত ট্রাঙ্ক আপনার। দেখতেও চমৎকার।"

ভ্রূযুগ ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত করিয়া ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাম কত হবে আন্দাজ করুন দেখি।"

নিরীহভাবে বললাম—"টাকা কুড়ির তো কম নয়ই। কত?"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং হাসি শেষ করিয়া বলিলেন—"আপনার দোষ নেই, হয়ত আসল দাম ওই রকমই হবে। আমি গণ্ডা বার পয়সা দিয়েছিলাম।"

সত্যই অবাক হইয়া গেলাম।

"বলেন কি? বার আনা?"

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"তাও নিতে চায় না। ছগ্‌গনকে অনেক

বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা টাকা দিলাম, তার থেকেও চার গণ্ডা পয়সা ফিরিয়ে দিলে।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। ছগ্‌গনলালের মনিব বৈজুপ্রসাদ যখন ইহার করায়ত্ত তখন ট্রাঙ্ক লইয়া ইনি ছিনিমিনি খেলিতে পারেন। বলিবার কিছু নাই। বসিতে পাইয়াছি—বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—'যদিও আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু লোকে আমায় খাতির করে খুবই। এই দেখুন না—বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া বেঞ্চির নীচ হইতে এক জোড়া ব্রাউন রঙের ভাল ডার্বি 'সু' বাহির করিলেন এবং স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন—এর দাম কত হবে বলুন তো?"

"পাঁচ ছ'টাকা তো মনে হয়।" ভয়ে ভয়ে বলিলাম।

"রায় মশায় কিন্তু আমার কাছ থেকে চার গণ্ডা পয়সার বেশী নিলেন না। কারণও অবশ্য আছে। রায় মশায়ের ছেলের চাকরিটা এক কথায় করে দিলাম কিনা। টম্‌সন সাহেবও আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।"

চকিতে বুঝিলাম এই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক সামান্য ব্যক্তি নহেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। গাড়ির বাতিটা জ্বলিয়া উঠিল। আড়চোখে একবার চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক ঢুলিতেছেন। গাড়ির অপর প্রান্তে দেখিলাম, বুড়িটা বেঞ্চিটার উপর জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। স্বল্পালোকিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে ওই বুড়িটাকে অত্যন্ত কদর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দুই

"ওটা কি পড়ছেন?"

"ও একটা মাসিক পত্র। একটা গল্প পড়ছি।"

ভদ্রলোক কোণে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছিলেন। আমিও পকেট হইতে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিয়াছিলাম।

ভদ্রলোক হাই তুলিয়া টুসকি দিয়া বলিলেন—"কার লেখা?"

"পান্নালাল চক্রবর্তীর।"

"মেয়েটি লেখে ভালোই, কিন্তু ওর লেখার চেয়ে ওর—"

"পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ নাকি?"

ভদ্রলোক একটু মুচকি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"মেয়েমানুষ শুধু নয় একেবারে তন্বী—গৌরী—যুবতী।"

আমি সত্যিই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদ্যুতের মত একটা পুলকিত শিহরণে সমস্ত সত্তা আকুল হইয়া উঠিল। পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা আমার ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বলিলেই পর্যাপ্ত হয় না, তাঁহার লেখার আমি একজন ভক্ত-পাঠক। যেখানেই পান্নালাল চক্রবর্তীর লেখা দেখতে পাই সাগ্রহে পড়িয়া ফেলি। সেই পান্নালাল মেয়েমানুষ। তন্বী—গৌরী—যুবতী!

ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন—"টুনি তো এই সেদিনের মেয়ে! সেদিন পর্যন্ত ফ্রক পরে, বেণী দুলিয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকেই বেশ চালাক-চতুর। এক কথায় ওরকম মেয়ে আমি এদেশে বড় একটা দেখিনি—"

বলা বাহুল্য, কৌতূহলী হইয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম?"

"ওর মত ঘোড়ায় চড়তে, সাঁতার কাটতে, সাইকেল চালাতে, গান গাইতে, ফুটবল খেলতে পারে এরকম ছেলেই আমাদের দেশে কম আছে। ভূষণকে বলেছিলাম, স্বাধীন দেশে জন্মালে ও-মেয়ে একটা রিজিয়া বা এলিজাবেথ হ'ত। অন্ততপক্ষে একটা নামজাদা সিনেমা স্টার। ভূষণ কিন্তু বিয়ের জন্য অস্থির হ'ল—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভূষণ কে?"

"ভূষণ হ'ল গিয়ে টুনির বাপ! বিয়ে দিলে, তবে ছাড়লে! বিয়ের পর ও কলম ধরেছে। তাও একবার লেখার দৌড়টা দেখুন।"

ভদ্রলোক আবার ঢুলিতে লাগিলেন।

মনে হইল অস্ফুটস্বরে যেন একবার বলিলেন—"টুনি—পান্নালাল চক্রবর্তী—হেঃ!"

একটা স্টেশনে ট্রেন থামিল।

আমার ঠিক সামনের বেঞ্চে একদল সাঁওতাল বসিয়াছিল, তাহারা সদলবলে নামিয়া গেল। আমি বেঞ্চটি খালি পাইয়া সটান গিয়া তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ফিরিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোক কোণে বসিয়া ঢুলিতেছেন। উপরের বাঙ্কে একজন স্ফীতোদর ব্যক্তি নাক ডাকাইতেছিলেন। তাঁহার মুখ দেখা গেল না। অনুমান করিলাম, কোন মাড়োয়ারী হইবেন।

চক্ষু বুজিয়া শুইয়া আছি। বারংবার একটি কথাই মনে হইতেছে—পান্নালাল চক্রবর্তী, তন্বী—গৌরী—যুবতী !

তিন

ধপাস করিয়া একটা শব্দ হইল।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বাঙ্কের সেই মাড়োয়ারীটি বাঙ্ক হইতে লাফাইয়া নামিয়াছেন, আর কিছু নয়। ভ'ল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, আমার অনুমান ভুল হইয়াছিল। ভদ্রলোক মাড়োয়ারী নয়—বাঙালীই। খোঁচা-খোঁচা গোঁফওয়ালা স্থূলাকার ভদ্রলোক লাফাইয়া নামিতে গিয়া-মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিলেন! সামলাইয়া লইয়া এক জোড়া বড় বড় সন্থ ঘুম-ভাঙা লাল চোখ মেলিয়া জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রভাত হইয়াছিল। ফিরিয়া দেখিলাম, তোরঙ্গের মালিক সেই ভদ্রলোকও আর ঢুলিতেছেন না। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' লইয়া 'ওয়ান্টেড' পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন। আমি আর একবার শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্ট করিলাম। ঘুম আসিল না। তথাপি চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম। কিন্তু চোখও খুলিতে হইল। ট্রেন আসিয়া ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দাঁড়াইল। চায়ের আশায় উঠিয়া বসিলাম এবং হাঁকাহাঁকি করিয়া ভাঁড়ে খানিকটা চা যোগাড় করিয়া ফেলিলাম।

খোঁচা-খোঁচা গোঁফের অধিকারী এবং তোরঙ্গের মালিক উভয়েই দেখিলাম চা লইলেন। পান্নালাল চক্রবর্তীর প্রসঙ্গটা আর একবার উত্থাপিত করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। পাতলা-ছিপছিপে চশমাধারী একটি যুবক আমাদের গাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, একি পান্নালাল যে। কোথা যাচ্ছেন ?"

খোঁচা গোঁফের মালিক মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"কোন্নগর।"

"দেখা হয়ে গেছে যখন, তখন আর যেতে দিচ্ছি না আপনাকে। কোন্নগর ওবেলা যাবেন। এবেলা এখানেই নেমে যান। অনেকদিন সাহিত্য-চর্চা করা হয়নি। এ মাসের "কাহিনী-কুঙ্কুম" কাগজে আপনার 'চলতি চাকা' পড়লাম। চমৎকার হয়েছে গল্পটা!"

স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি ?

কিন্তু না, থার্ড ক্লাস গাড়িতে উবু হইয়া বসিয়া এক ভাঁড় বিশ্রী চা-হস্তে স্বপ্ন দেখাও তো সম্ভব নয়। 'চলতি চাকা' গল্প আমিও কাল রাত্রে পড়িয়াছি এবং "কাহিনী-কুস্থম" এখনও আমার পকেটে আছে।

সবিস্ময়ে শুনিলাম, ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী মহাশয় গদগদকণ্ঠে বলিতেছেন—"আপনিই প্রসিদ্ধ গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী ?"

ছিপছিপে ভদ্রলোক সগর্বে বলিলেন—হ্যাঁ, ইনিই।"

ট্রাঙ্কের স্বত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—"নমস্কার, নমস্কার, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হ'ল। এতক্ষণ একসঙ্গে এলাম, পরিচয় ছিল না। আপনার ভক্ত-পাঠক একজন আমি। চললেন তা হলে ? আচ্ছা, নমস্কার।"

ছিপছিপে পাতলা ভদ্রলোকের সহিত বিখ্যাত গল্পলেখক পান্নালাল চক্রবর্তী নামিয়া গেলেন ! ট্রেনও ছাড়িয়া দিল।

মাটির ভাঁড়টা জানালা দিয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিলাম এবং ট্র' ঙ্কর মালিকের দিকে রুখিয়া ফিরিয়া বসিলাম।

সংক্ষেপেই বলিলাম—"এটা কি রকম হ'ল ?"

"কোন্‌টা ?"

বিস্মিত হইয়া ভদ্রলোক পাণ্টা প্রশ্ন করিলেন।

"বাঃ। কাল রাত্রে আমাকে আপনি বললেন পান্নালাল চক্রবর্তী একজন মেয়েমানুষ। তাকে আপনি চেনেন, অথচ—"

নির্বিকারভাবে ভদ্রলোক বলিলেন—"আর কি কি বলেছিলাম ?"

"আর বলেছিলাম আপনার ওই ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা—"

গম্ভীরভাবে ভদ্রলোক বলিলেন, "যিনি বলেছিলেন তিনি চলে গেছেন। আমি অন্য লোক।"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম।

"অন্য লোক মানে !"

"অর্থাৎ আমার 'অ্যাংগল্ অব ভিশন' মানে কিনা দৃষ্টিকোণ এখন একেবারে অন্য প্রকার।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না—"

সহসা ভদ্রলোকের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এক মুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"পাঁচ পয়সার মোদকের নেশা কতক্ষণ আর থাকবে বলুন। কাল নেশার ঘোরে মনে হয়েছিল, হয়ত পান্নালাল চক্রবর্তী মেয়েমানুষ--ট্রাঙ্কের দাম বারো আনা—জুতোর দাম চার আনা। এখন নেশা কেটে গেছে, এখন দেখছি পান্নালালের গোঁফ আছে এবং মনে পড়ছে এই ট্রাঙ্ক ও জুতোর দাম যথাক্রমে সাড়ে তের ও পৌনে সাত টাকা দিয়াছিলাম। 'থিওরি অব রিলেটিভিটি'—বুঝলেন না?"

বুঝিলাম এবং চুপ করিয়া রহিলাম।

হঠাৎ গাড়ির অপর প্রান্ত হইতে শুনিলাম—

"আরে বাবুয়া তু কাঁহা····· ·"

চাহিয়া দেখি সেই দুর্গন্ধ বুড়িটা আমাকে ডাকিতেছে।

রাত্রে অত বুঝিতে পারি নাই, এখন চিনিলাম, মাসিমার বাড়িতে পুরাতন দাই রুকৃমিনিয়া। মাসিমারা যখন বেহারে ছিলেন তখন হইতে রুকৃমিনিয়া মাসিমার বাড়িতে আছে। ছুটিতে দেশে গিয়াছিল, মাসিমার অসুখ শুনিয়া আসিতেছে।

বুড়ির কাছে গিয়া বসিলাম। বুড়ি 'মহাবীরজী'র নিকট পূজা চড়াইয়া আসিয়াছে—মাসিমা যাহাতে ভাল হইয়া যান। মলিন বসনান্তরাল হইতে মহাবীরজীর পরসাদ বাহির করিয়া খাইতে দিল। সানন্দে খাইয়া ফেলিলাম।

'থিওরি অব রিলেটিভিটি'ই বটে!

মুহূর্তের মহিমা

এক

দেখা যাক, এইবার কি করে!

আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গুরগন খাঁ হাতের গুলি পাকাইতে লাগিলেন। আসল নাম অবশ্য গুরগন খাঁ নয়, আসল নাম কালীকান্ত। কিন্তু গুরগন খাঁ নামেই প্রসিদ্ধ। কারণ তিনি পুরাকালে চন্দ্রশেখরে গুরগন খাঁর চরিত্র অভিনয় করিয়া নরনারীর হৃৎস্পদন দ্রুততর করিয়াছিলেন।

বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।

মুখে ছুঁচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

তদ্রূপযুক্ত গোঁফ।

রঙ বাদামি।

চক্ষু তীক্ষ্ণ।

বুকময় চুল।

—ইহা নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।

আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান, শিক্ষিত

জমিদার।

অপত্নীক।

মাংসাশী।

দুই

শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমতীর প্রেম কিন্তু ভিন্নমুখী।

তাহার একটি রোগা গরীব গোছের ছোকরাকে পছন্দ।

গুরগনের পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সে থাকিতে ওই পিলে-রোগা ছেলেটা '

ঘৃণায় তাহার সর্বাঙ্গের পেশী আকুঞ্চিত হইয়া উঠিত।

এক চড় মারিলে তাহার মুখটা যে কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু মুণ্ড উড়াইবার চেষ্টা গুরগন করেন নাই।

বরং ভদ্রভাবেই নানা প্রকার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

অর্থাৎ ভাঙা মোটা গলায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধিয়াছেন।

জরিদার নাগরা পরিয়াছেন,

স্নো ঘষিয়াছেন,

জুলফি পর্যন্ত রাখিয়াছেন।

কিন্তু অবিচলিতা শ্রীমতীর দৃষ্টি রোগা ছোক্‌রাটির উপরই স্থিরনিবদ্ধ!

গুরগন আগুন হইয়া উঠিয়াছেন!

তিন

আজ বৈকালে শ্রীমতী আসিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ছিলও। কিন্তু সে থাকা না-থাকারই সমান।

গুরগন বেশ বুঝিতেছিলেন, তাহার মন পড়িয়া আছে সেই রোগাটার কাছে। গুরগন ডাকিয়াছেন বলিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ্যভাবে গুরগনের অবাধ্যতা করিয়া এ গ্রামে টেঁকা মুসকিল।

হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া গোবিন্দগালী ভঙ্গিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই,

তাহা না হইলে—এই রিভলবার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তারপর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?

ভীমগর্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।

তিনু মানে সেই রোগা ছোকরাটি।

শ্রীমতী বলিল, আচ্ছা তা হ'লে আমাকে ভাববার সময় দিন একটু। এটা ভেবে দেখতে চাই। আপনি একটু ও ঘরে যনে। যাবার সময় কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে যান।

আবেগকম্পিত কণ্ঠে গুরগন কহিলেন, কতক্ষণ ভাবতে চাও?

দশ মিনিট।

বেশ।

স্খলিতচরণে গুরগন বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দেখা যাক, এইবার কি করে!

স্ফীতপেশী গুরগন দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দশ মিনিট চিন্তার পর শ্রীমতী বলিয়া গিয়াছে যে, আজ রাত্রে সে আসিবে। ঠিক দশটার সময় যেন গাড়ি পাঠানো হয়।

ঘড়ির দিকে গুরগন চাহিয়া দেখিলেন···মাত্র নটা বাজিয়াছে। এখনও এক ঘণ্টা বাকি।

উঃ!

পিপীলিকায় দংশন করে নাই।

অধীর গুরগনের প্রণয়ীস্থলভ অনুচ্চ কাতরোক্তি।

হঠাৎ গুরগনের হাসি পাইল—ভয়ঙ্কর হাসি পাইল।

রোগাটার কি দশা হইবে? আহা বেচারী!

বেচারী?

দারুণ ক্রোধে গুরগনের দন্তগুলি কড়মড় করিয়া উঠিল।

স্পর্ধার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল বাঁদরটার!

আবার দর্পণে গুরগন নিজের পেশীবহুল দেহটার পানে চাহিলেন।

মুখে স্মিত হাস্য।

পাঁচ

দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

গাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে গুরগন সাগ্রহে প্রতীক্ষমান!

মনের অবস্থা?

উপমা দিতে হইলে বলিতে হয়, যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।

সহসা গলির মোড়ে গাড়ির শব্দ হইল।

দুইটা ঘোড়ার আটটা খুর যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছে।

থামিল।

সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতেছে।

পর্দার কাছে আসিয়া একটু থামিল, তাহার পর পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শ্রীমতী।

শ্রীমতীর মুখ দেখিয়া গুরগনের উদ্যত প্রেম স্তম্ভিত হইয়া গেল!

সজলকণ্ঠে শ্রীমতী বলিল, আপনার কথার উপর নির্ভর ক'রে এলাম।

কি কথা?

তিমুকে আপনি কিছু বলবেন না। বলবেন না তো?

না।

দুইজনে মুখোমুখি হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত।

কয়েকটি অতি তীব্র মুহূর্ত।

সেই কয় মুহূর্তে কি ঘটিল জানি না।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গুরগন বলিলেন, আচ্ছা তুমি যাও।

শ্রীমতী বিস্মিত হইয়া রহিল।

তাহার পর চলিয়া গেল।

চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই গুরগনের মনে হইল, এ কি করিলাম! হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম?

তাঁহার কণ্ঠ দিয়া এ কে কথা কহিল? কে এ?

আশ্চর্য!

বিস্মিত হইয়া তিনি ঘোড়ার খুরের বিলীয়মান শব্দটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

খুড়ো

খুড়োর জন্য সকলেই চিন্তিত হইয়াছিলাম।

খুড়োর সহিত আমাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। কিন্তু খুড়োর মত আপনার লোকও আমাদের বড় বেশি ছিল না। খুড়ো বয়সে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক বড়। চুল গোঁফ পাকিয়াছে এবং পাকিয়া নিজেই বেকুব বনিয়া গিয়াছে। খুড়োর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

গ্রামের সকলেই খুড়ো-অন্ত প্রাণ।

একটি লোক ছাড়া।

তিনি খুড়ীমা।

আজ সকালে তিনি ঝাঁটা মারিয়া খুড়োকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। বিপন্ন খুড়ো চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

মাধব ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল—"খুড়ো, ব্যাপারটা কি বল তো ?"

খুড়ো কিছুক্ষণ নীরব।

একটু পরেই কিন্তু খুড়োর চক্ষু দুইটি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন—"লেপ-তোষক ছিঁড়ে গেছে, তা আমি কি করব বল দেখি ? পুরানো জিনিস ছিঁড়বে না ?"

"বেশ তো, নতুন লেপ-তোষক করান আবার—"

"পাগল হয়েছিস তোরা ? ওই লেপ-তোষকে বেশ চলে যাবে এ বছর। তা ছাড়া টাকাই বা কোথায় ?···যা যা, তোরা যা—ওসব আমাদের নিত্যি লেগে আছে। একটু পরেই মিটে যাবে। বাড়ি যা তোরা—"

আমরা চলিয়া আসিলাম।

বাড়ি গেলাম না।

খুড়ীমার কাছে গেলাম।

খুড়িমা যাহা বলিলেন তাহা অপ্রিয় হইলেও সত্য।

গত তিন বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া বলিয়া হার মানিয়া গিয়াছেন, লেপ-তোষক সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই।

"তোমরাই দেখ না বাছা—এই লেপ গায়ে দেওয়া যায়—না—এই তোষকে মানুষ শুতে পারে ? সামনে এই দুরন্ত শীত—পোড়ারমুখো নিজেই যে নিমুনিয়া হয়ে মরবে সে খেয়াল নেই। বললেই একটি মুখ হাসি হেসে বলবে—'ওতেই চালিয়ে নাও এ বছরটা।' ঝাঁটা মারি অমন হাসির মুখে ! কচি খোকা !"

লেপ-তোষকের অবস্থা দেখিলাম সত্যই জরাজীর্ণ।

নবাবগঞ্জের জমিদারের মৃত্যু হওয়ার পর হইতে খুড়োর অবস্থা সত্যই খারাপ হইয়াছে। নানা সদ্গুণের জন্য নবাবগঞ্জের জমিদার মহাশয় খুড়োকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত পাঁচ বিঘা লাখেরাজ জমি হইতে খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তাঁহার জীবিতকালে

খুড়োর অন্যান্য অভাবও তিনি মিটাইতেন। তাঁহার পুত্র আধুনিক যুবক। এ জাতীয় বাজে খরচ তিনি পছন্দ করেন না। আত্মসম্মানী খুড়োও নবাবগঞ্জের জমিদার বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছে।

খুড়ীমা কিন্তু মেয়েমানুষ—এত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধার ধারে না।

তাঁহার যুক্তি সহজ—শীত পড়িয়াছে—লেপ-তোষক চাই।

খুড়ীমার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

সকলে পরামর্শ ঠিক করিয়া ফেলিলাম—খুড়োকে এবার শীতে কষ্ট পাইতে দেওয়া হইবে না। দুই টাকা করিয়া দিলে লেপ-তোষক হইয়া যাইবে।

চণ্ডীমণ্ডপে ফিরিয়া গিয়া দেখি খুড়ো পাড়ার একদল ছেলের সহিত মহা উৎসাহে গুলি খেলিতেছেন।

আমাদের দেখিলেন—"কি রে, আবার ফিরলি যে তোরা?'

"শুনুন।"

খুড়ো উঠিয়া আসিলেন।

"কি?"

তাঁহার হাতে কুড়িটি টাকা দিয়া বলিলাম—"আপনি আজই শহরে যান ও লেপ-তোষক করিয়ে আনুন।"

"টাকা কোথায় পেলি?"

"সে পরে বলব এখন—এগারটায় বাস ছাড়বে—ওইতেই চলে যান আপনি—সন্ধ্যে নাগাদ হয়ে যাবে লেপ-তোষক—ন'টার বাসে ফিরতে পারবেন। যান—"

'তার মানে—'

'না না, যান আপনি—ও লেপ-তোষক এ বছর আর চলবে না। আপনি চলে যান—বুঝলেন?'

খুড়োর হাতে নোট দুইটা গুঁজিয়া দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। একবার পিছু ফিরিয়া দেখিলাম—বিস্মিত খুড়ো নোট দুইটি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম খুড়ো নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরিয়াছেন। দেখিয়া আসা যাক—কি রকম লেপ-তোষক হইয়াছে। খুড়োর বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম।

বাড়ির কাছাকছি যাইতেই শুনিলাম—খুড়ীমা তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন। ব্যাপার কি?

আমি বাড়ি ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—"দেখ তো ভাই—জিনিসটা ভাল হয়নি? আঠারো টাকায় এমন জিনিস কি পাওয়া যায়?"

দেখি—খুড়ো সেতার হাতে বসিয়া আছেন।

পাঠকের মৃত্যু

এক

অনেক কাল আগেকার কথা।

আসানসোল স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম। ঠিক আমার পাশেই আর একজন বসিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বই ছিল। বেশ মোটা একখানি উপন্যাস। আলাপ-পরিচয় হইলে জানিতে পারিলাম যে ভদ্রলোককে ট্রেনের জন্য সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমার ট্রেনের সময় ঘণ্টা তিনেক দেরী ছিল।

আমরা উভয়েই বাঙালী।

সুতরাং পাঁচ মিনিট পরেই তাঁহাকে যে প্রশ্নটি আমি করিলাম তাহা এই—"আপনার বইখানা একবার দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন না—"

এই উত্তরই স্বাভাবিক এবং আশাও করিলাম।

অবিলম্বে বইখানা দখল করিয়া বসিলাম।

দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহর।

আসানসোল স্টেশনের টিনের ছাদ।

সমস্ত কিন্তু তলাইয়া গেল।

উপন্যাস অদ্ভুত।

বহির মালিক ভদ্রলোক আড়-নয়নে একবার আমার পানে চাহিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন এবং একটি টাইম্-টেবল্ বাহির করিয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাসে পড়িয়া চলিলাম।

*　　*　　*

চমৎকার বই।

বস্তুত এমন ভালো উপন্যাস আমি ইতিপূর্বে পড়ি নাই।

একেবারে যেন জুতাইয়া দিতেছে।

*　　　*　　　*

দুই ঘণ্টা কাটিল।

বহির মালিক ভদ্রলোক টাইম্-টেব্‌ল্‌টি বারংবার উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া অবশেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন--"আপনার ট্রেনের তো আর বেশী দেরী নেই। এইবার—"।

বলিয়া একটু গলা খাঁকারি দিলেন।

আমি তখন তন্ময়।

চকিতে একবার হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম। এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। বই কিন্তু অর্ধেকের উপর বাকী। বাক্যব্যয় করিয়া সময় নষ্ট করিলাম না। গোগ্রাসে গিলিতে লাগিলাম।

অদ্ভুত বই।

বাকী ঘণ্টাটা যেন উড়িয়া গেল।

আমার ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল।

বই-এর তখনও অনেক বাকী।

রোখ চড়িয়া গিয়াছিল।

বলিলাম—"নেক্‌স্ট ট্রেনে যাব—এ বই শেষ না করে উঠছি না!"

বহির মালিক ভদ্রলোক একটু কাশিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন।

ট্রেন চলিয়া গেল—বই পড়িতে লাগিলাম।

শেষ কিন্তু করিতে পারি নাই।

শেষের দিকে অনেকগুলি পাতা ছিল না।

বহির মালিককে বলিলেন—"এঃ, শেষের দিকে এতগুলো পাতা নেই। আগে বলেন নি কেন? ছি ছি—"

এতদুত্তরে ভদ্রলোক কেবল নিষ্পলকনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

দুই

দশ বৎসর পরে উক্ত পুস্তকখানি আর একবার আমার হস্তগত হইয়াছিল।

আমার ভাগিনেয়ীর শ্বশুরালয়ে।

তাহাকে পৌঁছাইতে গিয়াছিলাম। সেইদিনই ফিরিয়া আসার কথা। কিন্তু বইখানির লোভে থাকিয়া গেলাম।

সুযোগমত বইখানি সংগ্রহ করিয়া আবার সাগ্রহে পড়া শুরু করা গেল। খাপছাড়াভাবে শেষটুকু না পড়িয়া গোড়া হইতেই আবার জমাইয়া পড়িব ঠিক করিলাম।

কয়েক পাতা পড়িয়াই কেমন যেন খটকা লাগিল।

উল্টাইয়া দেখিলাম—হ্যাঁ, সেই বই-ই তো!

আবার কয়েক পাতা অগ্রসর হইলাম—নাঃ, কেমন যেন গোলমাল ঠেকিতেছে।

তবু পড়িতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মনে হইল—নাঃ, আর তো চলে না।

এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্ধ্বশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম?

এমন রাবিশ মানুষে লেখে!

এ শেষ করা তো অসম্ভব!

দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়াছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।

যুগান্তর

এক

এককড়ির প্রপৌত্র, দুকড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছ কড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। বস্তুতঃ তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে-কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রী-শিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্মিত বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা জীবনটা ভরিয়া নানা-প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন, বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অঙ্গচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার পুত্র ছ'কড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া গৃহিণী ছ'কড়ির মাথাটি এমন-ভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কলিকাতার পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি. এ., এম. এ, পাশ করিয়ে দশটা মুণ্ড, বিশটা

হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাতেই বা কি? এই বাজারে কতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে।

দুই

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ:

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে ছ'কড়ির বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, ইহা অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছকড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সেকথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছ'কড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা-প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের সহিত মেয়েকেই তিনি ছ'কড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফলাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্বোপরি বছর চারেক পূর্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে একমত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চার বৎসর ধরিয়া পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

"দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। ইস্কুলে পড়া হাল-ফেশিয়ান-দুরস্ত মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর

আসে। বউমাটিকে গৃহকর্মনিপুণা কর। আমার সহধর্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন! তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ব গ্রামসুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে।"

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্মে সুনিপুণা করিতে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মসলা বাটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রকার গৃহকর্ম নিয়মিতভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কাজ করিতে শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সূতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে, দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে,পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন—

"উল-বোনা জরির কার্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা এমন কি উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃপুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরন্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না।"

এইভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছ'কড়ি বিন্দুবিসর্গও জানে না।

সে কলিকাতার মেশে থাকিয়া পড়াশোনা করে। বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে বিবাহ করিবে—তৎপূর্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে, জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছকড়ি বিবাহ করিবে না। আজকাল ছেলে-ছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দেশমত ছ'কড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ি চলিয়া আসে।

তিন

ইহার উত্তরে ছ'কড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এতদূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছ'কড়ি লিখিয়াছে—

বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রায় ছয় মাস পূর্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে একথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি কিছু লেখাপড়া জানে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিয়া আসিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন—"ছ'কড়ির চিঠি পড়ে দেখ, এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "লভে পড়েছে—"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে—প্রেমে"।

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, 'এর মূলে কি আছে জান?'

কুণ্ডু বলিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা—"

"না আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটিকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই—দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম খট্ খট্ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া

গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচনবিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন, "চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক ঢিলে দুই পাখিই মরবে—" পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সঙ্গী।

চার

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সঙ্গে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

"ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে, তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম, তুমি নাকি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মর্মে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও নাকি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা যোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পাই নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি।

"তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিসটা ধীরেসুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।"

"শ্রীমান ছ'কড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে

তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তার মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে মেলামেশাটা একটু বেশি রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছ'কড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টই বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল তুমি যদি জানিতে পার মেয়ে স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে তো আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়তো বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছ'কড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছ'কড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এবং ছ'কড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম, এবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যে আমি হরিণহাটিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।"

"সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না হয় দু'ঘা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার··" ইত্যাদি।

পাঁচ

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটারফ্লাই ফ্যাসানে গোঁপ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক বাড়ির বৈঠকখানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমি ফুলের কয়েকটি টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, "সব লক্ষ্য করছি—"

* * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশভূষা সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে? যাক, এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে তো বেশ?"

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিনেন, "ওটা কি?"

"ওমা, ছকড়ির খোকা হয়েছে যে। অমলকুমার—"

"কি?"

"অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।"

পোদ্দার স্তম্ভিত!

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন, "অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা। আমি কাশী ফিরে চললাম—"

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা গো—"

"অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—"

"বেশ তো, তুমিই একটা দাও না।"

"ন'কড়ি—"

"বেশ, তাই হবে—"

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

চৌধুরী

এক

পুরা নাম কংসারী চৌধুরী।

লোকে সংক্ষেপে বলে চৌধুরী।

বহুকাল পূর্বে কংস চৌধুরীকে একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই একবার দর্শনের ফলেই মনের যে চিত্রটি আঁকা হইয়া গিয়াছিল তাহা আজও মোছে নাই। মনে হইয়াছিল যেন একটা সিংহ অথবা শার্দূল মানুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছে।

ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মুখখানা।

আরক্ত চক্ষু দুইটি জাজ্বল্যমান।

ভ্রূযুগল-মধ্যে রক্ত সিন্দুরবিন্দু।

একমাথা কোঁকড়ান বাব্‌রিচুল—মাঝখানে সিঁথা।

শক্তিব্যঞ্জক মাংসল ওষ্ঠাধরে স্পর্দ্ধা-ক্রূর নীরব হাস্য।

হাসিলে অথবা কথা কহিলে উগ্র সাদা শ্বাদন্তগুলি চক্‌চক্‌ করিয়া উঠে—নাসিকা কম্পিত হইতে থাকে।

ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল।

দুই

একবার মাত্র দেখিয়াছি বটে কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছি অনেক। বস্তুত এই স্বল্পভাষী দুর্দ্ধর্ষ লোকটির সম্বন্ধে নানা কাহিনী না শুনিয়াছেন এমন লোক এ অঞ্চলে বিরল।

সমস্ত কাহিনীরই মূল কথা এক।

চৌধুরীকে কেহ কখনও কোন বিষয়ে হঠাইতে পারে নাই।

চৌধুরী গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু এখন তিনি প্রবল প্রতাপশালী জমিদার।

"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত কংসারি চৌধুরী"—শিরোনামা-সম্বলিত বহু আবেদন নিত্য তাঁহার দরবারে পৌঁছিতেছে।

দুর্দান্ত কর্মী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সর্বপ্রধান কথা এই যে তিনি অপরাজেয়।

কখনও কাহারও কাছে হার মানেন নাই।

জাল, জুয়াচুরী, ঘুষ, খোসামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল,—কার্যসিদ্ধির জন্য যখন যেটার প্রয়োজন, কাজে লাগাইয়াছেন।

কিছুতেই চৌধুরী পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

দারোগা, উকিল, ডাক্তার, হাকিম সকলেই চৌধুরীর নামে তটস্থ—সকলেই তাঁহার করায়ত্ত।

চৌধুরী মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ হাস্য করিয়া বলিতেন, "জুতো মারব আর কাজ আদায় করে নেব। চামড়ার জুতোয় না কুলোয়, চাঁদির জুতো লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে সব!"

এবং সত্যই সব হইয়া যাইতেছিল।

চৌধুরী করেন নাই কি?

গ্রামে পিতার নামে স্কুল-স্থাপন, মাতার নামে অবলা-আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ—এমন কি শিশু-হত্যা পর্যন্ত।

যাহাতে হাত দিয়াছেন তাহারই চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

এ দেশে এরূপ অদম্য চরিত্র সত্যই বিস্ময়কর।

একটা গোরুর গাড়ি যেন মন্ত্রবলে মোটরের গতি লাভ করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

সকলেই আমরা আশ্চর্য হইতাম।

লোকটা কখনও কোন বিষয়ে হার মানিল না!

হাতীর মুখে লাগাম লাগান যায় না বলিয়াই চৌধুরী হাতীই চড়িতেন না।

তিন

হঠাৎ কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গেল!

চৌধুরী সহসা অন্ধ হইয়া গেলেন।

অকস্মাৎ!

চতুর্দিক হইতে বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য আসিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন—দৃষ্টিশক্তি আর ফিরিবে না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চৌধুরী প্রশ্ন করিলেন।

'কিছুতেই না?'

'না।'

'লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও না?'

একটা প্রেসক্রিপ্‌শন লিখিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

সকলে চলিয়া গেলে চৌধুরী তাঁহার বিশ্বাসী দেওয়ানকে বলিলেন—'বল কি হে! পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল!"

দেওয়ানজী চুপ করিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে স্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চৌধুরী আবার বলিলেন—

'আচ্ছা যাও, তুমি ওষুধটা নিয়ে এস—'

দেওয়ানজী চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই ফিরিয়া দেখেন বাড়িতে মহা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে।

চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।

রিভলভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

গুলি করিয়াছেন চোখেই।

জাগ্রত দেবতা

এক

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশেপাশে কুচবন, ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ, মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মকদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং অত বড় বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালেদের বাড়ির ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধরণা দিয়াই তাহার মা তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুখুজ্জেদের যে আজকাল এত বাড়-বাড়ন্ত, তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়! মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের কাছে মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণ মন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়া থাকেন,—শিব শিব হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুখুজ্জেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ি সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয় এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভুরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিম ঘটে, এইটাই মহাদেব-

মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ—একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

দুই

সে বছরও বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুখুজ্জেদের বাড়িতে অভিনীত কর্ণার্জুন নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী-বাড়িতে যদিও পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সকলে পরিতৃপ্ত সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমক সহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এই সব লইয়া পালেদের চণ্ডীমণ্ডপে আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল, ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয় নি!

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার। হরেন বলিল, কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?

যাদব বলিল, দেখে এলাম, ঠিক আছে।

সকলেই আশা করেছিল, বিশেই এবার মহাদেবের নাম রক্ষা করিবে। সেও ঠিক আছে!

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণে নীরবে তামাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এ হতে পারে না। ভাল ক'রে খুঁজে দেখ, কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।

যাদব বলিল, এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।

নীলমণি বলিলেন, হতে পারে না।

যাদব হাসিয়া বলিল, আমি বলছি, কেউ পাগল হয়নি এবার।

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

তুমি তো সেদিনকার ছোঁড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কি? তোমার কথায় কি চিকালের নিয়ম উল্টে যাবে? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি।

যাদব স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল।

তিন

পরদিনও কোন পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এবছর কেহ পাগল হয় নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন, এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকি তিন শো চৌষট্টি দিন তো শিবকে কেউ পোঁছেও না, শিবের মাথায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আর কত সহিবেন। মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে ইহা আর কিছুই নয়, কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না? সনাতনপুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোন মহাদেব হইলে কোন্ কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ধনী মুখুজ্জেরা দায়ী করিলেন পুরোহিতকে—ওই ব্যাটাই কিছু গোলমাল করিয়াছে। পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নামহীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

চার

দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস কেহ না কেহ নিশ্চয় পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের মাহাত্ম্য নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

পরিবর্ত্তন

এক

খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খাইয়া সমস্ত মুখটা তিক্ত হইয়া গেল। অথচ সন্দেশগুলো ভালই ছিল।

গোড়া হইতে শুনুন তাহা হইলে।

* * *

হরিমোহন বড়লোক ছিল। টাকার অভাব ছিল না। সুতরাং বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবে না, ইহা জানিতাম। অর্থ দ্বারা যতটা চিকিৎসা ক্রয় করা সম্ভব, তাহা ক্রয় করা হইবে, হইতেও ছিল। দুইজন কৃতবিদ্য নাম-করা ডাক্তার প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসিয়া হরিমোহনের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। দুইজন নার্স আসিয়া হয়তো তাঁহার শুশ্রূষার ভারও লইতেন, কিন্তু সরমা—হরিমোহনের স্ত্রী তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি নিজেই সেবা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার সেবা-নিপুণতা দেখিয়া ডাক্তার দুইজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সেবার কোন ত্রুটি হইতেছে না। বেতনভোগী নার্স এতটা করিত কি না সন্দেহ।

রোগটি কিন্তু সাংঘাতিক--যক্ষ্মা। মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়াছে, প্রত্যহ জ্বর হইতেছে, কফ পরীক্ষা করানো হইয়াছিল—যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পয়সার জোরে সুচিকিৎসা হয়তো হইবে, কিন্তু সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় নাই। বরং তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকা-পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে—এই কথাই বারম্বার মনে হইতেছিল।

হরিমোহন আমার বাল্যবন্ধু। ক্লাসে উভয়ে পাশাপাশি বসিতাম এবং সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতাটুকু বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। কেন জানি না, এখনও তাহা অটুট আছে! না থাকিবারই কথা। ধনী ও দরিদ্রের প্রেম বড় ভঙ্গুর। আমাদের কপালে কেন যে তাহা টিকিয়া গিয়াছিল, বলিতে পারি না। যাই হোক, রোজ তাহার খবরটা লইতে যাইতাম। আরও বিশেষ করিয়া যাইতে

হইত এইজন্য যে, অর্থ এবং পত্নী ব্যতীত হরিমোহনের আপন বলিতে সংসারে আর কেহ ছিল না। গুড় থাকিলে অবশ্য পিপীলিকার অভাব হয় না। বহু পিপীলিকা আনাগোনা করিতেছিল। কিন্তু যেই ইহা নিঃসংশয়রূপে জানা গেল যে, হরিমোহনের ব্যাধিটি যক্ষ্মা, অমনিই পিপীলিকার দল ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিল। সম্ভবত অন্য গুড়ের গুদামের সন্ধানে গেল। আমি একা পড়িলাম। সরমার সহিত বন্ধুপত্নী হিসাবে যে লৌকিক আলাপটুকু ছিল, সেই সূত্রে তাহা গাঢ়তর হইতে লাগিল। এখন মনে হইতেছে, না হইলেই ভাল ছিল।

দুই

হরিমোহন বসিয়া কাশিতেছিল।

যক্ষ্মার বুক-ফাটা কাশি!

কাশিটা থামিলে বলিল, গলাটা বড্ড খারাপ হয়েছে। ওষুধ লাগিয়ে লাগিয়ে আর গার্গল করে করে তো হয়রান হয়ে উঠলাম। কাশিটা কিছুতেই কমছে না কেন বল দেখি?

বলিলাম, কমবে, কমবে। এত ঘাবড়াস কেন?

ঘাবড়াবার ছেলে আমি নই! তবে কি জানিস ক্রমাগত কাশীটা বিরক্তিকর।

দুইটা কথা বলিতে না বলিতেই আবার কাশিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ উভয়ই চুপচাপ।

হরিমোহন বলিল, স্পিউটাম একজামিন করে কিছুই পাওয়া যায় নি, শুনেছিস তো? যাবে না, তা আগেই জানতাম। একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার অ্যাটাক হয়েছে আর কি।

এক পেয়ালা দুধ হাতে করিয়া সরমা প্রবেশ করিল।

কাশি শেষ করিয়া হরিমোহন বলিল, ও কি আবার?

দুধ।

এখন আবার দুধ কেন?

ডাক্তারেরা ব'লে গেছেন দুধ দিতে যে।

কি মুশকিল! একটু বিশ্রাম দাও আমাকে তোমরা। এই তো—আবার কাশি শুরু হইল।

সামলাইয়া সে বলিতে লাগিল, এই তো কিছুক্ষণ আগে ওষুধ খেলাম, তারপর গার্গল, তারপর স্প্রে, তারপর ফলের রস—আবার এখুনিই দুধ ?

ডাক্তাররা বলেছেন, ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করলেই শিগ্‌গির সেরে উঠবে। বেশি দুধ তো আনি নি। নাও।

সরমা পেয়ালাটা সম্মুখে ধরিল।

দুই চুমুক খাইয়া হরিমোহন বলিল, আর না দোহাই তোমার, জায়গা নেই আর পেটে !

না না, খেয়ে নাও এটুকু। বলুন না আপনি একটু।

আমিও অনুরোধ করিলাম।

আচ্ছা, আর এক চুমুক খাচ্ছি তোর অনুরোধে।

আধ পেয়ালার বেশী সে কিছুতেই খাইল না।

সরমা পেয়ালাটা লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিল। আমিও উঠিয়া পড়িলাম। রাত হইয়াছিল। সরমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতে হইবে। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, টেম্পারেচারের কথাটা হরিমোহনকে যেন জানানো না হয়। হরিমোহনকে বলিলাম, নটা বেজে গেছে। আজ উঠি ভাই। কাল আবার আসব।

আচ্ছা।

হরিমোহন পাশ ফিরিয়া শুইল।

তিন

পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। দেখিলাম, সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধটা পান করিতেছে। বলিলাম, এ কি করছেন আপনি ?

ধরা পড়িয়া গিয়া সরমা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। আরক্ত মুখে বলিল, ও কিছু নয়।

তারপর সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, দেখে যখন ফেলেছেন তখন উপায় নেই। কিন্তু বলবেন না কাউকে।

তা না হয় বলব না। কিন্তু এঁটো দুধটা খাচ্ছেন কেন ?

একটু হাসিয়া সরমা বলিল, স্বামীর এঁটো খেলে দোষ কি ?

দোষ কি !

যক্ষ্মার সংক্রামকতা সম্বন্ধে আমার যতটা জানা ছিল বলিলাম। সরমা আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিল, তাহার পর সহসা প্রদীপ্ত একজোড়া চোখ আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বলিল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন আমাকে? উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হলেও বা কথা ছিল।

অনেক হিতকথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে বলিলাম। আনত মস্তকে হাসিমুখে নীরবে সে সমস্ত শুনিয়া গেল। প্রতিবাদ পর্যন্ত করিল না।

চার

হরিমোহনের অসুখ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। তাহার যে যক্ষ্মা হইয়াছে, এ সংবাদ তাহার নিকটও আর চাপা রহিল না। সে জানিতে পারিল এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দুইজন ডাক্তার দেখিতেছিলেন, তাঁহারাও ব্যস্ত হইলেন এবং আরও দুইজন ডাক্তারকে পরামর্শার্থে ডাকিলেন। চারিজনে মিলিয়া ঠিক হইল যে, কয়েকটি এক্সরে প্লেট লওয়া দরকার। তাহাও যথাসময়ে হইল। এক্সরে করিয়া দেখা গেল, একটি ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অপরটি একেবারে নির্দোষ আছে। স্যানাটোরিয়মে অস্ত্র-চিকিৎসা করাইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

অর্থের অভাব ছিল না। সুতরাং অবিলম্বে হরিমোহন ধরমপুর চলিয়া গেল। সরমাও সঙ্গে গেল।

পাঁচ

ইহার পর অনেক দিন হরিমোহনের খবর পাই নাই। কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহাও কালক্রমে থামিয়া গেল। হরিমোহন পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল আছে, ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাহার পর হরিমোহন সম্বন্ধে কৌতূহলও ক্রমশঃ কমিয়া গেল, হরিমোহনও বিশেষ খবর লইল না। হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম হরিমোহন সুইট্‌জারল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছে। কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছুই জানিতে পারিলাম না। ভাবিলাম টাকা আছে যাইবে না কেন!

নিয়মিতভাবে কেরানীগিরি করিতে লাগিলাম। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের খবর লইবার অধিকার আমার নাই, সুযোগও ছিল না। হরিমোহন কোনও ঠিকানা দিয়া যায় নাই।

ছয়

দশ বৎসর অতীত হইয়াছে।

হরিমোহনের কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন তাহার পত্র পাইলাম। দুই ছত্র চিঠি।

"ভাই নরেশ,

আগামী মঙ্গলবার কলিকাতায় পৌঁছিব। পার তো দেখা করিও।"

হরিমোহ

দেখিলাম চিঠিখানা লিখিয়াছে দেশের ঠিকানা হইতে। কবে দে আসিল সে! কিছুই তো জানি না!

* * *

মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর আপিস-ফেরত তাহার বাসায় গেলাম। বাড়িতেই ছিল। খুব ঘটা করিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাই হরিমোহনের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। সুস্থ সবল লম্বা-চ চেহারা। কে বলিবে ইহার যক্ষ্মা হইয়াছিল।

বলিলাম, বেশ সেরে গেছিস তো?

হ্যাঁ, কমপ্লিটলি।

যে যে ডাক্তারের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে নিরাময় হইয়াছে, তাহাদের করিতে করিতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সুইট্জারল্যাণ্ড গেছলি নাকি?

হ্যাঁ।

কেমন লাগল?

অতি চমৎকার! কেতাবে যা পড়া যায়, তার চেয়ে ঢের—ঢের সুন্দর। চল্ চল্, ওপরে চল্!

উপরে গেলাম। উপরে গিয়াই হরিমোহন চীৎকার জুড়িয়া দিল, কই, নরেশ এসেছে—চা জলখাবার আন—ব'স্ বস্।

দামী সোফাটার উপর একটু সন্তর্পণেই বসলাম।

হরিমোহন বলিতে লাগিল, তারপর তোর খবর কি বল্! তুই অনেক বদলে গেছিস দেখছি। কানের কাছের চুলগুলো যে বেবা গেছে রে। এরই মধ্যে বুড়িয়ে গেলি। ওদেশে পঞ্চাশ বছরে যৌ হয়—বুঝলি?

'শুরু' কথাটার উপর জোর দিল।

আমার যে প্রত্যহ একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছে এবং ডাক্তারে আমারও টি. বি. সন্দেহ করিতেছে, সে কথা আর তাহাকে বলিলাম না, বলিয়া লাভ নাই। কেবল বলিলাম, ওদেশে আর এদেশে ঢের তফাত রে ভাই। তা ছাড়া আর একটা কথা ভুলে যাস কেন? সেই বিশ বছর বয়স থেকে এক নাগাড়ে কেরানীগিরি ক'রে চলেছি—দম নেবার অবসর নেই।

তাতে কি হয়েছে? খাটলে কি মানুষ রোগা হয়?—বলিয়া হরিমোহন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঘর-কাঁপানো হাসি হরিমোহনের বিশেষত্ব। হাসির জোর কিছুমাত্র কম হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে। তাহার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য ও মনের তারুণ্য দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল। পঁচিশ বছরের পর তাহার বয়স যেন আর বাড়ে নাই।

সরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। হাতে জলখাবারের প্লেট।

সরমাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। দশ বৎসরে মানুষের এত পরিবর্তন হইতে পারে।

আমার ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হওয়াতেই সম্ভবত সরমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

চা-টা নিয়ে আসি?

জলখাবারের প্লেটটা সামনের তেপায়াটার উপর নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কে এ।

হরিমোহনকে বলিলাম, সরমাকে তো একদম চেনা যায় না! এই দশ বৎসার ভীষণ বদলে গেছে দেখছি।

হরিমোহন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, হ্যাঁ, বদলে গেছে। তুই যাকে দেখেছিলি, এ সে নয়—এ আর এক সরমা। সে সরমা বহুকাল আগেই মারা গেছে। তারও টি. বি. হয়েছিল। দুটো লাংসেই। কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিল, শেষটা ইন্‌টেস্‌টাইনও খারাপ হয়ে গেল। অনেক খরচপত্তর করলাম, কিছুতেই বাঁচল না।

উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। হরিমোহনই আবার কথা বলিল।

থাকতে পারলাম না—দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হ'ল। খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে শেষে। ও নামটা মুখস্থ হয়ে গেছে। যে লোক গেছে সে আবার ফিরবে না জানি, তবু নামটার—

থামিয়া গেল। সরমা দ্বারপথে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে। হরিমোহনের দিকে নানারূপ খাদ্যপূর্ণ এক প্লেট খাবার আগাইয়া দিতেই হরিমোহন বলিল, অত আমি খাব না। কত দিয়েছ আমাকে!

শুনিলাম সরমা বলিতেছে, ডাক্তারে তোমাকে খেতে বলেছে ভাল ক'রে। আজকাল তুমি খাচ্ছ না মোটে। একটু ব'সে যান তো আপনার বন্ধুকে।

হরিমোহন বলিল, নরেশের জন্যে খেজুরে গুড়ের সন্দেশ আনিয়েছ তো? ভারি ভালবাসে ও খেজুরে গুড়ের সন্দেশ খেতে।

হ্যাঁ, এই যে আনিয়াছি।

হাসিয়া এক প্লেট খেজুরে গুড়ের সন্দেশ সে আমার দিকে আগাইয়া দিল।

জৈবিক নিয়ম

বেচারার দোষ ছিল না। এ অবস্থায় সব যুবকই এমনই করিয়া থাকে। জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। মনে হয়, বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি; হাব-ভাবে চলনে-বলনে পৌরুষের মহাত্ম্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক! মেয়েটি তাহা দেখুক, অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক, বাঃ, বেশ ছেলেটি তো! অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশীগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিতস্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্য ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে-অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাহাকে নিজস্ব ধরণে, নিজস্ব ভঙ্গীতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।

সেদিন প্ল্যাটফর্মে রোগা-গোছের ছোকরাটি তাহার নিদারুণ কৃশতা সত্ত্বেও যাহা করিতেছিল, তাহা এই সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতেই করিতেছিল। নিরপেক্ষভাবে নিরীক্ষণ করিলে ছোকরাটির মধ্যে তেমন অসাধারণ কিছু ছিল না। সাদা-টুইলশার্ট-পরা উনিশ-কুড়ি বছরের একটি রোগা ছোকরা গোঁফ উঠি-উঠি করিতেছে। পায়ে সস্তা চটকদার এক জোড়া স্যাণ্ডাল।

অদূরে একটি কমবয়সী মেয়ে বসিয়া আছে।

স্টেশনটি অতি ছোট।

প্ল্যাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জন-চারেক যা ী অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে জন-দুই সাঁওতাল। তাহারা মোট-ঘাট লইয়া একটু দূরে বসিয়াছিল। বাকি দুইজনের মধ্যে একজন ওই রোগাগোছের ছোকরা এবং আর একজন ওই তরুণীটি। এদিকে ওদিকে দুই-একটি কুলি ও ফেরিওয়ালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রেলের বাবুরা নিজ নিজ কামরায় কাজ করিতেছেন। এই নিরীহ পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও ছোকরাটির অন্তরে কেমন যেন একটা উদ্দীপনা অকারণে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোকরাটি অবশ্য মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উত্তেজনার আধিক্য সম্ভবত সেইজন্যই।

ছোকরা কণ্ঠস্বরকে অকারণে অসম্ভব রকম পৌরুষ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, কুলি, কুলি, এই কুলি—

একটি কুলি আসিল।

কি বাবু?

আমার মোটটা ট্রেনে উঠিয়ে দিবি। বুঝলি?

আচ্ছা বাবু।

কত নিবি?

চার পয়সা বাবু।

চার পয়সা কেন, চার আনা দেব তোকে। ভাল দেখে একটা গাড়িতে চড়িয়ে দিস, কেমন?

বিস্মিত কুলি বলিল, আচ্ছা বাবু।

ঠিক পারবি তো?

ঠিক পারব বাবু।

বহুৎ আচ্ছা।

ছোকরাটি কুলির পিঠটা চাপড়াইয়া দিল।

কোন্‌টা আপনার মোট বাবু?

একটি ছোট সুটকেস ছাড়া অবশ্য অন্য কোন গুরুতর মোট ছিল না। ছোকরা তাহাই দেখাইয়া দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, ট্রেন আজ লেট আসছে না কি?

আধ ঘণ্টা লেট বাবু।

রিপোর্ট করব আমি।

কাহার কাছে এবং কাহার নামে রিপোর্ট করিবে, তাহা অবশ্য অনুক্তই রহিল।

কুলি চলিয়া গেল।

ছোকরা দৃপ্তভাবে রোষকষায়িত লোচনে তরুণীর সম্মুখে খানিকক্ষণ পদচারণা করিল এবং কিছুক্ষণ পদচারণা করিয়া রুষ্ট ভাবটা একটু প্রশমিত হইলে মুখটি সুচালো করিয়া শিস দিতে লাগিল। খানিকক্ষন শিস দিবার পর আবার তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আদেশের ভঙ্গীতে ডাকিতেছে, সোডা, সোডা, এই সোডা, ইধার আও।

সোডা-বিক্রেতা সমীপবর্তী হইল।

একঠো সোডা দেও। জল্‌দি করো।

দাম দু আনা বাবু—

কুছ পরোয়া নেই—দেও তুম।

এই বলিয়া যেন দেখিতেছে না এইভাবে সে মেয়েটির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। বলা বাহুল্য, মেয়েটিও ছেলেটিকে লক্ষ্য করিতেছিল। হঠাৎ চোখাচোখি হইয়া যাওয়াতে মেয়েটি তাড়াতাড়ি চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল।

লিজিয়ে বাবু।

ফেনায়িত সোডার বোতলটা ধরিয়া রুগ্ন যুবকটি সগর্বে পা ফাঁক করিয়া ঊর্ধ্বমুখে সোডা পান করিতে লাগিল। সোডা-পান করাটাও যেন মস্ত একটা বীরত্ব!

ইতিমধ্যে একটা চানাচুরওয়ালা আসিয়া জুটিল।

মেয়েটি ইঙ্গিতে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া চানাচুর খরিদ করিতেছে দেখিয়া যুবকটিও সেইদিকে আগাইয়া গেল।

কি দর তোমার চানাচুরের হে?

এক পয়সা ঠোঙা বাবু।

ওইটুকু ঠোঙা এক পয়সা! যে রকম সাইজ, পয়সায় চারটে ক'রে হওয়া উচিত। সিম্‌প্লি এ কাটথ্রোট! পয়সার চার ঠোঙা ক'রে দিবি?

পারব না বাবু।

পারব না মানে?

চানাচুরওয়ালা বলিল, ছোলার দর আজকাল বাবু—

ছোলার দর আজকাল কত? বেশ তো, খতিয়েই দেখা যাক।

রুখিয়া ছোকরা আগাইয়া গেল।

ওসব কথা ছেড়ে দিন বাবু। বেকার বাত বাড়িয়ে ফয়দা কি! লেবেন আপনি চানাচুর? ক' ঠোঙা চাই?

ভ্রূযুগল উৎক্ষিপ্ত করিয়া ছোকরা একবার আপাদমস্তক চানাচুর-ওয়ালাটাকে দেখিয়া লইল। তাহার পর বলিল, ক' ঠোঙা? তোর যত চানাচুর আছে সব কিনে নিতে পারি আমি, জানিস? কি ঠাউরেছিস তুই আমাকে?

উত্তরে চানাচুরওয়ালা দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিল।

হাসছিস যে বড়? কত চানাচুর আছে তোর? দাম কত হবে?

এক টাকা বাবু।

ছোকরা তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ খুলিয়া ঠঙ করিয়া একটা টাকা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। চানাচুর-বিক্রেতা এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কি গভীর মনোবৃত্তি যে ছোকরাকে নাচাইতেছে, তাহা মূর্খ বেচারা কি করিয়া বুঝিবে? টাকা লইয়া সে চলিয়া গেল।

এত চানাচুর লইয়া ছোকরা কিন্তু বিব্রত হইয়া পড়িল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মেয়েটিকে বলিল, আপনি আরও কিছু নিন।

না, না, আমার আর চাই না।

কুণ্ঠিতা তরুণী সলজ্জভাবে মাথা নাড়িল।

অনেকগুলি ঠোঙা সে তরুণীটির পাশে বেঞ্চিটার উপর একরকম জোর করিয়াই রাখিয়া দিল। ইহার দৃষ্টিকটুতা তরুণীকে সঙ্কুচিত করিতে লাগিল। কিন্তু সে বেচারা আর কি করিবে! লজ্জায় আনত নয়নে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোন ভদ্র উপায় তাহার মাথায় আসিল না।

বাকি ঠোঙাগুলি স্যুটকেসের উপর রাখিয়া আসিয়া ছোকরা সহাস্যমুখে বলিল, ওগুলো ট্রেনে যেতে যেতে ধীরে-সুস্থে শেষ করবেন। কোথা যাচ্ছেন আপনি? এই ট্রেনেই যাচ্ছেন তো?

মেয়েটি লজ্জা পাইয়াছিল।

মৃদুস্বরে বলিল, আমি পরের ট্রেনটায় যাব।

ও, তাই নাকি !

ছোকরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার পায়চারি শুরু করিল। বুক চিতাইয়া উন্নত মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ পদচারণ করিল।

আবার থামিল।

তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া হাতের পেশীগুলি টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিল। পেশী অবশ্য বেশী ছিল না। কিন্তু যতটুকু ছিল, ততটুকুই বা ফুলাইতে ক্ষতি কি !

একটু শিস দিল।

যৎসামান্য গোঁফটুকুতে দুই-একবার তাও দিল।

তাহার পর তাহার নজরে পড়িল, প্ল্যাটফর্মের ওধারটায় একটা কৃষ্ণচূড়া-গাছের পুষ্পিত ডাল প্ল্যাটফর্মের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সে তখন সেই দিকে গেল এবং লাফাইয়া ডালটাকে ধরিয়া ফুল পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া কিছু ফুল পাড়িলও।

শ্রান্তদেহে একগোছা কৃষ্ণচূড়া লইয়া আবার সে মেয়েটির কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন আসিয়াছে।

কুলিটা স্যুটকেস ও চানাচুরের ঠোঙাগুলি একটা ফাঁকা গাড়িতে তুলিয়া দিয়া চার আনা পয়সাই পাইল।

ছোকরা গাড়িতে উঠিয়া জিনিসপত্রগুলি ঠিকমত রাখিয়া আবার নামিয়া আসিল।

উপবিষ্ট তরুণীটির পানে একবার চাহিয়া দেখিল।

দেখিল, তরুণীও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

গার্ড বাঁশী বাজাইয়া সবুজ নিশান নাড়িলেন।

ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল।

তখনও ছোকরা ট্রেনে উঠে না।

ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশ বাড়িয়াছে, তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য সহাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নীচে—চাকার নীচে পড়িয়া গেল।

আর কিছু করিবার সুযোগ সে পাইল না।

চিঠি পাওয়ার পর

এক

সমস্ত দিনটা যেন আর কাটিতেছে না।

তাহাকে আর 'একবার দেখিতে পাইব—এই আশায় বিভোর হইয়া রহিয়াছি। যাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়াছিলাম, আবার যে তাহাকে দেখিতে পাইব—এ কল্পনাও করি নাই। সে যে এ-পথে আবার আসিতে পারে, তাহার সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়াছে। সে আসিতেছে এবং আমি তাহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়া উঠিয়াছি। আমার বিগত স্বপ্নজীবন পুনরায় স্বপ্নায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য, যদিও তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে, তথাপি এই ঘটনাকে আমার জীবনের বৃহত্তম ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছে। যত কম সময়ের জন্য হউক এবং যে ভাবেই হউক, তাহাকে আর একবার দেখিতে পাইত তো! তাহাই যে পরম লাভ। চিঠিখানা আবার খুলিয়া পড়িলাম।

শ্রীচরণেষু,

উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেক দিন আপনাকে দেখি নি। দেখতে ইচ্ছা করে। আসবেন তো? আশা করি, আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।

অমিতা

দুই

কিছু ভুলি নাই।

অতীতের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি তাহাদের সমস্ত বর্ণসুষমা লইয়া আবার ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে সেই দিনটির কথা, সেদিন অনেক ইতস্তত করিয়া আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল হৃদয়ে তাহাকে প্রথম প্রণয়-নিবেদন করিয়াছিলাম। মনে ভয় ছিল, যদি সে ভুল বোঝে—যদি সে

রাগ করে! কিন্তু সে কিছুই করে নাই। স্মিত মুখে সহজ ভাবে সে আমার নিবেদন শুনিয়াছিল। তাহার লজ্জারুণ কপোল, আকম্পিত অধর, আনন্দিত নয়ন—তাহার সেদিনকার সম্পূর্ণ আলেখ্যখানি আমার মনের পরতে পরতে উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে। কখনও বিলুপ্ত হইবে না। পরিপূর্ণ সুখ মানুষের জীবনে বহুবার আসে না। আমার জীবনে একবার মাত্র আসিয়াছিল। আর আসিবে না তাহাও জানি। স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে হইবে। ভুলিলে চলিবে কেন? ভুলি নাই, এক দণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারি না। তোমাকে এ জীবনে বহির্লোকে পাই নাই তাহা সত্য, কিন্তু আমার অন্তরলোকে যে আসন তুমি অলঙ্কৃত করিতেছ সে আসন এখনও অবিচলিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে। তুমি তো আমাকে চাহিয়াছিলে—সমস্ত প্রাণ দিয়াই চাহিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে লইতে পারিলাম কই? তোমাকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাকে ছাড়িয়া আসিতে হইল। আমার দুর্ভাগ্য দিয়া তোমাকে লাঞ্ছিত করিতে আমি কিছুতেই পারিলাম না। আমার দুর্ভাগ্য আমি একাই বহন করিব ইহাই আমার ললাটলিপি। তোমাকে ইহার অংশভাগিনী করিব কেন? তোমাকে ভালবাসিয়াছিলাম বলিয়াই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

তিন

ভগবান বলিয়া কেহ আছেন হয়তো! এই নিখিল বিশ্বের কার্যকলাপ তাঁহারই অমোঘ বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে—এই ধারণা করিয়া নির্মম নির্যাতনের মধ্যে আমরা কিঞ্চিত শান্তি লাভ করি। তাহা না হইলে অসহায় মানব অকারণ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিত না। কে একজন মনীষী নাকি বলিয়াছেন, ভগবান যদি না-ও থাকেন, নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে একটা ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। মানুষের পক্ষে ভগবানহীন জীবন অশান্তিজনক। আমিও আমার এই দুর্ভাগ্যটাকে অমোঘ বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলাম। মানিয়া লইয়াছিলাম যে, যিনি আমার স্বপ্ন-সৌধশীর্ষে নিদারুণ বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৃষিত-অধরসমীপবর্তী সুধাপাত্রকে যিনি অপ্রত্যাশিত রূঢ় আঘাতে বিচূর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি করুণাময় পরমেশ্বরই। যাহা করিয়াছেন, তাহা উচিত বলিয়াই করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া আমরা তাঁহার বিধানের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারি না। সুতরাং তাঁহার কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে আমরা যে অপারগ তাহাই নয়—অনধিকরী। নিরুপায় মন এই যুক্তি মানিয়াছিল। অমিতার পিতামাতার আপত্তি ছিল না। আমার দিকে পিতামাতাই ছিল না। তবু বিবাহ হইল না। সমস্ত যখন ঠিকঠাক, হঠাৎ একদিন কাশিতে কাশিতে এক ঝলক রক্ত আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। জীবাণুতত্ত্ববিৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত শুনিয়াও অমিতা কিন্তু আমাকে চাহিয়াছিল। আমি কিন্তু পারিলাম না।

বিবেকে বাধিল।

চার

অমিতার অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল।

অমিতার মত পাত্রী পড়িয়া থাকে না। সুন্দর স্বভাব, সুন্দর চেহারা, সুন্দর শিক্ষা। অমিতার মত মেয়ে বাংলা দেশে বেশি নাই। আমার চোখে তো আর একটাও পড়িল না। রূপসী শিক্ষিতা মেয়ে হয়তো অনেক আছে, কিন্তু অমন মৃদু, অমন স্নিগ্ধ, অমন সুমিষ্ট স্বভাব তো আর কোথাও দেখিলাম না। অমিতার পিতামাতা অমিতার জন্য যে পাত্রটিকে নির্বাচিত করিলেন, তিনিও অমিতার উপযুক্ত বড় বংশের ছেলে, বড় চাকুরি করেন। স্বাস্থ্যবান সুরূপ ভদ্রলোক। কোনও দিক দিয়াই কোন খুঁত নাই। আইনত অমিতার সুখে থাকিবার কথা। হয়তো সুখেই আছে। কিন্তু কেন জানি না, আমার অন্তরনিবাসী অবুঝ ব্যক্তিটির বিশ্বাস—অমিতা সুখে নাই। আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলেই বেশি সুখী হইত। যদিও আমি অমিতার স্বামীর অপেক্ষা সব দিক দিয়াই নিকৃষ্ট, তথাপি মনে হয়, অমিতা এখনও মনে মনে আমারই প্রতীক্ষা করিতেছে। অত্যন্ত যুক্তিহীন এই। স্বপ্নটিকে আমি মনে মনে আঁকড়াইয়া আছি যে, তাহার স্বামীর বড় বংশ, ভাল চাকরি, সুন্দর রূপ, অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও সে ততটা সুখী নয়, যতটা সুখী সে হইতে পারিত যদি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম। হয়তো ইহা আমার অহমিকা। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অহমিকাটুকুকে আশ্রয় করিয়া আমি বাঁচিয়া আছি। সর্বগ্রাসী জলপ্লাবনে সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে, অহমিকার ক্ষুদ্র দ্বীপটুকু শুধু জাগিয়া আছে। অত্যন্ত নিঃসঙ্গভাবে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিয়া আছি।···

আবার তাহার চিঠিখানি পড়িলাম।

পাঁচ

দেখা হইলে কি বলিব তাহাকে ?

এত দিন পরে দেখা—পাঁচ মিনিটের জন্য। স্টেশনের ভিড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি তাহাকে বলিব ? অথচ বলিবার কত কথাই মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত কথা গুছাইয়া বলিব কেমন করিয়া ? হয়তো কিছুই বলা হইবে না। হয়তো অতি সাধারণ কুশল-প্রশ্নের ভিতর দিয়াই এই অতিশয় মূল্যবান পাঁচটি মিনিট অতিবাহিত হইয়া যাইবে। জীবনে হয়তো তাহার সহিত আর দেখাই হইবে না। হয়তো···সহসা মনে হইল, তাহার স্বামী সঙ্গে থাকিবে। আবার পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম।

ছয়

সমস্ত দিন বাজারে ঘুরিয়াছি।

কলিকাতার মিউনিসিপাল মার্কেটের ডালমুট অমিতার বড় প্রিয়বস্তু ছিল। নানা স্থানে ঘুরিয়াও ঠিক সে রকম ডালমুট যোগাড় করিতে পারিলাম না। হয়তো এখানকার জিনিস তাহার পছন্দ হইবে না। একজনকে ফরমাশ দিয়াছি। সে আশ্বাস দিয়াছে, সন্ধ্যা নাগাদ ভাল ডালমুট প্রস্তুত করিয়া দিবে। ডালমুট ছাড়া অমিতার জন্য আর যে কি লইয়া যাইব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।

* * *

জামা কাপড় ময়লা হইয়া গিয়াছে।

মেসের চাকরটাও ছুটি লইয়া বাড়ি গিয়াছে। নিজেই একটা জামা ও কাপড়ে সাবান দিতে বসিলাম। ময়লা জামা কাপড় পরিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে পারিব না।

* * *

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ মনে পড়িল, কিছু গোলাপ ফুল জোগাড় করিয়া লইয়া গেলে হয়। লাল নয়—সাদা গোলাপ। নরেনদের বাড়িতে আছে—গেলেই পাইব।

হাত-ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। এখনও দেরী আছে। নরেনের বাড়ির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সাত

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নরেনের বাড়ি হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন চতুর্দিক অন্ধকার। বড় বড় সাদা গোলাপগুলি অতি সুন্দর। অমিতা নিশ্চয়ই খুশী হইবে। ফুলগুলি পাইতে কিন্তু দেরী হইয়া গেল। নরেন বাড়ি ছিল না, মালীটাও বাহিরে গিয়াছিল। রাস্তায় নামিয়া হাত-ঘড়িটা আর একবার দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরী আছে। মাত্র সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। যে লোকটাকে ডালমুটের ফরমাশ দিয়াছিলাম, সে এখান হইতে কিছু দূরে একটা গলির মধ্যে থাকে। গেলাম সেখানে!

আট

স্টেশন।

নানা ধরনের যাত্রী নানা ধরনের জিনিসপত্র লইয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অন্তর জুড়িয়া একটা বেদনাময় অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে-কর্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসিবার আর কত দেরী আছে?

তিনি নির্বিকারভাবে বলিলেন, সে ট্রেন তো আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্য ট্রেন আসছে। এখন তো সাড়ে নটা।

সে কি!

নিজের হাত-ঘড়িটা দেখিলাম।

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল, আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই। অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দর্জি

এক

এত কাজ, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

কলের খচখচানিতে নিজেরই বিরক্তি ধরিতেছে; কিন্তু উপায় নাই, কাল সকালের মধ্যে আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতেই হইবে। এই খচখচানির অন্তরালে রজত-নিক্কণ উহ্য আছে—এইটুকুই যা সান্ত্বনা।

নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল। চেনা ছোকরা, এইখানকার কলেজেই পড়ে। আমারই কাছে কামিজ পাঞ্জাবি করাইয়া থাকে।

নির্মল বলিল, শিশিরদা, আমাদের কলেজ-ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ট্রাই-কলার ফ্লাগ চাই।

আমার ভাই আজ ফুরসত নেই, অন্য কোথাও যাও।

কারও ফুরসত নেই, সকলের কাছেই গেছ্‌লাম।

সবাই ফ্লাগ তৈরি করছে?

সকলে।

কথাটা মিথ্যা নয়। শহরের সমস্ত দর্জিই ব্যস্ত।

আমার কিন্তু ভাই অবসর নেই। চারটে দর্জি লাগিয়েছি, তবু কূল পাচ্ছি না।

আমার কিন্তু চাই-ই। বলেন তো বেশি চার্জ দেব।

ডবল দিতে হবে।

বেশ।

নির্মল তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি কাজ করিতে হইবে—উপায় নাই।

মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া পাস্‌ করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিতে যাইবে।

দুই

দুই বৎসর কাটিয়াছে।

আজ পুনরায় নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছি না। আজও অবিরাম কলের খচখচানিতে বিরক্তি ধরিতেছে এবং আজও নিরুপায়ভাবে তাহা সহ্য করিতেছি। আজও সেই একই ব্যাপার, কাল সকালের মধ্যে

আড়াই শত পতাকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আজও নির্মল আসিয়া প্রবেশ করিল।

সেই এক কথা।

শিশিরদা, আমাদের কলেজ-ইউনিয়নের জন্য পঞ্চাশটা ফ্লাগ চাই।

আমিও সেই একই উত্তর দিলাম।

আমার ভাই আর ফুরসত নেই, অন্য কোথাও যাও।

উত্তরে নির্মল দুই বৎসর আগে যাহা বলিয়াছিল, এবারও তাহাই বলিল, কারও ফুরসত নেই, সকলের কাছে গেছ্‌লাম। আমাদের ক'রে দিতেই হবে—বলেন তো বেশি চার্জ দেব।

পূর্ববৎ সুযোগ বুঝিয়া আমি ডবল মজুরি চাহিলাম।

নির্মল পূর্ববৎ রাজী হইল।

ঘটনাও পূর্ববৎ—মহাত্মা গান্ধী কাল এই স্টেশন দিয়া পাস্ করিবেন। শহরসুদ্ধ লোক পতাকা ঘাড়ে করিয়া স্টেশনে হাজির থাকিবে। সবই এক সামান্য একটু তফাত আছে। এবারে ত্রিবর্ণ পতাকা নয়, কৃষ্ণবর্ণ পতাকা।

বাঘা

এক

বাঘা তেঁতুল নয়, কুকুর। নিতান্তই দেশী কুকুর। নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার কর্ণ, রোম ও পুচ্ছে বৈদেশিক কোন প্রকার ভব্যতা বা বৈচিত্র্য নাই। সাধারণ দেশী কুকুর, তবে চেহারাটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট। পর্যাপ্ত-আহার-পুষ্ট বাঘাকে সহসা দেখিলে অপরিচিত কোন ব্যক্তির মনে ত্রাস সঞ্চার হয়তো হইতে পারে, কিন্তু বাঘার যে একবার পরিচয় পাইয়াছে, সে বাঘাকে দেখিয়া বিচলিত হইবে না। কারণ বাঘার মত অমন একটি ভীতু কুকুর সচরাচর দেখা যায় না। পট্‌কা ছুঁড়িলে বাঘা হুড়মুড় করিয়া তক্তাপোশের তলায় ঢুকিয়া পড়ে; মাথা চুলকাইলে ছুটিয়া পালায়, ভাবে, ঢিল ছুড়িল বুঝি! কারণে অকারণে তাহার লাঙ্গুলটি সর্বদাই প্রায় পিছনের পদদ্বয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহাই বাঘার পরিচয়। বেচারা বাঘা নিজের নাম সার্থক করিতে পারে নাই।

কিন্তু শিরোমণির মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকিলে অন্য পরিচয় পাওয়াও সম্ভব। শিরোমণি মহাশয়ের মারফত তারিণীচরণ সে পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তদনুসারে চলিতেছিলেন। তারিণীচরণই বাঘার মনিব। মনিব না বলিয়া ভৃত্য বলাই অবশ্য সঙ্গত। কারণ ভৃত্যের মতই তিনি বাঘার সেবাপরায়ণ ছিলেন। আমি ছুটিতে শ্বশুর-বাড়ী গিয়াছিলাম। শিরোমণি প্রমুখাৎ আমিও বাঘার সত্যপরিচয়টি জানিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

* * *

দুই

ঘটনাটি এই।

বাঘা যখন শিশু, তখন তাহার গোল-গাল নাদুস নুদুস চেহারাটি দেখিয়াই সম্ভবত তারিণীচরণ তাহাকে পুষিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। অধিকাংশ দেশী জিনিসের মত শৈশবে বাঘারও বেশ একটা জৌলুস ছিল। তারিণীচরণ মুগ্ধ হইলেন এবং বাঘাকে আনিয়া গৃহে স্থান দিলেন। কুকুরছানা পুষিলেই তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার বাসনা সকলেরই মনে বোধ হয় জাগরূক হয়। তারিণীচরণেরও হইয়াছিল। একটি পাতলা শিকল সহযোগে তারিণীচরণ বাঘাকে উঠানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাঘা তারস্বরে চীৎকার করিতেছিল। এমন সময় শিরোমণি আসিয়া দেখা দিলেন। যথাবিধি খানিকক্ষণ বসিলেন, তামাক খাইলেন এবং ক্রন্দমান কুকুরশাবকের প্রতি দুই-একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে চলিয়া গেলেন। সেদিন আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাহার পরদিন ভোরে আসিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে তারিণীচরণকে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হইল। প্রথমে আসিয়াই শিরোমণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কুকুরশাবকটিকে বেশ খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর তারিণীচরণকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা সরোজের মৃত্যু এক বছর হ'ল হয়েছে, না? তারিণীচরণের অগ্রজ সরোজকুমার এক বৎসর পূর্বেই ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য কথা।

সুতরাং তারিণী বলিলেন, হ্যাঁ তা হবে বৈকি। কেন বলুন তো?

সরোজের কুষ্ঠি আছে? সেখানা দিতে পার একবার আমাকে?

কেন বলুন তো?

কুষ্ঠিটা দেখি আগে, তারপর বলছি।

তারিণীচরণ ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং খানিকক্ষণ খুঁজিয়া মৃত সরোজের কোষ্ঠীখানা আবিষ্কার করিয়া শিরোমণি মহাশয়কে সেটি আনিয়া দিলেন। শিরোমণি সেটি প্রসারিত করিয়া গভীর অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উৎসুক তারিণীর চক্ষু দুইটি প্রশ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে শিরোমণি বলিলেন, কুকুর বাচ্চাটিকে খুলে দাও।

কেন বলুন তো?

ও সরোজ। কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয়েছে। ভাগ্য ভাল যে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে। যত্ন-আত্তি ক'রো ওকে। আর একটা স্বস্ত্যয়ন করানোও দরকার। পরজন্মটায় যাতে সদগতি হয়। নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

শিরোমণি উঠিয়া পড়িলেন।

বিহ্বল তারিণী তাড়াতাড়ি গিয়া বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। বাঘার বন্দিত্ব ঘুচিল। বাঘা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে অবিশ্বাসী লোকে সন্দেহ রিত যে, বাঘা বোধ হয় শিরোমণিকে ঘুষ দিয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ন্দহের অবকাশ নাই।

শিরোমণির আনুকুল্যে ও সহযোগিতায় যথাকালে স্বস্ত্যয়নও হইয়া গেল। সেই হইতেই বাঘা বন্ধনমুক্ত।

বস্তুত সেই হইতেই বাঘার সুখের দশা পড়িল। তারিণীচরণ কুক্কুর-যোনিপ্রাপ্ত অগ্রজের যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। সরোজ অকৃতদার ছিলেন। সুতরাং সরোজের বিধবার আদর-যত্ন লাভে বাঘাকে যদিও বঞ্চিত হইতে হইল, কিন্তু তারিণীচরণ ভ্রাতৃভক্তির যেরূপ নমুনা দেখাইতে লাগিলেন, তাহাই বাঘার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার উপর বিধবা থাকিলে বাঘার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণকর হইত কি না সন্দেহ।

সুতরাং বাঘা সুখে ছিলেন।

তারিণীচরণ এবং শিরোমণিও সুখে ছিলেন।

পরস্পর দেখা হইলে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন প্রায়ই হইত।

সরোজ ভাল আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কর্তব্য ক'রে যাও—ফলাফল ভগবানের হাতে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, যথাসাধ্য ক'রেই যাচ্ছি।

করিতেও ছিল।

তিন

এই ভাবেই চলিতেছিল এবং শেষ পর্যন্ত বোধ হয় চলিতও। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল। রিট্রেঞ্চমেণ্টের ধাক্কায় বেচারী তারিণীচরণের চাকুরিটি টিঁকিল না। যদিও অন্নবস্ত্রের জন্য তারিণীচরণকে কোনদিন চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হয় নাই, তবু বেচারার একটু কষ্ট হইল বইকি। যদিও তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই, জমিজমা কিছু আছে, তথাপি তখনকার বাজারে মাসিক চল্লিশ টাকা আয় নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত নহে। তারিণীচরণ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কালক্রমে তাঁহার এই বিমর্ষ ভাবটা হয়তো কাটিয়া যাইত, কিন্তু বাঘা কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে অন্নজল ত্যাগ করাতে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। তারিণীচরণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

শিরোমণি শুনিয়া বলিলেন, ও অন্নজল ত্যাগ করবে না? হাজার হোক দাদা তো! তা ছাড়া তুমি যে ওর প্রাণ ছিলে ভায়া! তোমার চাকরি গেছে শুনে ও অন্নজল ত্যাগ করবে না তো কে করবে?

শিরোমণির চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তারিণীচরণ আগে হইতে কাঁদিতেছিলেন।

শিরোমণি চক্ষু-মার্জনা করিয়া বলিলেন, যাই হোক, খাওয়াবার চেষ্টা কর তুমি। তুমি অনুরোধ করলে ঠিক খাবে।

শুনিলাম, বাঘা একটা অন্ধকার ঘরের কোণ আশ্রয় করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কি হইল, তাহা দেখিবার সুযোগ তখন আর ঘটিল না। আফিস খুলিতেই শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে হইল।

চার

কয়েকদিন পরে হঠাৎ এক জরুরী তার পাইলাম—অবিলম্বে চলিয়া এস। তার করিতেছেন আমার গৃহিণী অর্থাৎ শিরোমণির ভগিনী।

যাইতে হইল। গিয়া শুনিলাম, তারিণী শিরোমণিকে কামড়াইয়াছে।

সে কি! আরও শুনিলাম, বাঘা তারিণীকে কামড়াইয়া মারা গিয়াছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ডাক্তার ডাকিলাম।

ডাক্তারটি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন লোক।

সুতরাং বলিলেন, দুই জনেরই হাইড্রোফোবিয়া অর্থাৎ জলাতঙ্ক হইয়াছে। বাঁচিবার আশা নাই।

এখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে হরিসংকীর্তন হইতেছে।

দিবা দ্বিপ্রহরে

এক

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল।

দারুণ দ্বিপ্রহর। খর রৌদ্র চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। সাধারণত এ সময়ে লোকে ঘরের বাহির হয় না। আজ সকালে হা!ক্ল ঘোষের পুত্রকে ঘটিয়াছিল, তাই এত লোকের ভিড়। আজ সকালে হারু ঘোষের পুত্রকে দংশন করিয়া যে সাপটা নিকটস্থ ইঁটের গাদার ভিতর আত্মগোপন করিয়াছিল, সেটা মারা না পড়িলেও ধরা পড়িয়াছে। বিশু বাগ্দী সাবধানে ইঁট সরাইয়া সাপের লেজের দিকটা শুধু যে দেখিতে পাইয়াছে তাহা নয়, বল্লম দিয়া গাঁথিয়া সাপটাকে টানিয়া বাহির করিয়াছে। বল্লমবিদ্ধ প্রকাণ্ড বিষধর ভয়াবহ ফণা তুলিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছে। দেখিবা॰ : · দৃশ্য বটে। গ্রামের সমস্ত লোক সভয়-বিস্ময়ে দেখিতেছে। সিদ্ধমনস্কাম বিশু বাগ্দী সগর্বে জাহির করিতেছে যে এমন মোটা এমন লম্বা এমন ফণা ও গর্জন-বিশিষ্ট গোক্ষুরসর্প সে আর কখনও দেখে নাই। সত্যই সর্পটি ভয়ঙ্কর।

দুই

একটু দূরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া জনৈক ব্যক্তি খানিকটা ছাতু খাইতেছিল। ভিড়ে যোগদান করে নাই। লোকটির চেহারা অদ্ভুত। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, আরক্ত নয়ন। পরিধানে একটা ময়লা হাফ-প্যাণ্ট এবং একটা ময়লাগোছের ফতুয়া। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়িতে ছাতু লাগিয়া চেহারাটা আরও দৃষ্টিকটু হইয়াছে। নিতান্ত নিরুৎসাহভাবে আপন-মনে সে ভোজন করিতেছিল। এমন সময়ে ভিড়ের ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া জনতার দিকে সে কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর কি মনে করিয়া একটু হাসিল এবং অবশেষে উঠিয়া ভিড়ের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবখানা— ব্যাপারটা কি দেখাই যাক না! ভিড়ের নিকটে গিয়া একজন লোককে প্রশ্ন করিল, এখানে এত ভিড় কিসের?

গোখরো-সাপটা ধরা পড়েছে।

কোন্ গোখরো সাপ?

যে গোখরো-সাপটা আজ সকালে ন্যাপলাকে কামড়েছিল।

ন্যাপলা কে?

হারু ঘোষের মেজ ছেলে।

তাই নাকি? বেঁচে আছে এখনও?

বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তারবাবু এসে তিন-চারটে বাঁধন দিয়ে কেটে কুটে কি সব ওষুধপত্তর লাগিয়ে দিয়েছিল। অবস্থা কিন্তু খারাপ।

ডাক্তারিতে কিচ্ছু হবে না, কিৎসু হবে না।—বলিয়া আগন্তুক সহাস্যে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি উন্নত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল।

ভিড়ের লোকটি বলিল, না হইলেই বা উপায় কি?

বিস্ফারিতনয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া আগন্তুক বলিল, উপায় কি? আলবৎ উপায় আছে। মন্তর ঝাড়ব আর উঠে বসবে। চালাকি নাকি? কই দেখি সাপটা কোথায়? ডাক ন্যাপলাকে।

তিন

দেখিতে দেখিতে জনতা সাপ ছাড়িয়া আগন্তুককে লইয়া পড়িল। দ্রুতবেগে রটিয়া গেল, একজন মস্ত গুণী ওঝা আসিয়াছেন। হারু ঘোষকে খবর দিতে লোক ছুটিল, এবং খবর পাইবামাত্র তিনি সর্পাহত পুত্রটিকে লইয়া ব্যস্তভাবে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বিশাল জনতা রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিল, পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

তৎক্ষণাৎ পায়ের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হইল।

এইবার সাপটাকে ছেড়ে দাও।

বিশু বাগ্দী বলিল, ছেড়ে দিলে ফের যদি ছুটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে?

কামড়াবে? আচ্ছা, আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে? চালাকি নাকি?

নির্ভয়ে আগাইয়া গিয়া আগন্তুক সাপটাকে ধরিল। ধরিবামাত্র সাপটি সগর্জনে তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল। ইহাতে বিন্দুমাত্র

বিচলিত না হইয়া আগন্তুক বাম হাতে সাপটাকে ধরিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, খুলে নাও বল্লম ।।

একটু ইতস্তত করিয়া বিশু বাগ্দী অবশেষে বল্লমটা খুলিয়াই লইল। সাপটা আগন্তুকের বাম হাতে দংশন করিল এবং বহু পাকে সমস্ত হাতখানা বেষ্টন করিয়া ধরিল। আগন্তুকের সমস্ত মুখে অদ্ভুত হাসি। ছাতু-মাখা খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি ভেদ করিয়া বিকট একটা অট্টহাস্য চতুর্দিক কাঁপাইয়া তুলিল।

রাগ করছ কেন চাঁদ, দাও, চুমু দাও একটা আমাকে।

ক্রুদ্ধ বিশধর তাহার এ অনুরোধ রক্ষা করিল।

তৎক্ষণাৎ সাপটি গণ্ডদেশে একটা করাল চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল।

চার

সন্ধ্যার আর বেশি বিলম্ব নাই। উত্তেজিত জনতা কলরব করিতেছে। হারু ঘোষের মেজছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।

দারোগা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি আসিয়া একটু ঝুঁকিয়া আগন্তুকের মুখটা ভাল করিয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, একেই তো আমরা খুঁজছি।

শোকার্ত হারু ঘোষ বলিলেন, এ কে বলুন তো ?

এ একটা পাগল। পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে। একে ধরবার জন্যে চারিদিকে ফোটো পাঠিয়ে হুলিয়া বার করা হয়েছে।

বিশু বাগ্দী নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। তিক্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, পাগলা নয় কে ? সব্বাইকে ধ'রে পাগলা-গারদে পুরুন আপনি হুজুর। ছি ছি ছি ছি ! কি কাণ্ড !

*   *   *

অন্ধকার ঘনীভূত হইতে জনতা ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

হাসির গল্প

এক

খুব ছোট ছোট করিয়া মাথার চুল ছাঁটা, স্থানে স্থানে মাংস বাহির করা। উহার উপর মাথা ও কপাল বেষ্টন করিয়া কয়েক ফেরতা টোয়াইন-জাতীয় সূতা বেশ জোরে বাঁধা থাকাতে রগের শিরাগুলি স্ফীত এবং চক্ষু দুইটি লাল। এইখানেই বিসদৃশতার শেষ হয় নাই। রোমশ নাসারন্ধ্রে কফ ও নস্য মিলিয়া দৃষ্টিকটুতার সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তাহা কয়েক দিনের না-কামানো দাড়িগোঁফের সহযোগে যে চিত্রটি সৃজন করিয়াছে, তাহা মাধুর্যময় নহে।

বারান্দায় একটি শিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। ঘরের ভিতর আর একটি মেয়ে রোগশয্যায় শায়িত।

কৃত্তিবাস, ওরে কিতে—

রক্তচক্ষু তুলিয়া ভদ্রলোক ঘরের দিকে চাহিলেন।

কিতে—

কৃত্তিবাসের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

উচ্চতর কণ্ঠে পুনরায় ডাকিলেন, কিতে—

কেহ আসিল না।

সগর্জনে, ওরে শালা কিতে—

গর্জনে রোগশয্যায় শায়িত মেয়েটির নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেও কাঁদিতে লাগিল। ক্ষীণ স্বরে একটানা ধরনের কান্না। বারান্দার শিশুটি আগে হইতেই কাঁদিতেছিল। এ ক্ষীণ কণ্ঠে নয়, জোরেই। দুই প্রকার ক্রন্দনের প্রভাবে ভদ্রলোক আরও চটিয়া গেলেন। কণ্ঠস্বর অসম্ভব রকম চড়াইয়া ক্ষেপিয়া তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিতে, কিতে কিতে—ওরে শালা!

ফলোদয় হইল।

কিতে আসিল না বটে, আসিলেন হরিদ্রালাঞ্ছিতবসনা স্থূলাঙ্গিনী একটি মহিলা। তাহাতেই ফল ফলিল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ অত্যন্ত নরম হইয়া

গেলেন এবং অপ্রতিভভাবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। মহিলাটি কিন্তু কিছুমাত্র নরম এবং কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া রোষাকষায়িত লোচনে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিলেন। তাহার পর একটি হাত কোমরে দিয়া অপর হস্তটি আস্ফালন করতঃ সক্রোধে প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারখানা কি, পাড়া যে মাথায় তুলেছ!

আমতা-আমতা করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, গরম জলটা—

গরম জলটা! আমার কি দশখানা হাত!

তোমাকে তো বলি নি। কিতে কোথা গেল?

কিতে গেছে বাজারে।

সকালে তাকে একবার বাজারে পাঠিয়েছিলে না?

আবার পাঠিয়েছি।

ও।

ইহার বেশি আর কিছু বলিতে ভদ্রলোক ভরসা করিলেন না। এমন সময় স্বয়ং কৃত্তিবাস আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল এবং বলিল, পাঁচ-ফোড়ন এনেছি মা।

ভদ্রলোক আরক্ত নয়ন দুইটি কৃত্তিবাসের কুণ্ঠিত-নয়নে স্থাপিত করিতেই কৃত্তিবাস বলিল, জল এখুনি করে আনছি বাবু, হয়ে গেছে বোধ হয়, চড়িয়ে দিয়ে এসেছি।

কৃত্তিবাস চলিয়া গেল। মহিলাটি বাহির হইয়া গেলেন ও যাইবার সময় বারান্দার ক্রন্দন-নিরত শিশুটির পৃষ্ঠে দুমদুম করিয়া কয়েকটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিলেন, খালি বায়না, খালি বায়না, খালি বায়না! পোড়ারমুখী মেয়ে হাড়মাস জ্বালিয়ে খেলে আমার!

ক্রন্দন ঘোরতর হইয়া উঠিল। রুগ্ন মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, বড্ড মাথা ব্যথা করছে বাবা।

স্ত্রীর যে রণচণ্ডী মূর্তি এইমাত্র তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে এখন কিছু বলা সম্ভবপর হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। নিজেই উঠিয়া গিয়া টেম্পারেচারটা লইলেন। দেখিলেন জ্বর বাড়িয়া ১০৫ হইয়াছে। খানিকক্ষণ থার্মোমিটারটার পানে নিবদ্ধদৃষ্টি থাকিয়া হরিহরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া ধমকাইয়া উঠিলেন।

পাশ ফিরে শো, চেঁচাস নি।

পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েটি পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুয়ারে কড়কড় শব্দে কড়া নড়িয়া উঠিল। হরিহরবাবু কপাট খুলিয়া যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই দেখিলেন—মুদি বিল আনিয়াছে।

বলিলেন, পরশু দেব, আজ হাতে কিছু নেই।

কটূক্তি করিয়া লোকটা চলিয়া গেল।

জল এনেছি বাবু।

পিছন ফিরিয়া হরিহরবাবু দেখিলেন, কেৎলিহস্তে কুণ্ঠিত কৃত্তিবাস দাঁড়াইয়া আছে।

গামলা-টামলা আন্।

কেৎলি নামাইয়া কৃত্তিবাস চলিয়া গেল এবং একটা বড়-গোছের গামলা ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল লইয়া আসিল। হরিহরবাবু নিজেই ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া হাত দিয়া দেখিলেন, উত্তাপ মনোমত হইয়াছে কি না? দেখিলেন, হয় নাই। পুনরায় খানিকটা গরম জল ঢালিতে যাইতেছিলেন এমন সময় অসুস্থ মেয়েটি বমি করিতে শুরু করিল।

ওরে কিতে—দেখ তুই ওকে—

কৃত্তিবাস মেয়েটিকে সামলাইতে লাগিল। হরিহরবাবু ঠাণ্ডা জল গরম জল ঠিকমত মিশাইয়া লইলেন। তাহার পর বলিলেন, ওকে শুইয়ে দে। একবার তুই আমার ছোট টেবিলটা আর কাগজ কলম দিয়ে যা তো।

হরিহরবাবু একটি হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া গরম জলে পা দুইটি ডুবাইয়া ফুটবাথ লইতে লাগিলেন। কৃত্তিবাস কাগজ কলম দোয়াত ও টেবিল দিয়া গেল।

চেয়ারের ছারপোকাগুলি কামড়াইতে শুরু করিয়াছে, পাশের গলিটাতে দুইটি কুকুর ঝগড়া করিতেছে, বারান্দায় ক্রন্দনরোল সমানে চলিয়াছে, অসম্ভব মাথা ধরিয়াছে। হরিহরবাবু বাম হস্তে রগ দুইটা টিপিয়া ধরিয়া নিমীলিত নয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজই লিখিয়া দিতে হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাগাদা দিয়াছেন, নিজের তাগাদাও প্রবলতর। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিহরবাবু একটি হাসির গল্পের প্লট ভাবিতে লাগিলেন। হাসির গল্প লেখাতেই তাঁহার নাম।

জ্যোৎস্না

এক

সুন্দর জ্যোৎস্না।

পৃথিবীটাই অপার্থিব বলিয়া মনে হইতেছে। সমস্ত মনখানি স্বপ্নালোকে মেঘের মত সঞ্চরমান। লঘুভাবে সব কিছু স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে; কোথাও থামিতেছে না, কোথাও যাইবার তাড়া নাই। সময়ের স্রোত মন্থর-গতিশীল, আবিষ্ট ধীর মন্থরগতিতে সমস্ত সত্তাও ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে। রাত্রি গভীর। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে বাতায়নপথে চাহিয়া আছি। সহসা স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া সশব্দে কপাটটা খুলিয়া গেল। টলিতে টলিতে একটি লোক প্রবেশ করিল। বগলে বোতল। বলিল, এক্‌স্‌কিউজ মি—আমার নাম খৃষ্টচরণ ধর্মধার। ভাজি দেখাব। আমি হাতি ঘোরাতে পারি। ইউ সি, দিস্‌ ইজ, এলিফ্যাণ্ট, নাউ সি, বন্‌ বন্‌ বন্‌ বন্‌—দুই হাতে বোতলটা ধরিয়া মাথার উপর ঘুরাইতে লাগিল। দারোয়ান ডাকিতে হইল।

অর্ধচন্দ্রাকৃত হইয়া কৃষ্ণচরণ কর্মকার চলিয়া গেলেন। স্বপ্নটি কিন্তু ভাঙিয়া গেল। কিছুতেই আর জোড়া লাগাইতে পারিলাম না। জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্না ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারিলাম না। মন লঘুতা হারাইয়া গুরুগম্ভীর হইয়া পড়িল। অলক্ষ্যে বিধাতা বোধ হয় হাসিলেন।

দুই

তাহার পরদিন।

সেদিনও জ্যোৎস্না। আগের দিনের মতোই মনোরম জ্যোৎস্না। আজ দ্বিতলের ঘরে বসিয়াছিলাম এবং পূর্ববৎ বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিয়া স্বপ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম। দূর দিগন্ত-রেখায় দিশাহারা মন কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল। বাস্তব ও স্বপ্নের সীমা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইতেছিল।

বাবু!

নীচে কে যেন ডাকিল! খৃষ্টচরণ নয় তো!

আজ যদি আসে, ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে লোকটাকে।

বাবু সাহেব !

জড়িত কণ্ঠ।

জ্যোৎস্না চুলায় গেল এবং আপাদমস্তক জলিতে লাগিল।

দারোয়ান !

অপর একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দারোয়ান বাজারে গিয়াছে।

তাহাকে বলিলাম, দেখে আয় তো নীচে, কে ডাকছে !

সে চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরে আসিয়া হিন্দীতে যাহা বলিল, তাহা এই, একটা লোক বোতল বগলে দাঁড়িয়ে আছে।

টলছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধাক্কা মেরে ফেলে দে ব্যাটাকে।

যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, একটু পরে তাহাই ঘটিল। গুরুভার পতনের শব্দ ও একটা আর্তনাদ ! খৃষ্টচরণের শিক্ষা হইল ভাবিয়া শান্তিলাভ করিলাম। স্বপ্ন কিন্তু টুটিয়া গেল। আজও বিধাতা হাসিলেন !

তিন

তৃতীয় রাত্রি।

আজও জ্যোৎস্না আকাশ-প্লাবিনী। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে মাঝে মাঝে তাহা লক্ষ্য করিতেছি। হাজত-ঘরের জানালাটি অত্যন্ত ছোট, ভাল করিয়া দেখাও যাইতেছে না। পরেশবাবু সুদক্ষ আইনজীবী। ভাবিতেছিলাম, তিনি আমাকে খালাস করিতে পারিবেন কি ? দ্বিতীয় রাত্রে আমার ভোজপুরী ভৃত্য যাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, সে খৃষ্টচরণ নহে। একটি ম্যালেরিয়া-রোগী ! তাহার বগলে যে বোতল ছিল, তাহা এড্‌ওয়ার্ডস্‌ টনিকের। বিদেশী লোক। সম্ভবত রাত্রে আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। ভোজপুরী-ধাক্কায় ক্ষুন্নচিত্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ! এখন পরেশবাবুই একমাত্র ভরসা। শরীর মন কিছুই ভাল নাই। মনে হইতেছে, জ্বর হইয়াছে। বিধাতার মুখে মৃদু হাসি।

চার

খালাস পাইয়াছি।

অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইয়াছে যে এডওয়ার্ডস্ টনিকের বোতলে এডওয়ার্ডস্ টনিক ছিল না—মদই ছিল। পরেশবাবুও প্রমাণ করিয়াছেন যে, লোকটা মদ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মদ জিনিসটাকে চিরকাল ঘৃণা করি। লোকটার মৃত্যুতে একটুও দুঃখ হইতেছে না। শরীরটা কিন্তু বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত হাজতবাস্ করিয়া। হাকিম কড়া লোক, কিছুতেই জামিন দিলেন না।

যে ডাক্তারটির চিকিৎসাধীন আছি, তিনি আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

আজও আকাশে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম, দেখুন ডাক্তারবাবু, কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ।

বিস্মিত ডাক্তার বলিলেন, কই, তেমন জ্যোৎস্না তো এখনও ওঠে নি!

বলিলাম, এইতেই কিন্তু আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

ডাক্তার বলিলেন, ক' দাগ ওষুধ খেয়েছেন আপনি?

সবটা খেয়ে ফেলেছি।

সবটা? সবটা কেন খেলেন? একটু বেশী ডোজে ব্রাণ্ডি ছিল।

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম, চতুর্দিক জ্যোৎস্না থই থই করিতেছে।

বিধাতা অট্টহাস্য করিতেছেন।

পাঁচ

দশ বৎসর পরে।

সর্বস্বান্ত হইয়াছি—যকৃতের দোষ এবং পেটে জল হইয়াছে।

অনুভূতিও আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

এখনও দিবালোকেও জ্যোস্না দেখি॥

বিধাতা গম্ভীর।

শ্রীধরের উত্তরাধিকারী

এক

মক্ষিচুস !

স্থানীয় বেহারীগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত কথাটির অর্থ অনেকে হয়ত জানেন না। মক্ষিচুস আখ্যা সেই সকল মহাত্মাকেই দেওয়া হয় যাঁহারা মক্ষিকাকে চুষিয়াও গুড় অথবা মধু আহরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। শ্রীধর মিত্তিরের কৃপণতা ও শোষণ-পটুতা সম্বন্ধে স্থানীয় বাঙালী, বেহারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একমত। সজ্ঞানে প্রভাতে কেহ তাঁহার নামোচ্চারণ করেন না এবং দৈবাৎ করিয়া ফেলিলে উপবাস আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি কখনও কাহাকেও এক কপর্দকও দান করেন নাই; কিন্তু বহু কপর্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন। এখনও করিতেছেন। বর্তমানে সুদে টাকা খাটানোই তাঁহার প্রধান উপজীবিকা। কয়েকখানা ভাড়াটে বাড়িও প্রতি মাসে তাঁহাকে অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রজা বিলি করা কিছু জমি আছে। কিছু কোম্পানীর কাগজও আছে। আয়ের পথ এতগুলি আছে কিন্তু ব্যয়ের পথ নাই বলিলেও চলে। জন থাকিলেই ধনক্ষয় হয়। শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই। আত্মীয়স্বজন সকলেই একে একে পরলোকগমন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন। থাকিবার মধ্যে আছেন শ্রীধর নিজে এবং তাঁহার পুরাতন ভৃত্য নকুড়! নকুড় অবশ্য শুধু ভৃত্য নয়। সে একাধারে পাচক, ভৃত্য, বন্ধু, পরামর্শদাতা—সব। দিনে নকুড় ভাতে ভাত ফুটাইয়া দেয়। রাত্রে হরিগোয়ালা সুদ পরিশোধকল্পে যে দুধটুকু দিয়া যায় তাহাই উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। জল-খাবারের পাট নাই। পোশাক পরিচ্ছদের খরচও নাই বলিলেই চলে। আইন বাঁচাইবার জন্য যতটুকু আবরণ প্রয়োজন ততটুকুই শ্রীধর মিত্র অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। দিনে সূর্য এবং রাত্রে রেড়ির তেলের ক্ষুদ্র একটি মৃৎপ্রদীপ তাঁহার অন্ধকার মোচন করিয়া থাকে।

টাকা সুতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয়—মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি। শ্রীধর মিত্র যদিও ভুলক্রমে কখনও নিজের ঐশ্বর্যের কথা কাহারও নিকট

উল্লেখ করিতেন না, কিন্তু সকলেই জানিয়াছিল যে শ্রীধর মিত্র নামক কদাকার বৃদ্ধটি বেশ শাঁসালো ব্যক্তি। তাঁহার শাঁসটুকুর কিয়দংশও অন্তত হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে নানালোকে নানা ভেক ধারণ করিয়া সততই তাঁহার দুয়ারে ধর্ণা দিত। শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে অর্থাৎ সেই বাড়িটাতে—যাহার ভাড়াটে সহজে জুটিত না। কিন্তু শহর-প্রান্তের সেই পোড়ো বাড়িতেই অর্থ-অনুসন্ধিৎসু মতলব-বাজগণ গিয়া হাজির হইতেন।

দুই

সেদিন গিয়েছিলেন জলধরবাবু।

জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে স্বদেশহিতৈষীও। সম্প্রতি শহরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ-সংগ্রহ করিতেন। শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, "খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি?"

বিস্মিত জলধর বলিলেন, "তার মানে?"

"মানে, লেখাপড়া না শিখেই এই শহরের মেয়েগুলো যে রকম বাবু হয়ে উঠেছে, লেখাপড়া শিখলে এদেশের সব গণেশই তো উল্টে যাবে। কি বলিস নোকড়ো?"

নকুড় একটু মৃদু হাস্য করিল মাত্র।

শ্রীধর আবার বলিলেন, 'ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাত করেছে—মেয়েরা শিখলে একদম উল্টে যাবে। কেউ রক্ষে করতে পারবে না। ওসব দুর্বুদ্ধি ছাড়ুন আপনি জলধরবাবু।"

জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রীশিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই। প্রথমটা তিনি একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তিনি উকিল মানুষ। কোথায় কি ভাবে কোন্ কথা বলিলে কাজ হাসিল হয় তাহা তাঁহার জানা আছে।

সুতরাং তিনি বলিলেন, "মেয়েরা লেখাপড়া শিখে নিজেরা রোজগার করলে তবে না বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে

উপার্জন না করলে টাকার প্রতি দরদ হয় না। গণেশকে খাড়া রাখবার জন্যেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখান উচিত।"

দেখা গেল, অ-উকিল শ্রীধর মিত্রও কম নন।

নকুড়ের দিকে একনজর সহাস্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "ছাগকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া যদিও বা সম্ভবপর হয়, ছাগলের স্বভাব কি বদলে যাবে তাতে বলতে চান? সে কি যব গাছে আর মুখ দেবে না? না, যবের গাদায় ছেড়ে দিলে নয়-ছয় করবে না? বলনারে নোকৃড়ো ওপাড়ার ব্যাপারখানা!"

অদূরে উপবিষ্ট নকুড় এবারও কিছু না বলিয়া মৃদু হাস্য করিল।

শ্রীধর তখন নিজেই বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ঘোষাল পাড়ায় আমার যে বাড়িটা আছে তার এক নতুন ভাড়াটে এসেছে। স্বামী-স্ত্রী! দুজনেই বেশ লেখাপড়া জানে শুনেছি। কিন্তু তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখে আসুন কি কাণ্ড-কারখানা। স্বামীটি ক্রমাগত সিগারেট ফুঁকে যাচ্ছেন আর স্ত্রীটি ক্রমাগত সেলাই করে যাচ্ছেন। কলের খচখচি শুনে মনে হয় দরজির বাড়ি! ওই যে কি একরকম জামা মেয়েরা পরে তাই ক্রমাগত সেলাই হচ্ছে শুনলাম। জামাগুলোর কি নাম যে ভাল—মনেও থাকে না ছাই!"

নকুড় বলিল—'বালাউস্'।

"বালাউস্—বালাউস্! এত বালাউস্ নিয়ে যে কি হবে তাই ভাবি। পরবে কখন?"

জলধরবাবু বুঝিলেন তর্ক-পথে চলিবে না।

বলিলেন, "সবাই কি আর একরকম হয়। তাছাড়া আপনার মত প্রবীণ বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে তর্ক করতে পারি কি আমি? মোট কথা সৎকার্য আরম্ভ করেছি একটা কিছু সাহায্য আপনাকে করতে হবে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত বদনে শ্রীধর কিছুক্ষণ জলধরবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাক্যস্ফূর্তি হইলে বলিলেন—'সাহায্য!'

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ পাঁচজনের কাজ, কিছু দিতে হবে আপনাকে।"

সকাতরে শ্রীধর বলিলেন—"আমি দরিদ্র মানুষ। এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে, সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু! বিশ্বাস করুন অতি দরিদ্র আমি।"

জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন, "তিন কুড়িয়েই তো ভাল। সবাই কিছু কিছু সাহায্য না করলে হবে কি করে! বুঝছেন না!"

"বুঝছি তো! কিন্তু আমার যে তিনের সামর্থ্যও নেই!"

"ও আমি শুনব না—কিছু দিতেই হবে আপনাকে।"

জলধরবাবুর ব্যবহারে একটা নাছোড়বান্দা ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর শঙ্কিত হইলেন। উকিল মানুষকে চটাইতেও সাহস হয় না। সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কালহরণম্! বলিলেন—"এখন তো কিছুতেই পেরে উঠব না। আসচে মাসে চেষ্টা করে দেখতে হবে। আধপেটা খেয়ে থাকব আর কি! কি বলিস্‌রে নোকৃড়ো!'

নকুড় পুনরায় মৃদু হাস্য করিল।

জলধর অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন।

তিন

জলধরবাবুর কথাটা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম। সকলের কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কেহই শ্রীধর মিত্রের ধনভার লাঘব করিতে পারেন নাই—সকলকেই ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইয়াছিল। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যাসাহায্যকারীর দল, স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়িনী-সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতৃগণ, কন্যাদায়গ্রস্থ দুঃস্থ ব্রাহ্মণ—সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্যসহকারে শুনিয়া যাইতেন। ধৈর্য হারাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই। সকলকেই কিন্তু অবশেষে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইয়াছিল।

চার

টাকা সুতরাং জমিতেছিল।

তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে শেষকালে শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

শ্রীধর চিন্তা করিতে লাগিলেন—জীবন তো শেষ হইয়া আসিয়াছে।

মৃত্যু যে-কোন মুহূর্তে আসিয়া হানা দিতে পারে। এতগুলো টাকার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হইবে! মাটির তলায় এই বিপুল ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? সেদিন লটারির খেলাতেও তিনি বেশ কিছু টাকা পাইয়াছেন। লটারি খেলার দিকে শ্রীধরের ঝোঁক আছে। মাঝে মাঝে লটারির জন্যই তিনি দুই চারি টাকা বাজে খরচ করেন। গত বৎসর লটারির দৌলতে বেশ কিছু অর্থাগম হইয়াছে। কিন্তু এত অর্থের পরিণতি কি হইবে? নকুড়টা শেষকালে সব ভোগ করিবে? আযৌবনসহচর নকুড়কে অবশ্য তিনি কিছু দিয়া যাইবেন কিন্তু সমস্ত টাকাটাই সে ভোগ করিতেছে এ চিত্র মোটেই মনোজ্ঞ নয়। নকুড়টা বা কতদিন বাঁচিবে? শেষকালে সমস্ত টাকাটা নকুড়ের উত্তরাধিকারী সেই ঘাড়ছাঁটা ভাইপোটার হস্তে গিয়া পড়িবে না কি! এ কথা চিন্তা করিলেই শ্রীধরের সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠে। বালিকা বিদ্যালয়ে টাকাগুলা দিয়া যাইবেন? না প্রাণ থাকিতে তাহা তিনি পারিবেন না। আজকালকার বিলাস-প্রবণ হাই-হিল জুতাপরা মেয়েগুলাকে দেখিলেই তাঁহার অস্থিপঞ্জর জ্বলিতে থাকে। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে টাকাটা দিলে কেমন হয়? দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বর্তমান ডাক্তার খোঁচা-গোঁফা পরেশ চক্রবর্তীর মুখটা স্মৃতিপটে উদিত হইলেই এ ইচ্ছা আর দ্বিতীয়বার হয় না। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীদের? ও ভণ্ড ব্যাটাদের টাকা দিয়া লাভ? বন্যা-প্রপীড়িতদের? স্বয়ং ভগবান যাহাদের শাস্তি বিধান করিয়াছেন তাহাদের বাঁচাইবে শ্রীধর মিত্তির? ও চিন্তা করাই অনুচিত। টাকাগুলো শুধু জলে পড়িবে। স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতির ছোঁড়াগুলো কিছু টাকার জন্য ধরিয়াছিল। তাহাদের কিছু দিলে কেমন হয়? ঘোড়ার ডিম হয়! যে স্বাস্থ্য তাহাদের আছে তাহাদের আহারই যোগান কঠিন ব্যাপার। এমনই তো প্রত্যেকটা ষণ্ডামার্কা। ইহার অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যবান হইলে খোরাক যোগাইবে কে? সকলেরই গণেশ উল্টাইয়া যাইবে শেষকালে।

শ্রীধরের কিছুই মনঃপূত হয় না।

রোজই চিন্তা করেন। কিন্তু কি করিলে যে অর্থটার প্রকৃত সদগতি হয় কিছুতেই ঠিক করিতে পারেন না।

পাঁচ

অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। কী ভীষণ রাত্রি সেদিন! মুহুর্মুহু বজ্রাঘাত, মুষলধারে বৃষ্টি, প্রবল ঝড়। সমস্ত প্রকৃতি যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। বেচারী নকুড় সেই দারুণ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দাহ করিবার জন্য লোক ডাকিতে হইবে। জলধরবাবুর নিকটে গেল। শ্রীধরের উপর জলধরবাবু প্রসন্ন ছিলেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন যে, তাঁহার শরীর খারাপ—এই দুর্যোগের রাত্রে তিনি মড়া বহিতে পারিবেন না। নকুড় তখন পরিচিত অন্যান্য ভদ্রলোকদের নিকটে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল এবং সকাতরে তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু মক্ষিচুসের শব বহন করিয়া এই দারুণ রাত্রে তিন ক্রোশ দূরবর্তী শ্মশানে যাইতে কেহই রাজী হইলেন না। একটা না একটা অজুহাত দেখাইয়া সকলেই ঘরে খিল দিলেন। বিপন্ন নকুড় ব্যাকুলভাবে প্রতি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল।

ছয়

অনেকক্ষণ পড়ে নকুড় ফিরিল।

একটিমাত্র লোককে সে যোগাড় করিতে পারিয়াছিল। লোকটি অপর কেহ নয়—ঘোষাল পাড়ার সিগারেটখোর সেই ভদ্রলোকটি। শ্রীধরের মৃত্যুসংবাদে একমাত্র তিনিই বিচলিত হইয়াছিলেন এবং এই নিদারুণ দুর্যোগসত্ত্বেও শব বহন করিতে আপত্তি করেন নাই। ব্লাউজ-বিলাসিনী তাঁহার পত্নীটিও এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলেন; নকুড় বাহিরে দাঁড়াইয়া স্বকর্ণে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

ঘরের তালা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই মৃত শ্রীধর মিত্র উঠিয়া বসিলেন ও সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "কে কে এলো।"

সিগারেটখোর ভদ্রলোক স্তম্ভিত!

নকুড় সবিস্তারে সমস্ত বর্ণনা করিল। লটারি-খেলোয়াড় শ্রীধর সমস্ত শুনিলেন এবং তাহার পর অকস্মাৎ উঠিয়া সিগারেটখোর ভদ্রলোককে প্রগাঢ় আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চুম্বন করিলেন। শ্রীধরকে এমনভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে নকুড়ও কখনও দেখে নাই। চুম্বনান্তে শ্রীধর বলিলেন—

"তোমাকেই আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলাম। নকুড়কেও অবশ্য কিছু দিতে হবে!"

কিছুক্ষণ থামিয়া পুনরায় বলিলেন—"দেখ, নগদ চার লাখ টাকা আছে আমার। তার থেকে ইচ্ছে কর তো স্ত্রীশিক্ষা বাবদ কিছু খরচ করতে পার তুমি। আপত্তি করবার উপায় নেই আর আমার!"

* * *

তাহার পরদিনই যথাবিধি উইল করিয়া শ্রীধর কথাকে কার্যে পরিণত করিলেন। আমরণ এ উইল তিনি পরিবর্তন করেন নাই।

ছেলে মেয়ে

এক

মেয়েদের হাসপাতাল।

আন্নাকালী ও নমিতা একই ঘরে আছেন, পাশাপাশি খাটে। আন্নাকালীর বয়স চল্লিশ, নমিতা সপ্তদশী। দুইজন আসন্ন-প্রসবা, এখন-তখন হইয়া আছেন।

আন্নাকালীর গালের হাড় উঁচু, কপাল শিরা-বহুল, চক্ষু পীতাভ, হাসি দন্তসর্বস্ব, পেট প্রকাণ্ড, হাত পা সরু সরু, মাথার সম্মুখ দিকটা টাক। সাতটি সন্তানের জননী, গর্ভে অষ্টম সন্তান। আগের বার প্রসব করিবার সময় যমে-মানুষে টানাটানি হইয়াছিল তাই এবার ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আন্নাকালী হাসপাতালে আসিয়াছিল। স্বামী কেরানী।

নমিতা সুন্দরী। এইবার প্রথম সন্তান হইবে। সহসা দেখিলে গর্ভবতী বলিয়া মনেই হয় না। সমস্ত অবয়ব পরিপুষ্ট, আসন্ন মাতৃত্বের পূর্বাভাসে সে যেন আরও শ্রীমতী হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী ডাক্তার। বিজ্ঞান-সম্মত প্রসব-পদ্ধতি হাসপাতালে ঠিকমত অনুসৃত হইবে বলিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিয়াছেন।

দুই

বয়সের, রূপের এবং অবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। প্রথম প্রথম অবশ্য রাখিয়া-ঢাকিয়া শোভন, সংযত, কেতা-দুরস্ত

ভাবে আলাপ শুরু হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের উজ্জ্বল দিকটা সুকৌশলে উজ্জ্বলতর করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইতেন। ক্রমশঃ নিজের নিজের স্বামীর প্রসঙ্গ লইয়াও আলোচনা শুরু হইল এবং রাখা-ঢাকা ভাবটা ক্রমশঃ যেন তিরোহিত হইতে লাগিল। আলাপটা যখন ভাল করিয়া জমিল তখন দেখা গেল উভয়েই পুরুষ-বিদ্বেষী। পুরুষ জাতির নানাবিধ দোষ-কীর্তন করিতে উভয়েই পঞ্চমুখ। এমন কি উচ্ছ্বাসের মুখে উদাহরণ স্বরূপ নিজের নিজের স্বামীর দোষও উভয়ে আজকাল অকাতরে উদ্ধৃত করিতেছেন। দীর্ঘ দ্বিপ্রহর অবলীলাক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। আন্নাকালীর প্রাত্যহিক কোমর-কন-কনানিটাও যেন কিছু কম পড়িয়াছে।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হইতেছিল।

আন্নাকালী। ব্যাটাছেলেদের কথা আর বোলো না ভাই, অমন স্বার্থপর জাত দুনিয়ায় আর আছে না কি!

নমিতা। (মৃদু হাসিয়া) নিজেদের পান থেকে চুন খসলেই তুলকালাম!

আন্নাকালী। সে কথা আর বলতে! আমাদের বাড়ির কর্তাটি আপিস থেকে এসেই ছুটবেন পাশার আড্ডায়, ফিরবেন কোনদিন এগারোটায়, কোনদিন বারটায়। কিন্তু এসে ভাত যদি না গরম পান বাড়ি মাথায় তুলবেন। আচ্ছা, অত রাত্তির পর্যন্ত ভাত গরম রাখা কি সহজ কথা ভাই, আঁচ আর কতক্ষণ থাকে বল। এদিকে আবার কয়লা যদি কোনমাসে বেশি খরচ হয়েছে তো সেও আবার ফাটাফাটি ব্যাপার।

নমিতা। আমাদের উনিও তাই।

আন্নাকালী। পাশা খেলার বাই আছে না কি?

নমিতা। না উনি খেলেন বিলিয়ার্ডস্। বিলিয়ার্ডস্ খেলে আড্ডা দিয়ে সিনেমা দেখে রোজ বাড়ি ফিরবেন রাত দুপুরে। কিন্তু এক ডাকে কপাট না খুলে দিলেই রাগ! আমরা যেন চাকরাণী, রাতদুপুর অবধি কপাট খুলে দেবার জন্য দুয়োর গোড়ায় বসে থাকব। একদিন রাত্তিরে এসে দেখেন আমি নেই, পাড়ার একজনদের বাড়ি কীর্ত হচ্ছিল আমি শুনতে গেছ্লাম। বাবুর সে কি রাগ!

আন্নাকালী। ওই রাগটকুই ভগবান দিয়েছেন শরীরে, আর কোন গুণ নেই। আমাদের পাশের বাড়ির বৈকুণ্ঠবাবু কি কাণ্ডই যে করেন রোজ মদ খেয়ে এসে। প্রহার তো বউ-দুটোর অঙ্গের ভূষণ হয়েছে!

নমিতা (সাগ্রহে) কি রকম।

আন্নাকালী। রোজ ঠ্যাঙায় ধরে। মুষ্‌কো চেহারা—ইয়া গোঁফ, লাল চোখ, কালো রঙ্‌—যেন একটা দৈত্যি! অগাধ পয়সা আছে শুনেছি, রোজ সন্ধ্যেবেলা মদ খাবে, মদ খেয়ে বউ-দুটোকে ডেকে এনে ঘরে পুরে কপাটে খিল দেবে। খিলও আবার এত উঁচুতে যে বউরা কেউ নাগাল পায় না। সেই খিলটি এঁটে বন্ধ করে শুরু করবে মার। মারতে মারতে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে যাবে ততক্ষণ ছাড়বে না।

নমিতা। বউ দুটো ?

আন্নাকালী। দুটোই তো! সেদিন আবার একটা বিয়ে করেছে লুকিয়ে! ওদের কি লজ্জা আছে? চিরকালই ওই রকম, আগেকার দিনে দু'শো পাঁচ শো বিয়ে করতো, এখন আর খ্যামতায় কুলোয় না বলে করে না।

নমিতা। (মুচকি হাসিয়া) মনে মনে কিন্তু লোভ আছে প্রচুর। আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একজন ভদ্রলোক থাকেন, প্রবীণ লোক, কিন্তু তাঁর জ্বালায় ওদিকের জানলা খোলবার জো নেই।

আন্নাকালী। (নাসা কুঞ্চিত করিয়া) ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার! দেখে দেখে আর শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে জাতটার উপর!

নমিতা। নেশা তো একটা না একটা করা চাই!

আন্নাকালী। ওঁর সে বালাই ছিল না এতদিন, কিন্তু বুড়ো বয়সে আবার আপিঙ্‌ ধরেছেন মরতে!

নমিতা। উনি দিনরাত সিগারেট চালাচ্ছেন!

আন্নাকালী। স্বার্থপর, ভয়ঙ্কর স্বার্থপর সব।

নমিতা। খবরের কাগজে তো পুরুষদের কীর্তি রোজ একটা না একটা আছেই! হয় গুণ্ডায় মেয়ে ধরে নিয়ে গেছে, না হয় কোন মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে, না হয় স্বামী বউকে খুন করেছে। রোজ একটা না একটা কিছু থাকবেই।

আন্নাকালী। খবরের কাগজের কথা বলতে পারি না, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখছি রোজ। অমন নেমকহারাম জাত আর আছে না কি! এই ধর না যে ছেলেকে পেটে ধ'রে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা, সেই ছেলেই বিয়ে ক'রে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায় না। সেই

বউও আবার কিছু দিন পরে পানসে হয়ে যায়, তখন আবার অন্যদিকে নজর—স্বার্থপর পাজি সব!

নমিতা। তাছাড়া, নিজেরা রোজগার করেন বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না, কথায় দশবার কয়ে শোনানো হয় সে কথা আমাদের, কিন্তু আমরা এদিকে একাধারে রাঁধুনি, চাকরাণী, সেবাদাসী, আমাদের দামও নেই, কদরও নেই। একটি পয়সা চাইতে হলে ওঁদের কাছে হাত পাততে হয়, দেন তো সাড়ে বাইশ কিন্তু লম্বা লম্বা লেকচার কত। বাজে খরচ করতে নেই, বিলাসিতা করা মহাপাপ, নিজেরা যেন সব সাত্ত্বিক-ব্রহ্মচারী।

আন্নাকালী। নিজেরা? নিজেরা এক একটি কাছিম। জলেও থাকেন, স্থলেও থাকেন যখন যেখানে সুবিধে, একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলে মুখটি গুটিয়ে নেন, সর্বাঙ্গে কঠিন আচ্ছাদন, মারো বকো ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের সুবিধে মতন আস্তে আস্তে মুখটি বার করেন, আর যদি একবার কামড়ে ধরেন তো রক্ষা নেই। জেদি, ভীতু, একগুঁয়ে—অবিকল কাছিম সব।

নমিতা। (হাসিয়া) আমি ভেবেছিলাম—বললেন বুঝি ঘুঘু, উপমাটা বেশ বের করেছেন তো!

তিন

সেই দিনই গভীর রাত্রে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। পুরুষদের অপেক্ষা করিবার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে আন্নাকালীর স্বামী ভজহরি বিশ্বাস আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া বসিয়া আছেন। বাহিরে অবিশ্রান্ত বর্ষণ, সম্মুখে উপবিষ্ট সুদর্শন যুবক, প্রাচীরে বিলম্বিত টকটকায়মান ঘড়ি, কোন কিছুরই সম্বন্ধে তিনি সচেতন নহেন। তন্ময় বিভোর ভাবে অর্ধনিমীলিত নয়নে তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মাত্র কর্তব্যের অনুরোধে আসিয়াছেন।

সুদর্শন যুবকটি ডাক্তার বি. কে. দত্ত। নমিতার স্বামী। দীর্ঘ সরু একটি পাইপে ধীরে ধীরে টান দিতেছেন এবং অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে 'ট্রু লাভ স্টোরি' নামক ইংরেজী পত্রিকা হইতে সচিত্র একটি প্রণয়-কাহিনী পাঠ করিতেছেন। তাহারও বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত।

পাশাপাশি দুইখানি ঘরে দুইটি টেবিলের উপর আন্নাকালী ও নমিতা শায়িতা। উভয়েই প্রসব-বেদনাতুরা। উভয়ের নিকটেই ধাত্রীবিদ্যা-পারদর্শী ডাক্তার ও নার্স দণ্ডায়মান।

আন্নাকালী বলিতেছিলেন—"ওগো ডাক্তারবাবু, আমায় বাঁচান গো ডাক্তারবাবু, আপনার ছুটি পায়ে পড়ি—"

নার্স বলিল, "আর একটু পরেই সব যন্ত্রণার অবসান হবে মা, ছেলের মুখ দেখলেই সব ভুলে যাবে!"

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিলেন।

"আর পারছি না, উঃ আর পারছি না আমি, ওঁকে ডেকে দিন, উঃ গেলুম, ডাক্তারবাবু উঃ উঃ উঃ ওঁকে ডেকে দিন, শিগগির ওঁকে ডাকুন।"

নমিতার নার্স বলিলেন, "ভয় কি, এমনি হয়ে যাবে, ছি, অমন করে না।"

ডাক্তারবাবু সাবান দিয়া হাত ধুইতে লাগিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে ভজহরি বিশ্বাস ও ডাক্তার দত্ত খবর পাইলেন প্রসব নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে। দত্তের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি লম্বা পাইপে আর একটি সিগারেট গুঁজিয়া ধরাইয়া ফেলিলেন। ভজহরি স্বপ্নাচ্ছন্ননয়নে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল।

উভয়েই রাস্তায় নামিয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে।

নার্স আসিয়া আন্নাকালীকে বলিল, "এই দেখ মা, কেমন সুন্দর মেয়ে হয়েছে তোমার।"

আন্নাকালীর পাণ্ডুর মুখ আরও যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

সদ্যোজাত শিশুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সহসা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "মেয়ে! আমার মেয়ে হয়েছে!"

"মেয়েই তো, কেমন সুন্দর গোলগাল, ফুটফুটে, একমাথা চুল!"

"নমিতার কি হয়েছে?"

"ছেলে।"

নার্স মেয়েটিকে আন্নাকালীর বিছানার পাশে শোওয়াতেই যাইতেছিল, হঠাৎ আন্নাকালী উঠিয়া দুই হাত দিয়া শিশুকন্যাটিকে ঠেলিয়া দিলেন।

"ও আমার মেয়ে নয়, নিয়ে যাও, বদলাবদলি করে দিয়েছ তোমরা।"

বিস্মিত নার্স বলিল, "সে কি কথা, বদলাবদলি করব কেন?"

"নিশ্চয় বদলাবদলি করেছ, আমার মেয়ে হতে পারে না—জ্যোতিষী বলেছে, এবার আমার ছেলে হবে—"

আন্নাকালীর কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

"এ তোমারই মেয়ে—"

"না, না, আমার মেয়ে নয়, আমার সাত সাতটা মেয়ে, আর মেয়ে আমি চাই না, আমার মেয়ে হয় নি, আমার ছেলে হয়েছে, নমিতা ডাক্তারের বউ বলে আমার ছেলেটি তাকে দিয়েছ তোমরা।"

"ছি, ছি, তা কি কখনও হতে পারে! এ তোমারই মেয়ে, নাও কোলে করো।"

"না মেয়ে আমি চাই না—চাই না—চাই না,—আমার ছেলে এনে দাও, আমার ছেলে এনে দাও--নিশ্চয় আমার ছেলে হয়েছে।"

হাসপাতালের নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া আন্নাকালী চীৎকার করিতে লাগিলেন।

আর্ত অসহায় চীৎকার?

পাশের খাটে নমিতা সভয়ে তাহার শিশুপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

আইন

এক

কাপড় চোপড় বদলাইয়া ঠিক পরের স্টেশনে জীবন নামিয়া পড়িল। চিন্তা করিয়া দেখিল একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়। খোঁজ-খবর করিয়া নিকটবর্তী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সহিত সে সুযোগমত গোপনে সাক্ষাৎ করিল। ডাক্তারবাবু অনেকদিন হইতে চাকুরি করিতেছেন, এ জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন তাঁহাকে বহুবার হইতে হইয়াছে। চুলে পাক ধরিয়াছে। সুতরাং এক কথায় রাজী হইলেন না। জীবনও তাহা আশা করে নাই। একাধিক কথা বলিতেও সে প্রস্তুত।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আজ থেকে চান দিতে পারি। কিন্তু ব্যাকডেটের সার্টিফিকেট দেওয়া শক্ত। আপনাকে আমি চিনি না, শুনি না—এর আগে কোথায় ছিলেন, কি করেছিলেন কিছুই জানা নেই, দিয়ে দিলেই হল সার্টিফিকেট!

জীবন কিন্তু না-ছোড়। ব্যাক-ডেটেরই মিথ্যা একখানা সার্টিফিকেট চাই। তাহাতে লেখা থাকিবে যে, গত পরশু হইতে জীবনচন্দ্র কুণ্ডু ডাক্তার টি. সি. পালের চিকিৎসাধীনে আছেন।

ইহার জন্য যত 'ফী' লাগে সে দিবে।

বড় রিসকি ব্যাপার মশাই।

বড় বিপদে পড়েছি, দিতেই হবে দয়া করে—

দশ, বিশ, পঞ্চাশ, একশত, দুইশত, পাঁচশত, শেষে হাজার টাকা পর্যন্ত জীবন উঠিল। পূর্ব-পুরুষের কৃপায় টাকার তাহার অভাব নাই।

ডাক্তারবাবু গলা খাঁকারি দিয়া গুম্ফাগ্রটিকে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সহযোগে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বুঝিল পাল মহাশয় কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইয়াছেন।

আপনার কোন অসুখ-বিসুখ আছে?

বছর দুই আগে একবার অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস হয়েছিল।

অপারেশন করেছিলেন?

না।

বেশ তা'হলে আসুন, আপনার অ্যাপেনডিক্‌সটাই কেটে বার করে দি।

তাতে লাভ?

লাভ আছে বই কি? অ্যাপেনডিসাইটিসটা তো সেরে যাবে!

তার দরকার নেই, সার্টিফিকেটের দরকার আগে।

বুঝছেন না, সব দিকে বাঁচিয়ে তো কাজ করতে হবে। হাসপাতালে ভরতি হলে খাতায় একটা রেকর্ড থাকবে—খাতাটা অবশ্য বদলাতে হবে—আপনার পেটের উপর একটা দাগও থাকবে।

জীবন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না।

ডাক্তারবাবু বুঝাইয়া দিলেন।

হাসপাতালের অ্যাডমিশন রেজিস্টারখানা বদলে আপনাকে পরশুর তারিখেই ভরতি করে নিতে চাই। অর্থাৎ আমার অ্যাসিস্‌টেণ্ট ডাক্তারকে

আর কম্পাউণ্ডারটিকেও কিছু খাওয়াতে হবে। আমার একার দ্বারা হবে না। এ সব বড় রিস্‌কি ব্যাপার, বুঝছেন না? আইন যে বড় কড়া!

পুনরায় গুম্ফাগ্রকে সূক্ষ্মতর করিতে লাগিলেন।

জীবন বলিল, সবশুদ্ধ কত লাগবে তাহলে বলুন।

হাজার দুই।

জীবন চিন্তা করিয়া দেখিল, প্রাণের অপেক্ষা দুই হাজার টাকা বেশি নয়। অপারেশনটাও হইয়া যাইবে। তা ছাড়া ডাক্তারবাবু যেভাবে কাজটা করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কাজটা পাকা হইবে।

জীবন রাজি হইয়া গেল।

দুই

ডাক্তারবাবু সার্জনও ভাল। নিখুঁতভাবে অপারেশনটি করিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, জীবন যে-কয়দিন হাসপাতালে রহিল, তিনি এমন মনোযোগ সহকারে তাহার তত্ত্বাবধান করিলেন যে জীবন মুগ্ধ হইয়া গেল। এমন প্রাণ দিয়া লোকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়েরও বোধ হয় শুশ্রূষা করে না। সহকারী ডাক্তার এবং বুড়া কম্পাউণ্ডারটিও অতিশয় সজ্জন। জীবনের সামান্যতম অসুবিধা দূর করিবার জন্য যেন সতত উন্মুখ হইয়া আছে। বড়লোকের ছেলে জীবন জীবনে এমন কত দুই হাজার টাকা উড়াইয়াছে কিন্তু এমন ভদ্রতা কখনো দেখে নাই।

ডাক্তারবাবু জীবনকে যেদিন হাসপাতাল হইতে ডিসচার্জ করিলেন, সেদিন সকালে সে ডাক্তারবাবুর বাসায় গেল। ডাক্তারবাবু তাহাকে খাতির করিয়া বসাইলেন এবং জোর-কলমে বেশ জোরালো একটা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

হাসিয়া বলিলেন, এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে, আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।

জীবন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

এইবার কিন্তু আসল কথাটি বলতে হবে। এত টাকা খরচ করে যে মিথ্যা সার্টিফিকেট নিলেন—কেন, কি করেছিলেন আপনি?

প্রশ্নটার জন্য জীবন প্রস্তুত ছিল না।

বলুন না, এখন আর বলতে বাধা কি?

একটু ইতস্তত করিয়া জীবন বলিল, বিশ্বাস করতে পারি তো আপনাকে ?

নিশ্চয়ই।

খুন করেছিলাম।

বলেন কি, কাকে ?

নামটা জীবনের জানা ছিল, কিন্তু বলিল না। ক্ষণিকের জন্য রক্তাক্ত লোকটার মুখখানা মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। বাঁ হাতে উলকি দিয়া লেখা ছিল, 'রমেশ'। জীবন নামটা বলিল না।

হঠাৎ খুন করতে গেলেন কেন ?

জীবন হাসিয়া উত্তর দিল, মেয়েমানুষ! লোকটা আমার 'রাইভাল' ছিল

কোথায় খুন করলেন ?

ট্রেনে—

পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল এবং লম্বা খামে একখানে চিঠি দিয়া গেল। জীবন উঠিয়া পড়িল।

আমি এবার উঠি তাহলে, মেনি থ্যাঙ্কস্!

সার্টিফিকেটখানা পকেটে পুরিয়া জীবন চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ খবর দিতেছে যে, প্রায় একমাস পূর্বে তাহারা একটি মৃতদেহ একটি ট্রেনের কামরায় পায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা যাইতেছে যে, লোকটির মৃত্যুর কারণ ছুরিকাঘাত। আত্মহত্যা নয়, কেহ খুন করিয়া গিয়াছে। তাহার বাঁ-হাতে উল্‌কি দিয়া নাম লেখা ছিল— 'রমেশ'। ইহা ছাড়া সনাক্ত করিবার মতো আর কোন চিহ্ন তাহারা পায় নাই। এখন অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ জানিতে পারিয়াছে যে, উক্ত রমেশ কলিকাতায় মেসে থাকিয়া দালালি করিত এবং সে নাকি ডক্টর টি. সি. পালের জ্যেষ্ঠপুত্র। এই সংবাদটি সত্য কি-না তাহা যেন ডক্টর পাল পুলিশকে অবিলম্বে জানান এবং যদি সত্য হয়, তাহা হইলে রমেশ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য পুলিশের গোচর করিয়া যেন আইনত প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবার সহায়তা করেন।

বিপুণিকা

এক

লীলাময়ী তন্বী রূপসী।

খঞ্জন নয়নের চটুল চাহনী, পীবর বক্ষের সংযত অসংযম লাস্য-চপল ললিত গমন-ভঙ্গিমা, মিষ্ট কণ্ঠের রজত-নিক্কণনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্ম-কোপ কমনীয় ভ্রূভঙ্গী পাষাণকেও উতলা করিয়া তোলে।

কঠিন-হৃদয় সেনাপতি বিচলিত হইলেন। হাসপাতালের এই নার্সটি নিকটে আসিলেই তাঁহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া যায়! যুদ্ধে সামান্যরূপে আহত হইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষত সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু নূতন রকম আঘাতে তিনি জর্জরিত। সঞ্চরমান এই শিখাটি তাঁহার অন্তরলোকে যে বহ্নিকাণ্ড শুরু করিয়াছে তাহার উত্তাপে তিনি উন্মাদপ্রায়।

নানা ছুতায় বারম্বার কাছে আসে, মনে হয় বুঝি ধরা দিল দিল, আবার সরিয়া যায়। স্ফুরিত অধরের বাণীহীন আকুতি দুর্বোধ্য!

আর তো সময় নাই, কালই হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

আগামী পরশ্ব শিবিরে হাজির হইবার কথা।

সেনাপতি বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিলেন। গভীর রাত্রির নিবিড় অন্ধকারকে বিদ্ধিত করিয়া কাছে দূরে আলো জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আহত সৈনিকের করুণ আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। অন্তরের অন্তস্থলে তীব্র তীক্ষ্ণ বাসনা সমস্ত হৃদয়কে মথিত করিয়া তুলিতেছে।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল।

খাবার লইয়া আসিয়াছে।

সেনাপতি নির্নিমেষ নয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কালই আমাকে চলে যেতে হবে—"

তাঁহার মনে হইল নার্সের চটুল নয়ন দু'টিতে যেন বেদনার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। একটি দীর্ঘশ্বাসকে হাসিতে রূপান্তরিত করিয়া নার্স বলিল "জানি।"

"কি জান? সত্যি কথাটা জান কি?"

নার্স চকিতে একবার চাহিয়া আনত-নয়নে কফিতে দুধ মিশাইতে লাগিল!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সেনাপতি বলিলেন, "আমার জন্যে মন কেমন করবে?"

"সে কথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন—"

ছোট টেবিলটিতে কফি প্রভৃতি সাজাইয়া সেটি সেনাপতির কাছে আগাইয়া দিয়া ত্বরিতপদে নার্স বাহির হইয়া গেল।

"শোন—"

পুনঃ প্রবেশ করিল!

সেনাপতি কথাটি শেষে বলিয়াই ফেলিবেন।

"আমার সঙ্গে যাবে তুমি?"

"কোথায়?"

"আমার ক্যাম্পে—"

"কেন?"

নার্সের নয়ন দুইটি চঞ্চল হইয়া উঠিল, অধর কাঁপিতে লাগিল।

সেনাপতি বলিলেন, "কেন, তা কি তুমি জান না? চল, অন্তত: এক রাত্রির জন্যে চল—"

"চাকরি ছেড়ে যাবো কি করে?"

"ছুটি নাও—"

"সেনাপতির শিবিরে নার্স যাবে কোন্ অজুহাতে?"

"পুরুষের ছদ্মবেশে এসো, কেউ বুঝতে পারবে না—"

নার্স কিছুক্ষণ নীরব রহিল, কিন্তু মনে হইল সে যেন একটা আনন্দোচ্ছ্বাসকে প্রাণপণে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বলিল, "ছুটি কি পাবো?"

"যাতে পাও তার ব্যবস্থা করব—"

দুই

দুই দিন পরে!

সেনাপতির শিবির। চতুর্দিকে গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে। দ্বারপথে চাহিয়া অধীর আগ্রহে সেনাপতি প্রতীক্ষা করিতেছেন।

নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল।

পুরুষের বেশ।

সেনাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, অত্যন্ত তীব্র-মদির নীরবতা। উভয়ে উভয়ের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া আসিল। সহসা সেনাপতি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

"চল, ওঘরে চল—"

নার্স উঠিল না, মধুর হাসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

"চল, ওঘরে যাই—"

নার্স তথাপি উঠিল না।

"উঠছ না যে, কি চাই তোমার?"

"আমি যা চাই তা দেবেন?"

"নিশ্চয় দেব।"

নার্সের আকম্পমান অধর দুটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতে লাগিল।

সেনাপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 'কি চাই?"

"কিছুই না। আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করে আপনি এত বড় বড় যুদ্ধ জয় করেন কি কৌশলে—"

"কৌশল তো এক রকম নয় যে এক কথায় বলব।"

"কিছুদিন পরে শুনছি আবার আপনি শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করবেন। তার কৌশলটা কি?"

"অর্থাৎ যুদ্ধের প্ল্যানটা তুমি জানতে চাও!"

"হ্যাঁ।"

নার্স নিস্পলক নয়নে সেনাপতির মুখের পানে চাহিল।

সেনাপতি বজ্রাহতবৎ বসিয়া রহিলেন। এই মায়াবিনী তাহা হইলে স্পাই!

"যুদ্ধের প্ল্যান জেনে তুমি কি করবে?"

অবিচলিত কণ্ঠে নার্স বলিল, "কিছুই না, কৌতূহল মাত্র।"

"যুদ্ধের প্ল্যান কখনও কাউকে বলি না। বলতে মানা।"

"পর-পুরুষের শয়নকক্ষেও আমি প্রবেশ করি না, শাস্ত্রে মানা।"

তাহার কালো চক্ষু দুইটি কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিল।

সেনাপতির মুখভাব ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। নির্নিমেষ নয়নে আরো কিছুক্ষণ তিনি তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"যুদ্ধের প্ল্যান না বলিলে তুমি যাবে না ?"

কোটটি খুলিয়া দেওয়ালের একটি পেগে টাঙাইয়া রাখিতে রাখিতে হাসিয়া নার্স বলিল—"না—"

নার্সের নাতি-আবৃত দেহের দিকে সেনাপতি প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

যৌবন ফাটিয়া পড়িতেছে, অধরে মৃদু হাসি, চক্ষু আবেশময়।

"যদি জোর করি—"

"আমি চীৎকার করব! মাননীয় সেনাপতির পক্ষে সেটা সম্মানজনক হবে না—"

সেনাপতির মুখভাব কঠিনতর হইল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আরও কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন,—"বেশ, দেখ—"

ড্রয়ার খুলিয়া একটি ম্যাপ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

নার্স মনোযোগ সহকারে ম্যাপটি সাগ্রহে দেখিতে লাগিল।

"এইবার চল—"

"আপনি যান, আমি আসছি এক্ষুণি, আমাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। বাথরুমটা কোথায়—"

বাথরুম দেখাইয়া দিয়া সেনাপতি পাশের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নার্স টেবিল হইতে কাগজ লইয়া কি যেন লিখিতে লাগিল।

লেখা শেষ করিয়া বাথরুমে গেল এবং বাথরুম হইতে বাহির হইয়া সেনাপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা ঘনাইয়া আসিল।

তিন

আধঘণ্টা পরে।

সেনাপতি শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বিস্রস্ত-বাসা নার্সও বাহির হইল।

সেনাপতির মুখ পাষণের মত নির্মম হইয়া উঠিয়াছে।

নার্স মৃদু হাসিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না—চকিতের মধ্যে সেনাপতির পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল, নার্সের মস্তক বিচূর্ণিত হইয়া গেল!

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া সেনাপতি বলিলেন, "ঘৃণ্য স্পাই কোথাকার!"

নার্সের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। তাহার পানে চাহিয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সহসা নজরে পড়িল, টেবিলের উপর একটা চিঠি রহিয়াছে।

প্রিয় সেনাপতি মহাশয়,

আমি ধরা পড়িয়াছি, হয়তো আমাকে এজন্য মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। আপনার হাতে মরতে আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুকে কে অতিক্রম করিতে পারে? আপনার হাতে প্রাণ বিসর্জন করিলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য।

এই ক্ষুদ্র অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে এ অনুরোধ হয়তো আমি করিতাম না, আপনাকে সত্যিই আমি ভালোবাসিয়াছিলাম, সেই ভালবাসা-জনিত স্পর্ধায় এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি করিতে সাহস করিতেছি। আমার মৃতদেহটা আমার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি সেনাপতি, ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন। ইহাই আমার অন্তিম অনুরোধ।

ইতি—

আপনার ক্ষণ-সঙ্গিনী

চার

নার্সের মৃতদেহ স্বদেশে উপনীত হইল।

তাহার পূর্বে একটি সংবাদও উপনীত হইয়াছিল।

জীবিত নার্সই সংবাদটি পাঠাইয়াছিল—"আমার শব হয়তো গোপন সংবাদটি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিও—"

বাথরুমে যে কাগজটি নার্স গলাধঃকরণ করিয়াছিল, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া কাগজটি পাওয়া গেল।

তাঁহাতে যুদ্ধের প্ল্যান লেখা ছিল।

নাথুনির মা

Fixity of purpose-এর বাংলা কি ?

উদ্দেশ্যের দৃঢ়তা ?

যাহাই হোক, ইহার সুন্দর একটি উদাহরণ সেদিন দেখিয়াছিলাম। গল্পটি বলিবার পূর্বে "লক জ" কাহাকে বলে, তাহাও বুঝানো দরকার। "লক জ" (Lock Jaw) তাহাকেই বলে, যাহা হইলে ব্যাদিত আনন আর বন্ধ হয় না, ব্যাদিতই থাকে। হাই তুলিতে গিয়া অনেক সময় এই বিপদ ঘটে—মুখ কিছুতেই বোজে না, হাঁ করিয়াই থাকিতে হয়, যতক্ষণ না কোন ডাক্তার চোয়ালের হাড়টি যথাস্থানে বসাইয়া দেন। ইহার ঠিক ডাক্তারি নাম—ডিস্‌লোকেশন অব ম্যাণ্ডিবল (Dislocation of mandible)—একবার হইয়া পড়িলে সঙিন 'পরিস্থিতি'।

একটি রোগীকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে হইয়াছিল। সকালে চোখ হইতে ঘুম ছাড়িতেছিল না। গৃহিণীর বারম্বার তাগাদা সত্ত্বেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম।

কড়কড় শব্দে—বাজ পড়িল না, দুয়ারে কড়া নড়িল।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি আধ-ঘোমটা দেওয়া কমবয়সী মেয়ে একটি বুড়ীকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিনিতে পারিলাম—নাথুনির স্ত্রী ও মা। ইহাদের বাড়িতে ইতিপূর্বে চিকিৎসা করিয়াছি। নাথুনি স্থানীয় ময়দার কলে চাকরি করে।

কি হ'ল ?

বুড়ী নীরব।

নাথুনির বউ বলিল, মায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বুজছে না। বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

তাই নাকি ? দেখি—

দেখিলাম, ঠিক তাই—বুড়ীর 'জ' স্থানচ্যুত হইয়াছে।

নাথুনি কোথায় ?

নাইট-ডিউটি থেকে ফেরে নি এখনও।

এ রকম হ'ল কি ক'রে ? হাই তুলতে গিয়ে ?

বধূই উত্তর দিল (বুড়ীর পক্ষে কথা বলা অসম্ভব), না, হাই তুলতে গিয়ে নয়।

তবে?

এমনই।

এমনই কি ক'রে হবে, কিসের জন্যে হাঁ করেছিল?

বধূটি তখন ঈষৎ হাসিয়া অবনত মস্তকে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে সসঙ্কোচে বলিল, মা আমাকে গাল দিচ্ছিলেন। অনেকক্ষণ গাল দেবার পর যেই 'পোড়ারমুখী' বলতে গেছেন, অমনই 'পোড়ার' পর্যন্ত ব'লেই—

মুখে আঁচল দিয়া ঘাড় ফিরাইয়া সে হাস্য গোপন করিল। বুড়ীর চোখের দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ হয়েছে?

আধ ঘণ্টা হবে।

আচ্ছা, ব'স তোমরা, এখুনি ঠিক ক'রে দিচ্ছি আমি।

ভাবিলাম, মুখরা বুড়ীটা আর একটু শাস্তি ভোগ করুক, আমি তক্ষণ প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া লই।

রোগী দেখিবার ঘরটায় তাহাদের বসাইয়া আমি ভিতরে চলিয়া গেলাম।

ফিরিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

আসিয়া বিধিমত দুই হাতের দুইটা বুড়ো আঙুল বুড়ীর মুখগহ্বরে পুরিয়া নীচের চোয়ালের হাড়টায় জোরে চাপ দিয়া টান দিলাম। খুট্ করিয়া হাড় যথাস্থানে বসিয়া গেল।

মুখ হইতে বুড়া আঙুল দুইটি বাহির করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়া বলিল, মুখী!'

কাকের কাণ্ড

কা—কা—কা—কা

জগত্তারিণী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঘরের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া বলিলেন, হু-স—

কাকটা উড়িয়া গিয়া রান্নাঘরের ছাতে বসিল। জগত্তারিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পুনরায় ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কয়দিন হইতে কোমরে এমন একটা ব্যথা হইয়াছে। কোমরের অপরাধ নাই, বয়সও তো পঁয়ষট্টি পার

হইতে চলিল। ঘরে ঢুকিয়া মুখবিকৃতিসহকারে তিনি উপবেশন করিলেন এবং কাঁথা সেলাইয়ে মন দিলেন। নতিকার ছেলে হইয়াছে, তাহাকে পাঠাইতে হইবে।

কা—কা—কা—কা—

অমঙ্গল-আশঙ্কায় জগত্তারিণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। হাবু, গবু, দেবু, নিপু—চার ছেলেই বিদেশে, কোলের ছেলে টিপু যদিও বাড়িতে আছে, কিন্তু তাহারও শরীরটা ভাল নাই, এম. এ. পরীক্ষার খাটুনিতে ছেলের শরীরটা রোগা হইয়া গিয়াছে। সে উপরের তেতলার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছে। ছোট নাতি টুকু পাটনা গিয়াছে ফুটবল ম্যাচ খেলিতে—যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে, কখন যে কি করিয়া বসে ঠিক নাই। ইভা, নিভা—মেয়ে দুইজন শ্বশুর-বাড়িতে। তাহাদেরও অনেকদিন চিঠিপত্র আসে নাই। ছোট বউ মুখুজ্জেদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। নীচে কেহ নাই। নির্জন দ্বিপ্রহর।

কা—কা—কা—কা

জগত্তারিণীর মনে পড়িল, কর্তা যে অসুখে মারা যান, সেই অসুখটি হইবার পূর্বে ঠিক এমনই ভাবে কাক ডাকিয়াছিল। কি অলুক্ষণে ডাক।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আবার কষ্ট করিয়া উঠিলেন।

হু-উ-স—

কাক উড়িয়া কদমগাছের ডালটায় বসিল।

কা—কা—কা—কা—

হুস—হুস—

কাক উড়িল না, কিন্তু নীরব হইল এবং ঘাড় বাঁকাইয়া জগত্তারিণীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

জগত্তারিণী স্বগতোক্তি করিলেন, নবান্নের দিন যখন পেসাদ খেতে দেওয়া হয়, সেদিন পাত্তা থাকে না কারও—এখন এসেছেন জ্বালাতে।

জগত্তারিণী ঘরের মধ্যে গেলেন, মুখবিকৃতিসহকারে পুনরায় বসিলেন এবং চশমাটি ঠিক করিয়া সেলাইয়ে মন দিলেন।

কা—কা—কা—

জ্বালিয়ে খেলে তো মুখপোড়া।

কা—কা—কা—কা—

আবার উঠিতে হইল ;

হুস—হুস—যা—যা—

কাক বলিতে লাগিল, কক্—কক্—কক্—

ভারি ত্যাঁদোড় তো মুখপোড়া !

কক্—

দেখবি তবে ?

হস্ত উত্তোলন করিয়া জগত্তারিণী একটা কিছু ছুঁড়িয়া মারিবার ভান করিলেন। কাক ভান বোঝে। সে এক ডাল হইতে আর এক ডালে লাফাইয়া বসিল এবং জগত্তারিণীকে রাগাইয়া দিবার জন্যই যেন তাঁহার দিকে গলা বাড়াইয়া র-ফলা যুক্ত করিয়া ডাকিল, ক্র—ক্র—ক্র

হুস—

কাক চুপ করিল এবং মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া সামনের ডালটার উপর ঠোঁট শানাইতে লাগিল।

জগত্তারিণী অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, পাজি কোথাকার! ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। পুনরায় অতি কষ্টে বসিয়া প্রসারিত কাঁথাটায় মনোনিবেশ করিলেন। মিনিটখানেক বেশ নিবিষ্ট মনেই সেলাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবার—

কাঙাক্—কাঙাক্—কাঙাক্—

অনুনাসিক কণ্ঠে ডাকিতেছে।

জগত্তারিণী ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ডাকুক। বার বার আর কোমরের ব্যথা লইয়া উঠিতে পারেন না তিনি। ছোট বউ সেই যে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে, এখনও পর্যন্ত ফিরিবার নাম নাই। এমন আড্ডাবাজ হইয়াছে আজকালকার মেয়েরা !

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণী আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—

আরও দুইটা ফোঁড় দিলেন।

কা—কা—কা—কা—

জগত্তারিণীর মনে হইল, বলিতেছে, খা—খা—খা—

অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

খাটের রেলিঙে ভর দিয়া আবার উঠিতে হইল তাঁহাকে।

আলাতন!

কা—কা—কোয়্যাক—

দূর হ—

কা—আ—কা—কা—

দূর দূর—দূর হ—

কা-কা—কা-আ—কা-আ—

তবে রে মুখপোড়া—

জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানে নামিলেন, আরও কষ্ট করিয়া একটি ছোট ঢিল কুড়াইয়া সক্রোধে সেটি কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া নিজেই পড়িয়া গেলেন। সকালে একপশলা বৃষ্টি হওয়াতে উঠানটা পিছল হইয়া ছিল।

একজন সাব্‌ ডিভিশনাল অফিসারকে মহকুমার নানাবিধ জরুরি কাজ ফেলিয়া, একজন মুন্সেফকে অনেকগুলি দরকারী মকদ্দমার শুনানি মুলতুবি রাখিয়া, একজন হাই-স্কুলের হেডমাস্টারকে বহুবিধ কর্তব্য স্থগিত রাখিয়া এবং একজন ডাক্তারকে অনেকগুলি শক্ত রোগী ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিতে হইল। সকলকেই সপরিবারে। নিভা দানাপুর হইতে এবং ইভা কলিকাতা হইতে সংসার ফেলিয়া সপুত্রকন্যা আসিয়া হাজির হইলেন। পৌত্রী লতিকাও তাহার কচি ছেলেটিকে লইয়া আসিয়া পড়িল। টুকুদের ফুটবল-ম্যাচে 'ড্র' হইয়াছিল। টুকু দলের মেরুদণ্ডস্বরূপ, কিন্তু টেলিগ্রাম পাইয়া সমস্ত দলটিকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া দিয়া সেও চলিয়া আসিল।

টিপু চতুর্দিকে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছিল—Mother seriously ill; come immediately.

এখন দেখা যাইতেছে, তত সিরিয়াস নয়, হাড়-টাড় ভাঙে নাই, কোমরে একটু চোট লাগিয়াছে মাত্র। পড়িয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ডাক্তাররা বলিয়াছেন, তাহা দুর্বলতার জন্য। ঠিক আগের দিনই নির্জলা একাদশী ছিল। বহুকাল পরে পুত্র-কন্যা-পৌত্র-পৌত্রীদের একত্রিত দেখিয়া জগত্তারিণীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাঁহার কোমরের ব্যথা যেন অর্ধেক সারিয়া গেল। তিনি বালিশে ভর দিয়া সকলের বারণ সত্ত্বেও ধীরে

ধারে   বসিলেন এবং স্নেহ-সজল কণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের সবাইকে রেখে এখন ভালয় ভালয় যেতে পারলেই বাঁচি আমি।

টিপু বলিল, ভাগ্যিস আমি ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে নেবে এসেছিলুম, তা না হলে কি কাণ্ডই যে হত!

বড় ছেলে—তিনি এস. ডি. ও.—তিনি বলিলেন, তখনই আমি বলেছিলাম, উঠানটাও পাকা হয়ে যাক, কিন্তু তোমরা আপত্তি করলে।

মেজ ছেলে গবু—যিনি মুন্সেফ—তিনি বলিলেন, আজই হরেন ওভারশিয়ারকে ডাকিয়ে উঠোনটা বাঁধাবার ব্যবস্থা কর, তবে খুব বেশি পালিশ যেন না করে।

সেজ ছেলে দেবু হেডমাস্টার—বলিলেন, তা ঠিক।

ন ছেলে নিপু—ডাক্তার—তিনি ব্ল্যাড-প্রেসার মাপিবার যন্ত্রটা লইয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, ব্ল্যাড-প্রেসারটা আর একবার মাপা দরকার।

বাহিরের বারান্দায় ছেলেমেয়েরা কলরব করিতেছিল। সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল লতিকার ছেলের গলা।

জগত্তারিণী হাসিয়া বলিলেন, ওলো লতি, খুব উঁচুদরের গলা হয়েছে যে তোর ব্যাটার! নিয়ে আয় ওকে আমার কাছে।

সমস্ত ঘটনার মূল সেই কাকটা পাশের বাড়ির চিলে-কোঠার ছাতে বসিয়া নানা ভঙ্গীতে ডাকিতেছিল, ক—কক্—কর্র্; কিন্তু গোলমালে তাহা আর জগত্তারিণীর কানে গেল না।

খেলা

বিড়ালের নাম।

যখন সে খুব ছোট ছিল, তখন সে নিজের পুচ্ছটিতে থাবা মারিয়া মারিয়া খেলা করিত বলিয়া গৃহিণী তার নাম রাখিলেন—খেলা। এখন কিন্তু খেলা প্রবীণ। তাহার চপলতা যে কোনকালে ছিল তাহা যাঁহারা তাহাকে শিশুকালে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। এখন খেলার ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। ঘাড়ে-গর্দানে মোটা-সোটা চেহারা, কচিৎ চোখ খোলে। চোখ বুজিয়া থাবা গড়িয়া বসিয়া আছে তো আছেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য তপস্বী যেন।

কিন্তু ভয়ানক চোর।

কে কোথায় কখন দুধের ঢাকাটা খুলিয়া রাখিতেছে, বাজার হইতে আনা মাছটা বারান্দা হইতে সঙ্গে সঙ্গে তোলা হইতেছে কি না, ছেলেমানুষ বউটি কখন অন্যমনস্ক হইতেছে—সমস্ত তাহার নখদর্পণে। অথচ কখন চুরি করে ধরা যায় না। যখনই দেখ, হয় তুলসীতলার পাশে, না হয় গৃহিণীর পূজার ঘরের কোণে চোখ বুজিয়া ধ্যানগম্ভীর মূর্তি বসিয়া আছে। যদি গালাগালি দাও, আস্তে আস্তে উঠিয়া নির্জন স্থানে গিয়া বসিবে। বাড়ির কে কি চরিত্রের লোক, তাহা তাহার অবিদিত নাই।

ছোট ছেলেরা যখন খাইতে বসে, তখন খেলার আর এক মূর্তি। তখন চোর নয়, ডাকাত। সোজা পাত হইতে মাছটি তুলিয়া লইয়া সামনে বসিয়া খায়। মারিলেও নড়ে না। কেবল চোখ মুখ কুঁচকাইয়া ঘাড়টি পিছন দিকে ঈষৎ সরাইয়া চোখ বুজিয়া থাকে, দেহ সরায় না। মার বন্ধ হইলে পুনরায় খায়। ছোট ছেলেরা কত জোরেই বা মারিতে পারে। চেঁচামেচি করিলে গৃহিণী আসিয়া পড়েন এবং খেলাকে ছোট্ট একটা চাপড় মারিয়া বলেন, পোড়ারমুখো মাছটা নিলে বুঝি পাত থেকে, কাঁদিস না, এনে দিচ্ছি আর একখানা। ক্ষতিগ্রস্ত বালকটিকে আর এক টুকরা মাছ আনিয়া শান্ত করেন এবং যতক্ষণ না তাহাদের খাওয়া শেষ হয়, সম্মুখে বসিয়া থাকেন। খেলা অপহৃত মৎস্যটি নীরবে ভক্ষণ করিয়া একটু দূরে গুটিসুটি হইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। আহত আত্মসম্মানের মূর্ত ছবিটি যেন। জানে, গৃহিণী থাকিলে সুবিধা হইবে না। উহাকে চটাইয়াও লাভ নাই, উহারই কৃপা আছে বলিয়া তাহার সাতখুন মাপ।

গৃহিণী তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া বলেন, খেয়ে খেয়ে মুখপোড়ার গতর হয়েছে দেখ না! খেলার মুদিত চক্ষু মিটিমিটি করিতে থাকে।

ধুম্‌সো কোথাকার!

খেলা উত্তর দেয়, ম্যা-অ্যা-অ্যা-ও—

খুব আস্তে আস্তে, এত আস্তে যে, শোনা যায় না প্রায়। আন্দাজ করিয়া লইতে হয়।

বাড়িতে প্রচুর ইঁদুর। কিন্তু খেলার সেদিকে ঝোঁক নাই। থাকিবেই বা কেন! বাড়িতে অনায়াসলভ্য এত পুষ্টিকর খাদ্য থাকিতে সে আয়াস করিতে যাইবে কোন্ দুঃখে। মাঝে মাঝে তাহাকে অবশ্য গর্তের কাছে

বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক একাগ্র উন্মুখ ওত পাতিয়া বসা নয়। তাহা অনেকটা যেন নধরকান্তি জমিদারবাবুর শখ করিয়া মাছ ধরিতে বসার মত। বাড়ির বড় ছেলে নৃপেন কিছুদিন হইল ডাক্তার হইয়াছে, তাহার ধারণা, পরীক্ষা করিলে খেলার ইউরিনে সুগার পাওয়া যাইবে।

খেলার অত্যাচারে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে বাড়ির বধূটি—নৃপেনের বউ। অল্প বয়স, হুঁশ কম, সং সময়ে দুধে ঢাকা দিতে মনে থাকে না, রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া দিতে ভুলিয়া যায়, মাছের অম্বলটা সময়মত শিকায় তুলিয়া রাখা হয় না। শ্বশুর-শাশুড়ির বকুনি খাইতে খাইতে বেচারী হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। অথচ খেলাকে কিছু বলিবার উপায় নাই, গৃহিণীর প্রিয় বিড়াল। তাঁহার ধারণা গৃহস্থকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান কাক, বিড়াল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহারা গৃহস্থের হিতৈষী। তবু একদিন বধূটি বিরক্ত হইয়া খেলাকে লক্ষ্য করিয়া একটা চেলাকাঠ ছুঁড়িয়াছিল। চেলাকাঠ খেলাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, জাভের মধ্যে কুঁজাটা চুরমার হইয়া গেল।

সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক হইল একাদশীর দিন। শ্বশুর সেদিনে দিবসে লুচি এবং রাত্রে ফলাহার করেন। আম সাজাইয়া শাশুড়ি অপেক্ষা করিতেছেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

ক্ষীর আনিতে গিয়া বউমার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বাটিটি কেহ যেন ধুইয়া পুঁছিয়া রাখিয়াছে।

রাত্রে নৃপেনেরও চক্ষুস্থির হইবার উপক্রম হইল।

মীট্‌সেফ! মীট্‌সেফ কোথা পাব হঠাৎ?

কিনে আন একটা।

সে যে প্রায় দশ-বারো টাকার ধাক্কা, বেশীও হতে পারে। তা ছাড়া—

তা হোক, তবু কিনে আন তুমি, খেলা আমাকে পাগল করবার যোগাড় করেছে। সকলের বকুনি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেলাম আমি। —বধূর আবদারমাখা কণ্ঠস্বর ও বিপন্ন মুখচ্ছবি নৃপেনকে বিব্রত করিল। প্রথমত, হাতে টাকা নাই, এই তো সবে প্র্যাক্টিস শুরু করিয়াছে, দ্বিতীয়ত, ধারেও যদি সে মীট্‌সেফ কিনিয়া আনে, বাবা কি বলিবেন। অর্থাভাবে কত প্রয়োজনীয় কর্তব্য অকৃত রহিয়াছে, হঠাৎ একটা মীট্‌সেফ—।

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পরদিন কিন্তু দুইটি কুলিবাহিত হইয়া একটা প্রকাণ্ড মীট্‌সেফ আসিয়া পড়িল। কুলির হাতে পিতার নামে নৃপেনের একটি চিঠিও। নৃপেন ডিসপেন্সারী হইতে লিখিতেছে—

একটি মীট্‌সেফ পাঠাইতেছি। ইহা একজন রোগী আমাকে উপহার দিয়াছে।

খেলা মীট্‌সেফটির দিকে একবার চাহিল, বধূটির দিকে একবার চাহিল, তাহার পর সম্মুখের পা দুইটি বিস্তার করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া হাই তুলিল, এবং ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কয়েকদিন কাটিয়াছে।

পুনরায় একাদশী রজনী সমুপস্থিত। কর্তা ফলাহার করিতে বসিয়াছেন। গৃহিণী আমের থালা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

বউমা, ক্ষীরটা দিয়ে যাও।

বউমা মীট্‌সেফ খুলিয়া অবাক! মীট্‌সেফের কপাটটা ভাল করিয়া খুলিতেই খেলা গম্ভীর মুখে বাহির হইয়া গেল, ক্ষীরের বাটি খালি।

মীট্‌সেফের ছিটকিনিটা লাগাইতে ভুল হইয়া গিয়াছিল।

তপন

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বলিষ্ঠগঠন ব্যক্তিটি নিঃশব্দ-নিপুণতা সহকারে বাতায়নপথে প্রবেশ করিল। দীর্ঘ দেহ, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল, ঘনকৃষ্ণ চাপ দাড়ি। চপলা নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিল। লোকটি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

চপলা চীৎকার করিতে গিয়া থামিয়া গেল। সে হঠাৎ তপনকে চিনিতে পারিল।

তপন। তুমি! এতদিন পরে।

হ্যাঁ, দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টা আজ সফল হয়েছে, আজই জেল থেকে পালিয়েছি! আর দেরি ক'রো না, চল শিগগির।

প্ল্যান ঠিক ক'রে ফেলেছি। প্রথম চাটগাঁ, তারপর রেঙ্গুন, তারপর পাহাড় পেরিয়ে—

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

তপন হাসিল।

তোমার সিঁদুরটা দেখতে পেয়েছি। জেলে বসেই খবর পেয়েছিলাম। তুমি বীরের গলায় মালা দেবে বলেছিলে না? অবশ্য তোমার স্বামীও কম বীর নন; রায়সাহেব হওয়া সোজা কথা নয়।

তুমি অমন করে ঠাট্টা কোরো না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকব, সে প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারি নি। আমায় ক্ষমা কর তুমি।

তপন সস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল। ইহারই প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া, ইহারই চক্ষে নিজেকে মহনীয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য দেশের কাজে সে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল। চপলার বয়স সহসা যেন দশ বছর কমিয়া গেল, অতীত যৌবনের অবলুপ্ত উন্মাদনা আবার অকস্মাৎ যেন তাহার দেহে মনে ফিরিয়া আসিল।

আমি যদি যাই, আমাকে নিয়ে যাবে?

সেইজন্যে তো এসেছি। কিন্তু রায়সাহেবটি?

ওর অবশ্য কষ্ট হবে খুব। আর তা ছাড়া—

সহসা চপলা থামিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল, উনি জানেন।

কি ক'রে জানলেন?

আমিই বলেছিলাম।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চপলা বলিল, তুমি জেল থেকে পালিয়েছ, আমিও যদি পালাই, উনি সব বুঝতে পারবেন, আর তা হ'লে হয়তো—

চপলা কথাটা শেষ করিল না।

তপন বলিল, তা হ'লে হয়তো ওর চেষ্টায় অবিলম্বে ধরা পড়ে যাব আমরা। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে, সে বিষয়ে নিষ্কণ্টক এখনই হতে পারি। পকেট হইতে রিভলবারটা টানিয়া সে দেখাইল। তোমার স্বামী ক্লাব থেকে কোন্ পথে ফিরবেন তা জানি।

চপলা চুপ করিয়া রহিল।

বল, রাজী আছ?

চপলা নির্নিমেষে তপনের মুখের পানে চাহিয়াছিল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছি।

এতদিন যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস করলে, তাকে সহজে ছেড়ে যাবে? যেতে পারবে?

চপলা তাহার মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! তপন এ কি বলিতেছে? সে কি জানে, তাহার জন্ম কত বিনিদ্র রজনী সে যাপন করিয়াছে? সে কি বুঝিতে পারিবে, কিসের তাড়নায়, কিসের জ্বালায় সমাজের ষড়যন্ত্রে সে বিবাহ করিয়াছে? নারীর ব্যথা, নারীর দুর্বলতা, নারীর সমস্যা, নারীহৃদয়ের দুর্বোধ্য জটিলতার কতটুকু জানে সে? কতটুকু বোঝে? বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই তপন পর হইয়া যাইবে? তপনই তো তাহার স্বামী, তপনই তো তার আরাধ্য দেবতা। সে স্বয়ং আসিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া দিবে?

তপন পুনরায় প্রশ্ন করিল, যেতে পারবে?

পারব।

চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

রায়সাহেবকে শেষ ক'রে আসছি তা হ'লে।

তপন চলিয়া গেল।

একঘণ্টা পরে দ্বারপথে শব্দ হইল।

তড়িৎপৃষ্ঠবৎ চপলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার ঠেলিয়া রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন, তপন নয়। তপন আর ফিরিল না।

তিলোত্তমা

এক

সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তর-বাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্ম রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।

নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বি. এ. পাস করিয়া এখানে ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, পথের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারাণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল। আর পাঁচজনের যেমন বিবাহের সম্বন্ধ আসে, গোকুলেরও তেমনই আসিতে লাগিল। বিবাহের বাজারে গোকুল সুপাত্র। শহরের উপর একখানি ত্রিতল বাড়ি, পিতার তেজারতি-ব্যবসায়, মাতুলালয়ের বিষয়-সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে কোন কালে গোকুলকে উদারান্নের জন্য চাকুরির উপর নির্ভর করিতে হইবে না। ভগবান তাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাহাতে স্বচ্ছন্দে সে সারাজীবন শখের থিয়েটারে রিজিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পারে।

বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা নকুল নন্দী অভিজ্ঞ লোক। কুষ্টি, বংশ, পাত্রীর রূপ, পণের পরিমাণ সমস্ত দিক বিচার করিয়া নন্দী মহাশয় যে পাত্রীটিকে মনোনীত করিলেন, তাহার নাম, তিলু, ভাল নাম তিলোত্তমা। নন্দী মহাশয় সেকেলে লোক, সুতরাং পুত্রকে না পাঠাইয়া নিজেই কন্যা-দেখিতে গেলেন এবং পছন্দ করিয়া আসিলেন। নাম শুনিয়া গোকুল মুগ্ধ হইয়া গেল। মনে মনে সে যে ছবিটি আঁকিতে লাগিল, কাব্যের তিলোত্তমা তাহার কাছে কিছু নয়।

দুই

শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু সে ঘাবড়াইয়া গেল। তিলোত্তমাই বটে! তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহলধ্বনি, পরিবেশনধ্বনি, নানারূপ ধ্বনির মধ্যে ইহারই পানিপীড়ন তাহাকে করিতে হইল। উপায় নাই। কিন্তু ঘাবড়াইয়া গেল।

পিতা নকুল নন্দীও ঘাবড়াইয়া গেলেন। তিনি বেহাইটিকে যেরূপ সোজা লোক মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, আসলে তিনি মোটেই সেরূপ সোজা নহেন। লোকটি হাত কচলাইয়া ক্রমাগত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ করিয়া চলিয়াছে, অথচ একটিও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই। নগদ পাঁচ শত টাকা পণ কম দিয়াছে, বলিতেছে, এখন সব জুটাইতে পারা গেল না, বাকি টাকা পরে

পরিশোধ করিয়া দিব। দানপত্র যাহা দিয়াছে, অত্যন্ত খেলো। চেলীর রঙ উঠিয়া যাইতেছে। রিস্টওয়াচ নাই—কলিকাতায় নাকি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আংটিটা সোনার কি না কে জানে—দেখিতে তো পিতলের মত। তিনি শেষে একটা ধড়িবাজের সহিতই কুটুম্বিতা করিয়া বসিলেন নাকি? তখন তিনি যাহা দাবি করিয়াছিলেন, লোকটা তাহাতেই রাজি হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে ঘাড় নাড়িয়াছিল। দাবি অবশ্য তিনি একটু বেশি করিয়াছিলেন, কিন্তু বেশি টাকা না পাইলে ওই কুচ্ছিত হাঁদামুখো মোটা মেয়েকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়া লইবেনই বা কেন তিনি? সব জিনিসেরই একটা হিসাব আছে তো। কিন্তু এ কি কাণ্ড? ওই অতি বিনয়ী লোকটার নিকট এ ব্যবহার কে প্রত্যাশা করিয়াছিল? বাড়িতেও যৎপরোনাস্তি গাল খাইতে হইল। গোকুলের মা উচ্চকণ্ঠে এই কথাই বার বার বিঘোষিত করিতে লাগিলেন যে নকুলের ভীমরতি ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ সজ্ঞানে নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে? ছি ছি ছি ছি! নকুল মিথ্যা কথা বলিয়া রেহাই পাইলেন—'ও মেয়ে আমাকে দেখায় নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ গোলগাল গড়ন। চোর—চোর, জোচ্চোর, ধড়িবাজ ব্যাটা। ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।' সকলেই ইহাতে সায় দিল। এমন কি গোকুল পর্যন্ত।

তিন

তিলোত্তমার সহিত আলাপ হইল বইকি! একটা জিনিস গোকুল লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, তিলু ভারি ভালমানুষ। মুক্তোকেশী বেগুনের মত তাহার মুখখানিতে ভালমানুষি যেন মাখানো। লাজুকও খুব। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। আলাপ করিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। তাহার বাবাকে সকলে মিলিয়া যে এত গালাগালি দিল, তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। সকালে সূর্য উঠিলে বা বর্ষাকালে বৃষ্টি নামিলে সে বিস্মিত বা বিচলিত হয় না। এ ব্যাপারেও হইল না। বিবাহ-ব্যাপারে এসব হইয়া থাকে, ইহাতে আশ্চর্য বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

নকুল নন্দী তাহার সম্পর্কে যে মিথ্যাভাষণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা করিলে

সে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিত। কিন্তু সে করিল না। সসঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। গোকুলকে স্বামীরূপে পাইয়া সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, অকারণ বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন কি? সে প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করিতেছে, সে গোকুলের অনুপযুক্ত, অনধিকার হইয়াও সে ভাগ্যবলে সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে; কলহ-কোলাহল ভুলিয়া এ আনন্দলোক হইতে নির্বাসিত হইতে সে চায় না।

গোকুল বলিল, বাবা-মা বলেছেন, আবার আমার বিয়ে দেবেন।

তিলু চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর দিচ্ছ না যে?

বেশ তো। হিঁদুর ঘরে হয় তো অমন।

তোমার কষ্ট হবে না?

আমার? না।

একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিল, হ'লেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।

গোকুলের মনে হইল, ইহা অভিমানের কথা। কিছু বলিল না।

চার

বছরখানেক কাটিয়া গেল।

তিলুর সম্বন্ধে মোহ-মুক্ত হইবার পক্ষে এক বৎসর যথেষ্ট সময়। না জানে লেখাপড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রূক্ষেপ নাই। মা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেয় না, সে বাহিরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আকাশে চাঁদ উঠিল কি না, বকুল-বনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত।

নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!

বাবা যদিও এখনও বেহাই-গুষ্টির উপর চটিয়া আছেন, কিন্তু দ্বিতীয় বার বিবাহের কথা তিনি আর উত্থাপন করেন নাই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোকুলের পক্ষেও মুখ ফুটিয়া সে প্রস্তাব করা শক্ত। এমন সময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

পাঁচ

'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয় হইবে। সেলুকাস ও অ্যান্টিগোনাস অভিনয় করিবার লোক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পোশাক পাওয়া যাইতেছে না। গ্রীক পোশাক আনিবার জন্য গোকুল কলিকাতায় যাইতেছিল। স্টেশনে টিকিট করিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, একজন বিধবা প্রৌঢ়া ভিড়ের মধ্যে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের পুঁটুলি ও কাপড়-চোপড় সামলাইয়া তিনি কিছুতেই টিকিট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। লোকে চতুর্দিক হইতে ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাঁহাকে কেবল পিছাইয়া দিতেছে। গোকুল তাঁহাকে সাহায্য করিল। টিকিট কিনিয়া দিল। তিনিও কলিকাতা যাইতেছেন, তাঁহার সহিত কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই, সুতরাং গোকুলকে সে ভারও লইতে হইল। গোকুলের কামরাতেই তিনি উঠিলেন। গোকুল নিজের নানারূপ অসুবিধা করিয়া, এমন কি একজন প্যাসেঞ্জারের সহিত কলহ করিয়াও তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ হইলেন।

কামরা ক্রমশঃ খালি হইয়া গেলে প্রৌঢ়া পুঁটুলি হইতে পান বাহির করিয়া গোকুলকে একটি দিলেন, নিজেও একটি লইলেন। তাহার পর চকচকে একটি রূপোর কৌটা হইতে খানিকটা জরদাও বাহির করিলেন। গোকুল লইল না, অভ্যাস ছিল না। প্রৌঢ়া স্মিত মুখে নিজের মুখ-বিবরে খানিকটা নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, .কপাল যখন পুড়ে গেল, তখন একে একে সবই ছাড়তে হল। এটুকু কিন্তু এখনও ছাড়তে পারি নি বাবা!

মুচকি হাসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পিচ ফেলিলেন।

আলাপ শুরু হইয়া গেল।

দীর্ঘ আলাপ হইল। দীর্ঘ আলাপের ফলে প্রৌঢ়া গোকুলের নাড়ি-নক্ষত্র সমস্ত জানিয়া লইলেন। গোকুলও মন খুলিয়া সমস্ত বলিয়া ফেলিল কিছুই গোপন করিল না, করিতে পারিল না, এমন কি করিবার প্রয়োজনও অনুভব করিল না। অর্থাৎ গোকুলও মুগ্ধ। সব শুনিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন, তুমি যে আবার বিয়ে করবে বলছ, পাত্রী ঠিক হয়েছে কোথাও?

এখনও হয় নি।

আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখে দিয়া প্রৌঢ়া বলিলেন দেখ বাবা, তাহ'লে সব কথা তোমাকে খুলেই বলি। আমার একটি মেয়ে

আছে, ওই মেয়েটি হবার পরেই আমার কপাল পুড়ে গেল। মনের মত একটি পাত্র খুঁজছি। তুমি তো আমাদের পাল্‌টি ঘর, তোমাকে ভারি পছন্দ হয়েছে আমার, আমার মেয়েও কিছু নিন্দের নয়—যদি বল, তা হ'লে—

গোকুল ইহা প্রত্যাশা করে নাই। কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

উষাকে আগে দেখ তুমি! তোমার যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে—

আমতা আমতা করিয়া গোকুল বলিল, আমার স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সে কথা জানবার পর আপনার মেয়ে হয়তো আপত্তি করতে পারেন।

আমার কথার ওপর কথা কইবে উষা! তেমন মেয়েই সে নয়। তাকে লেখাপড়া, গান-বাজনা সবই শিখিয়েছি, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের মত অবাধ্য তাকে হতে দিই নি। আর একটা স্ত্রী থাকলেই বা! তা ছাড়া তুমি যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ, তখন সে স্ত্রীকে তুমি ত্যাগই করবে ঠিক করেছ নিশ্চয়—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

তা হ'লে সে স্ত্রী থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি—অ্যাঁ, কি বল?

তা তো ঠিকই।

ছয়

উষা উষা নয়—দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ। সেতারে অমন গৌরসারঙের আলাপ গোকুল আর কখনও শোনে নাই, হাসির পরদায় পরদায় এমন গিটকিরি তাহার কল্পনাতীত ছিল।

গোকুল কূল হারাইল।

সাত

ইহার মাসখানেকের মধ্যে প্রায় সব ঠিক হইয়া গেল। উষাকে লইয়া উষার মা চলিয়া আসিলেন এবং গোকুলদের বাড়ির নিকট একটি বাড়ি ভাড়া লইয়া গোকুলের পিতামাতার সহিত কাথাবার্তা চালু করিয়া দিলেন। উষাকে দেখিয়া গোকুলের মা শুধু মুগ্ধ নয়—আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। গোকুলের

বাবা আত্মহারা হইলেন টাকার অঙ্ক দেখিয়া। ইহার সহিত বিবাহ ঘটাইতে পারিলে নগদ দশ হাজার টাকা, প্রচুর গহনাপত্র এবং ছোটখাটো একটি জমিদারি ঘরে আসিবে। উষার মায়ের নামে একটি নাকি কলঙ্ক আছে—যাহার জন্যই নাকি তাঁহার মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। তাহা অবগত হইয়াও নকুল নন্দী বিচলিত হইলেন না। শুধু যে সেটা উপেক্ষা করিলেন তাহা নয়, বাড়ির অপর কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দিলেন না, পাছে বিবাহটা ভাঙিয়া যায়। যৌবনকালে অমন পদস্খলন দুই-একবার সকলেরই হয়। উহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই—ইহাই তাঁহার যুক্তি। উষা একটি শর্ত করিল এবং সে শর্তেও গোকুল, গোকুলের মা, বাবা সকলে রাজী হইলেন। বিবাহের পরই তিলোত্তমাকে জন্মের মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।

আট

রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বিনিদ্র নয়নে গোকুল একা বিছানায় জাগিয়া আছে—কাল সকালেই উষার মা তাহাকে আশীর্বাদ করিবেন। কই, তিলোত্তমা তো এখনও আসিল না। এত কাণ্ড হইয়া গেল, তিলোত্তমা একটি কথাও বলে নাই। তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। গোকুল এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। সমস্ত কাজ সারিয়া তিলোত্তমা অনেক রাত্রে শুইতে আসে, খুব ভোরে আবার উঠিয়া যায়। তাহার দেখা পাওয়া শক্ত। গত কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবারও তাহার সহিত নির্জনে দেখা হয় নাই, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বই কি? গোকুল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ গোকুলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিল, তিলোত্তমা সসঙ্কোচে উঠিয়া যাইতেছে। ভোর হইয়া গিয়াছে।

শোন, শোন।

কি?

আজ আশীর্বাদ মনে আছে তো?

আছে!

দেখ, তোমার আপত্তি নেই তো?

না।

বিয়ের পরই তোমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলছে—শুনেছ সে কথা?

শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া ক'রে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আমি যাই, আমার অনেক কাজ প'ড়ে আছে।

চলিয়া গেল।

গোকুল কিছুক্ষণ গুম হইয়া শুইয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বিছানা হইতে নামিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

নয়

আশীর্বাদের সাজ-সরঞ্জাম লইয়া উষার মা আসিলেন। প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম প্রকাণ্ড একটা ফুলের মালাও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, উষা সারারাত ধরিয়া নিজের হাতে মালাটি গাঁথিয়াছে।

গোকুল স্নান করিয়া আসিল। কার্পেটের আসন পাতা হইল। মালা পরিয়া গোকুল আসনে বসিতে যাইবে, এমন সময় গোকুলের মা বলিলেন, শাঁখটা বাজায় কে, আমার ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে একটা ব্রণ হয়েছে আবার। ও বউমা, কোথায় গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও।

শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।

আমাকে মাপ করবেন।

দুই হাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্যের সহিত সাক্ষী-কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী, সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি তিনি আজ অধৃত। এই প্রকাণ্ড আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিস-সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান, সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিস-সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিস প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিস-সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে

পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া অপরিচিত লোকটা নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহী বদল হইয়া গিয়াছে।

সংক্ষেপে উপন্যাস

এক

সেদিন মাঘের রাত্রি ছিল। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—অসম্ভব শীত। সঞ্জয় অন্যমনস্ক হইয়া গলিটাতে ঢুকিয়াছিল। প্রায় জনশূন্য গলি—রাত্রি অনেক হইয়াছে। হনহন করিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সঞ্জয়ের সহসা চোখে পড়িল একটা খোলার ঘরের সম্মুখে রঙিন-কাপড়পরা একটা মেয়ে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। ভীরু উৎসুক দৃষ্টি। সঞ্জয় দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুই

এক বৎসর পরে।

সঞ্জয়ের অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। ছি—ছি—ছি—নিজেকে সে কোথায় নামাইয়াছে! তাহাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিল! না হয় সে মদ খাইয়া গিয়াছিল! তাহাতে হইয়াছে কি? মদ খাইয়া হল্লা করিবার জন্যই তো ওখানে যাওয়া। মানস-নেত্রে ছবিটি ফুটিয়া উঠিল। শ্যামকান্তি তন্বী যুবতী—নূপুরে দুলে ওড়নায়, পেশোয়াজে চুমকিতে জরিতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সম্রাজ্ঞীর মত লীলায়িত ভঙ্গীতে কমনীয় বাহুটি তুলিয়া দ্বারদেশ দেখাইয়া আদেশ

করিতেছে, অমন মাতলামি করেন তো বেরিয়ে যান এখান থেকে। স্বর্ণকঙ্কণের ঝনৎকারে আবার যেন সে শুনিতে পাইল, লোহিত-রেশম-গুচ্ছ-বিলম্বিত বাজুবন্ধের দোলকটি আবার যেন চোখের সম্মুখে দুলিয়া উঠিল।

পরদিন অতিশয় সংযত কঠিন মূর্তি লইয়া সঞ্জয় গেল। নির্জন দ্বিপ্রহর। ঘরে আর কেহ ছিল না। সঞ্জয় দেখিল, সম্রাজ্ঞীরও রূপ বদলাইয়াছে। তবু কিন্তু অপরূপ। অতি সাধারণ একখানি নীলাম্বরী, ছোট একটি কাঁচপোকার টিপ, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুইটিতে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি, দীর্ঘ আঁখিপল্লবে সহৃদয় স্নেহচ্ছায়া। সঞ্জয়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আসুন, আসুন। ভাবলাম, বুঝি, রাগ ক'রে আসবেনই না। বসুন।

সঞ্জয় নীরবে আসন পরিগ্রহ করিল। কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। সঞ্জয় বসিতেই সে হাসিমুখে উঠিয়া গিয়া দেওয়াল-আলমারি হইতে মদের বোতল ও গেলাস বাহির করিয়া সম্মুখের তেপায়ার উপর রাখিল এবং বলিল, নিন খান'।

সঞ্জয়ের অধর দুইটি নড়িয়া উঠিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সে হাসিয়া অনুযোগভরে বলিল, ছি, ও-রকম মাতলামি করতে আছে? মদ খেলে ভদ্দরলোকের মত খেতে হয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়াই নিজেই সে মদ ঢালিতে লাগিল।

বাসন্তী রঙের স্বচ্ছ সফেন সুরা।

নিন।

সঞ্জয়ের রগের শিরাগুলি দপদপ করিতেছিল।

সে হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা লইল এবং পিকদানিতে সেটা উপুড় করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

তিন

কয়েকদিন পরে একখানি পত্র

তাহারই পত্র।

রাগ ক'রো না, ফিরে এস!

সঞ্জয় মুখ টিপিয়া একটা তিক্ত হাসি হাসিল। ঠিক করিল, যাইবে না। ও পাপকুণ্ড হইতে সরিয়া থাকাই ভাল।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না। গেল।

গিয়া শুনিল, এইমাত্র সে বাহির হইয়া গিয়াছে। জনৈক বড়লোকের বাগান-বাড়িতে জলসা আছে।

চার

পরদিন গেল!

সেদিনও দেখা পাইল না।

তাহার পরদিনও সে যাইত, কিন্তু একটা টেলিগ্রাম পাইয়া বাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। বাবা মারা গিয়াছেন।

দুই মাসের পূর্বে ফিরিতে পারিল না। ফিরিয়া আসিয়াই কিন্তু আবার গেল। গিয়া শুনিল, সে অন্য ঠিকানায় গিয়াছে।

ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না।

পাঁচ

সহসা একদিন ঠিকানা মিলিল।

প্রকাণ্ড বাড়ি।

প্রকাণ্ড গেট।

সঞ্জয় ঢুকিতে গেল, পারিল না।

দারোয়ান বলিল, হুকুম নেহি হ্যায়।

ছয়

দুই বৎসর পরে।

ত্রিশ টাকা বেতনে দীন কেরানী সঞ্জয় অফিস হইতে বাহির হইয়া সহসা একদিন দেখিল—দেওয়ালে দেওয়ালে, কাগজে তাহার ছবি!

সিনেমা হাউসের সম্মুখে অসম্ভব ভিড়।

লোকে লোকারণ্য।

সঞ্জয় অতি কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু টিকিট পাইল না। তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই, তাই দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট-নীতি-অনুসরণকারী অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিকৃশাওয়ালা তাহার পিছু লইল।

রিকৃশা চাই বাবু, রিকৃশা ?

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়—ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিকৃশা চড়েন নাই অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিকৃশাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইলে বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম্‌, ডিভিশন অব লেবর, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরী, জমিদারী, অনেক কিছু নিমেষের মধ্যে খেলিয়া গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট! হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিকৃশাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই। কোথায় যাবেন ?

ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি ?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিক্‌শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই ?

আমি রিক্‌শা চড়ি না।

কেন ?

রিক্‌শা চড়া পাপ।

ও ? তা আগেই বলতে পারতেন।

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞা মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নাম

আমাদের পাড়ায় নবাগত যতীনবাবু লোকটিকে এক হিসাবে অভদ্রই বলা চলে। সমাজের সাধারণ আইনকানুন মেনে কিছুতেই চলবেন না ভদ্রলোক! কোথায়ও নিমন্ত্রণ করলে যান না, পাড়ার কারও খবর নেন না, বাড়ীতে কেউ গেলে আপ্যায়িত হবার ভাব দেখান না, বরং ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ করেন, কেন

একটু বিরক্তই হয়েছেন। তবু আমরা প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাঁর বাড়িতে যাই এসব সত্ত্বেও এবং নিয়মিতভাবে চা পান ক'রে থাকি। যতীনবাবুর চরিত্রে যতই খুঁত থাক, তাঁর বাড়ির চা-টি একেবারে নিখুঁত। সেদিন বিকেলে আমরা যখন গেলাম—আমরা মানে, আমি মাধববাবু আর পুণ্ডরীকাক্ষবাবু, তখন তিনি আর একজনকার সঙ্গে যেন গল্প করছিলেন। ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হ'ল না। যতীনবাবুর যা স্বভাব, আমাদের দিকে এক নজর চেয়ে দেখলেন মাত্র, কিন্তু মুখের ফাঁকে যে একবার 'আসুন' বা 'বসুন' বলা তা একবারও বললেন না, গল্পই করে যেতে লাগলেন। তবু আমরা বসলাম।

যতীনবাবু বলছিলেন, ছেলেবেলা থেকেই ওই রকম। পাণ্ডাগিরি ক'রে বেড়াত ইস্কুলে, আর সেই সময়েই মদ খেতে শেখে বোধ হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না।

আমাদের হেমবাবুর ছেলে ফটকের কথা বলছেন বুঝি ?

যতীনবাবু এ কথার কোন জবাব দিলেন না, একটু হেসে সেই লোকটির দিকে চেয়ে ব'লে যেতে লাগলেন, তারপর তার বাপ তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অবশ্য ঠিক যে কেন ছাড়িয়ে নিলে তা বলা শক্ত, কিন্তু ছাড়িয়ে নিলে, ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দিলে বেহারের এক শহরে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ইতিমধ্যে ছোকরা কবিতা লিখতে শুরু করেছিল।

মাধববাবু পুণ্ডরীকাক্ষবাবুর দিকে চেয়ে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে বললেন, আমাদের জগার কথা বলছেন, বুঝছ না ? বার দুই আই. এ. ফেল ক'রে আমাদের তপোনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদীশ পরের পয়সায় মদ খেতে এবং সিনেমার কাগজে প্রেমের পদ্য লিখতে শুরু করেছিল, সম্প্রতি সে ছাপরায় গেছে মামার বাড়িতে। সুতরাং মাধববাবুর অনুমান খুব অসঙ্গত নয়। যতীনবাবু কিন্তু সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই করলেন না।

ব'লে যেতে লাগলেন—

বেহারে গিয়ে তার কাব্যরোগ হু-হু ক'রে বেড়ে গেল। বেহারে তার বাপ তাকে পাঠিয়েছিল আত্মীয়ের কাছে থেকে সেই আত্মীয়েরই কারবারে ওয়াকিবহাল করার জন্যে। ছোকরা কারবারের ধার দিয়েও গেল না, লম্বা লম্বা কবিতা লিখে মাসিক আর সাপ্তাহিকে পাঠাতে লাগল, আর বাকি সময়টা ঘরের কোণে ব'সে কাটাতে লাগল যতসব বাজে বই পড়ে।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, বাজে বই মানে, কি বই ?

দর্শন, কাব্য, সাহিত্য—এই সব আর কি অর্থাৎ ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে কোন বই নয়।

ইন্‌ডিগো সম্বন্ধে বই মানে ?

অর্থাৎ যে বই পড়লে ব্যবসার উপকার হ'ত। সেই আত্মীয় ভদ্রলোকের নীলের কারবার ছিল।

তারপর ?

তারপর আর কি, উত্যক্ত হয়ে উঠলেন আত্মীয়টি ক্রমশ—

চা এসে পড়ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিঙের কৌটা বার করলেন। ইন্‌ডিগো শুনেই আমরা বুঝেছিলাম, এ ভূগো নয়, আর কেউ। মাধব ভাবছিলেন, কে হতে পারে ?

যতীনবাবু বললেন, তারপর হ'ল এক কাণ্ড। কলকাতার এক সম্পাদক ডেকে পাঠালে ছোকরাকে, বললে তোমার প্রতিভায় আমি মুগ্ধ, তুমি এসে আমার কাগজের সহকারী সম্পাদক হও আর তোমার কবিতাগুলো ছাপিয়ে ফেল। ছুটল ছোকরা কলকাতায়, আর জুটল গিয়ে সাহিত্যিক-মহলে। অহিফেনের বটিকাটি গলাধঃকরণ ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, আমাদের ক্ষীরোদচন্দ্র আর কি! ক্ষীরোদের সঙ্গে এই ছোকরার একটু মিল ছিল অবশ্য ক্ষীরোদও একটা কাগজের সহকারী সম্পাদক হয়েছিল কিছুদিন।

যতীনবাবু বলতে লাগলেন, ছোকরা কিন্তু জমিয়ে ফেললে কলকাতায়—

যদিও যতীনবাবু পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরেও চান নি, তবু পুণ্ডরীকাক্ষ বললেন, তাই নাকি ?

খুব জমিয়ে ফেললে, সাহিত্যিক মহলে নাম তো হ'লই, অসাহিত্যিকরাও বলাবলি করতে লাগল তার বিষয়ে, ভাল একটা চাকরি জুটে গেল।

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, কি চাকরি ?

ইস্কুল-মাস্টারি।

তারপর ?

দিনকতক খুব নামডাকও হ'ল—খুব ভাল মাস্টার, খুব ভাল মাস্টার। কিন্তু অতিরিক্ত রকম বাহাদুরি করতে গিয়েই ম'ল ছোকরা—

কি রকম ?

ছাত্রদের সঙ্গে খুব বেশী রকম মাখামাখি শুরু ক'রে দিলে, ছাত্ররা হয়ে উঠল তার ইয়ার—

মাধববাবু চা-পানান্তে ময়লা রুমাল দিয়ে ঝোলা গোঁফ-জোড়া মুছছিলেন, তিনি এই কথায় একটু টিপ্পনী করলেন, আজকাল ছেলেদের ধরন-ধারণই ওই রকম। বুঝতে পেরেছি, আমাদের আশু মাস্টারের কথা বলছেন আপনি, ওর হিষ্ট্রি জানেন নাকি?

যতীনবাবু একটু হাসলেন মাত্র, কোন জবাব দিলেন না। আমাদের এখানকার স্কুলের নবাগত শিক্ষকটির বদনাম রটে ছিল, তিনি ছেলেদের সঙ্গে বড্ড বেশি মেশেন নাকি।

অপরিচিত ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, তারপর?

তারপর আর কি, চাকরিটি গেল। নানারকম বদনাম রটতে লাগল, গার্জেনরা ভয় পেলেন, ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে, কমিটি তাড়িয়ে দিলে—মানে, দিতে বাধ্য হ'ল।

ছেলেদের মতিগতি বিগড়ে যাবে! কেন?

ও ছেলেদের সঙ্গে মদ খেত, বলত, ধর্মটর্ম সেকেলে বন-মানুষের কাণ্ডকারখানা, এ যুগে ওসব অচল। বলত, কুসংস্কার তুলে দাও ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের গল্প করত, বেম্থাম, মিল আওড়াত।

তারপর?

এ দেশে আর কত 'তারপর' থাকবে, দিনকতক ভ্যারেণ্ডা ভেজে ভেজে ঘুরে বেড়ালে, বুড়োদের উপদেশ আর গালাগালি শুনলে, তারপর পট ক'রে একদিন ম'রে গেল।

ম'রে গেল? কেন কি হ'ল?

কলেরা।

মাধববাবু বললেন, বুঝেছি, নিপুর ভাগ্নের কথা বলছেন, সেও কলকাতায় মাস্টারি করছিল, একটু বখাটে-গোছেরই ছিল, বছরখানেক হ'ল মারা গেছে। নিপুর ভাগ্নের কথাই বলছেন, নয়?

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রতিবাদ করলেন, নিপুর ভাগ্নে মদ খেত না। মদ খেত আমাদের হিরে, মাস্টারিও করত, কিন্তু সে মারা গেছে টাইফয়েডে, আপনি বোধ হয় ভুল খবর শুনেছেন যতীনবাবু।

যতীনবাবু আবার একটু হাসলেন, জবাব দিলেন না। এমন অভদ্র লোক কদাচিৎ চোখে পড়ে।

অপরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে যতীনবাবু বললেন, শ্রদ্ধা হয় লোকটার ওপর।

অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন, এই আপনার গ্রেট ম্যানের গল্প?

নামটা চেপে রেখেছি বলে গ্রেট বলে মনে হচ্ছে না, নামটা আগে বললে প্রতি পদে গ্রেটনেস দেখতে পেতে! I hate you—I hate you all—

নামটা কি, শুনিই না?

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

চান্দ্রায়ণ

ট্রেন চলিতেছে।

কামরার মধ্যে চন্দ্রবাবু একা। আপাত-দৃষ্টিতে দ্বিতীয় লোক না থাকিলেও চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের মনের কথা স্তূপীকৃত। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিভিন্ন কালিতে, বিভিন্ন কাগজে নিবদ্ধ অজস্র লোকের সহস্র প্রকার মনোভাব। নীরব অথচ মুখর। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে··· অন্ধকার গভীর রাত্রি···স্বপ্নলোকে বিচরণ করিবার এই তো উপযুক্ত সময়। স্বপ্নাচ্ছন্ন নয়নে চন্দ্রবাবু একখিলি পান মুখে ফেলিয়া দিলেন। জরদার কৌটাটি ফতুয়ার পকেট হইতে বাহির করিয়া ঢাকনির উপর বার দুই তর্জনী আঘাত করিয়া তাহা খুলিলেন, বেশ খানিকটা জরদা তুলিয়া উর্ধ্বমুখে ধীরে ধীরে তাহা ব্যাদিত-আননে নিক্ষেপ করিলেন, জানালা খুলিয়া পিক ফেলিলেন। জানালাটি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া দিতে হইল—বেশ জোরে একটা হাওয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নবিষ্ট চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। চন্দ্রবাবু ধীরপ্রকৃতির মানুষ। তড়তড় করিয়া এটা উল্টাইয়া ওটা ভাঙিয়া ছটফট করিয়া বেড়ানো তাঁহার স্বভাব নয়। যাহা করেন, ধীরে-সুস্থে করেন। পাঁচখানি চিঠি বাছিয়াই রাখিয়াছিলেন। সব চিঠি পড়িবার সময় নাই··· চাকুরি করিতে হইবে তো। সময় থাকিলে চন্দ্রবাবু সব না হোক আরও অনেক চিঠি নিশ্চয় পড়িতেন। এসব বিষয়ে তাঁহার কৌতূহলী মন কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। খামের চিঠি খুলিবার বিবিধ কৌশল তিনি আয়ত্ত

করিয়াছেন। ইহার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার সঙ্গেই থাকে।

খামগুলি চন্দ্রবাবু একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর নিবিষ্ট চিত্তে শুরু করিলেন।

দুই

চন্দ্রবাবু যুবক নন, স্থবির বৃদ্ধও নন। বস্তুত, বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে মনুষ্যরূপী ঝুনা নারিকেল বলিয়া মনে হয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ঠিক কোন্ স্থানে তিনি অবস্থিত তাহা বলা কঠিন। চাকুরির খাতা অনুসারে তাঁহার বয়স আটচল্লিশ কিন্তু তাহা মিথ্যা কথা। কয় বৎসর যে তিনি কমাইয়াছেন তাহা জানাও শক্ত, কারণ সে খবর যাঁহারা জানিতেন, তাহারা কেহ বাঁচিয়া নাই। মুখ দেখিয়াও সঠিক কিছু বলা যায় না। দাড়ি-গোঁফ-জুলফিতে পাক ধরিবামাত্রই তিনি ক্ষুর ও কলপের সাহায্য লইয়াছেন। তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা মাধুরীর নিকট অপ্রতিভ হইবার লোক তিনি নন। কিন্তু বয়স যাহাই হোক, চন্দ্রবাবু রসিক ব্যক্তি। ঝুনা নারিকেলের অন্তরে শাঁস-জল আছে। তাঁহার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টিতে গুলিখোরসুলভ যে প্রাণহীনতা প্রতীয়মান হয়, তাহা স্বপ্নালুতারই ছদ্মবেশ। আকৈশোর রস-পিপাসু তিনি। ছন্দ মিলাইয়া কবিতা অবশ্য কখনও লেখেন নাই, ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে কখনও তৃপ্তি হয় না তাঁহার। কবিতা লিখিয়া কি হইবে? কবিতা করা কিংবা কবিতা অনুভব করা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে তাহার রসাস্বাদন করাই তো আসল কথা। তাহা তিনি বহুবার করিয়াছেন। মাসতুতো ভাই তেনা বাঁচিয়া থাকিলে বলিতে পারিত যে, আগ্রহভরে এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বাসরঘরে, অথবা নবদম্পতির শয়নকক্ষে কৈশোরকালে আড়ি পাতিতেন। চোরের মত চুপিচুপি উঠিয়া গিয়া কত বাতায়নতলে যে তিনি কান পাতিয়াছেন, কত ছিদ্রপথে যে চোখ রাখিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। যৌবনকালেও কবিতা করিয়াছেন অনেক। তাহার ইতিহাস তৎকালীন পরিচিত ডাক্তারেরা এবং তাঁহার বিগত দুই পত্নী জানিতেন। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভগবান চাকরিটিও জুটাইয়া দিয়াছেন চমৎকার!

আর. এম. এস.-এর সর্টার তিনি।

বহু কবিতা অনুভব করিবার সুযোগ মিলিয়াছে, মিলিতেছে এবং মিলিবে।

চিঠির ভিতরে কত জিনিসই যে দেখিয়াছেন! কত অদ্ভুত রকম মজা।

চিঠির কাগজে প্রকাণ্ড ডিগ্রীওয়ালা লোকের নাম ছাপা—মহা বিদ্বান লোক, কিন্তু স্ত্রীকে (অবশ্য, স্ত্রী কিনা ভগবানই জানেন!) এমন অশ্লীল ভাষায় চিঠি লিখিয়াছেন যে, তাহা উচ্চারণ করা যায় না। পড়িতে কিন্তু বেশ লাগে।

আগে আগে চন্দ্রবাবু মেয়েলী হাতের লেখা দেখিয়া পত্র খুলিতেন, এখনও দুই-একটা খোলেন, কিন্তু এখন চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে মেয়েরা তেমন রসাল চিঠি লিখিতে পারে না। প্রায়ই 'আমি ভাল আছি' 'তুমি কেমন আছ'-জাতীয় কথায় ভরতি। বড় জোর 'তোমার জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে, তুমি কবে আসিবে', 'আর শেষে সেই বাঁধি গৎ'—'চিঠির উত্তর দিও। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জেনো'—অজস্র বানান ভুল। 'চুমু নাও' মাঝে মাঝে পাইয়াছেন অবশ্য। কিন্তু অধিকাংশই বাজে। কখনও কোন রসবতীর দেখা যে পান নাই, তাহা অবশ্য সত্য নহে; সেই লোভেই এখনও দুই-একটা মেয়েলী হাতের লেখা খোলেন, কিন্তু কদাচিৎ সে রকম রসিকার দেখা পাওয়া যায়। অধিকাংশই বাজে। কি কি জিনিস কিনিয়া আনিতে হইবে, তাহারই লম্বা ফর্দ সেদিন পাইয়াছিলেন একটা। চিঠি নামমাত্র—সবই ফর্দ। স্বামীকে নয়, যেন বাজার-সরকারকে পত্র লিখিতেছে। মেয়েরা মজাদার চিঠি লিখিতে পারে না—ইহাই চন্দ্রবাবুর অভিজ্ঞতা।

খামের উপর পুরুষ-হস্তে মেয়ের ঠিকানা লেখা দেখিলে চন্দ্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠেন। পুরুষদের লেখা চিঠিতেই বস্তু থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য চন্দ্রবাবুকে হতাশ হইতে হইয়াছে—বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া অন্য ভাষা তাঁহার জানা নাই। পুরুষের লেখা মেয়েলী নামের চিঠি খুলিয়া হয়তো দেখিলেন, হিন্দী কিংবা অন্য কোন ভাষা। কিংবা হয়তো কোন পিতা কন্যাকে পত্র লিখিতেছেন, কিংবা পুত্র মাতাকে। আর এক জাতীয় বিশেষত্বহীন চিঠিও তিনি মাঝে মাঝে খুলিয়া ফেলেন যাহাতে বোঝাই যায় না যে, লেখকের সহিত উদ্দিষ্টা রমণীর ঠিক সম্পর্ক কি। কিন্তু এসব কথা বাদ দিলেও মোটের উপর পুরুষদের লেখা চিঠিতেই চন্দ্রবাবু বেশি মজা পাইয়াছেন। ভাল ভাল চিঠির অংশবিশেষ টুকিয়াও রাখিয়াছেন। পুরুষরা নির্লজ্জ—তাহারাই কলম ছুটাইতে জানে। তা ছাড়া তাহারা বেপরোয়া। পুরুষদের লেখা চিঠির ভিতরেই তিনি একবার একশত টাকার নোট একখানা

পাইয়াছিলেন। কে যেন লুকাইয়া প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইতেছিলেন নোট অবশ্য ওই একবারই পাইয়াছেন, কিন্তু ছবি পাইয়াছেন বহু। তাহার একটা অ্যাল্‌বামই ভরিয়া গিয়াছে, ফরাসী, জার্মানী, ইহুদী, ইংরেজ, জাপান, বাঙালী, উড়িয়া—কত জাতের কত ঢঙের কি ছবি সব! পুরুষদের লেখা চিঠিতেই যে প্রকৃত রসের সম্ভাবনা—এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহ! মেয়েলী হাতের লেখা চিঠিও মাঝে মাঝে ডাক লাগাইয়া দেয় অবশ্য। একবার একটা চিঠিতে ঠোঁটের ছাপ ছিল। রসের কথাও থাকে মাঝে মাঝে। তবু পুরুষদের লেখা চিঠির দিকেই চন্দ্রবাবুর ঝোঁক বেশি।

তিন

মেয়েলী হাতের লেখা প্রথম চিঠিখানি খুলিয়া চন্দ্রবাবু হতাশ হইলেন। তবু পড়িতেছিলেন—

"দিদি,

তোমার রিপ্লাই কার্ড গতকল্য পাইলাম। তুমি আমাদের রিপ্লাই কার্ড লেখ; ইহা তোমার পক্ষে লজ্জাকর না হইতে পারে কিন্তু ইহাতে আমাদের লজ্জা হয়। তোমার বোঝা উচিত যে, এখানে এখন সব দিক সামলাইবার মত লোক এক আমি ছাড়া আর কেহ নাই। বাবা কিছুই দেখেন না। সমস্ত হাঙ্গামা আমাকে একা পোহাইতে হয়। তা ছাড়া আমার চাকরি আছে। এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় পাই না। তবু তোমার চিঠি পাওয়ার দুই দিন আগেই গদাধরকে স্যাকরার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তোমার গহনা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সাত দিন পূর্বে যখন গিয়াছিলাম, তখন মাত্র কানপাশাটা হইয়াছিল। শনিবার আমার নিজে গিয়া পুনরায় দেখিবার কথা ছিল। কিন্তু আমার মোটে অবসর নাই—স্কুলের প্রাইজ লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছি গার্লস্ গাইডের সমস্ত ভার আমার উপর। তোমার রসিদটা আমি আজই তালুকদার মহাশয়কে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া গহনা ডেলিভারি লইবার ব্যবস্থা কর। কানপাশাটা আমি দেখিয়াছি, চমৎকার হইয়াছে। অন্যগুলির কথা বলিতে পারিলাম না। দেখিবার সময় নাই। তোমাকে মিনতি করিতেছি, এ রকম কড়া কড়া চিঠি লিখিয়া আমার মন খারাপ করিয়া দিও না।

ইতি—"নমিতা"

চন্দ্রবাবু চিঠিখানা একবার শুঁকিলেন। মৃদু আতরের গন্ধ আছে একটা চক্ষু বুজিলেন। কল্পনানেত্রে একটি স্ফুরিতাধরা রুষ্টা তরুণীকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মানসপটে অনিবার্যভাবে যে ছবিটি বারম্বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তাহা তাঁহার পরিচিত এক শিক্ষয়িত্রীর—গলার সাঁকি বাহির করা, শাঁকচুন্নী-মার্কা, শুঁটকো, কালো মূর্তি, গলার এবং গালের হাড় উঁচু, খাঁড়ার মত নাক—

মরুকগে।

চন্দ্রবাবু দ্বিতীয় পত্র খুলিলেন।

"সাবিত্রীসমানেষু

তোমার পত্র পাইলাম। তোমরা যদি একটু বুঝিয়া সমজিয়া না চল, তাহা হইলে এ বাজারে তো আমি গেলাম। চাউলের মন চল্লিশের ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, দাইলও অগ্নিমূল্য, তরিতরকারি, কয়লা সমস্তই তদ্রূপ। সোপস্টোন-মিশ্রিত আটার দাম নীলাম্বর বলিল, বারো আনা সের। সরিষার তেল দুই টাকা, ঘৃতের দাম জিজ্ঞাসা করিবার সাহসই নাই। অতি সাধারণ কাপড় দশটাকা জোড়া। তবু মাসের খরচ যথাসাধ্য কিনিয়াছি। সব নগদ দিতে পারিলাম না, নীলাম্বরের দোকানে অনেক ধার রহিয়া গেল। ধার না করিয়া উপায় কি? নবীনকে কুড়ি টাকা পাঠাইতে হইল। আমি একা আর কত পারি, বল? এমন দুঃসময়ে সায়া কি না পরিলেই নয়? হটাস্ করিয়া এক টাকা গজ মার্কিন ধারে কিনিয়া বসিলে! আমাকে তুমি নবাব খাঞ্জা খাঁ মনে কর নাকি? প্রত্যহ জুতার চোটে চাঁদির চটা উঠাইয়া মনিব আমাকে পাঁচ শতও নয়, হাজারও নয়, পঁচাত্তরটি টাকা দেয়, এ কথা তোমাদের কত বার মনে করাইয়া দিব? আমার হাড় মাংস কালি হইয়া গেল যে! অত দাম দিয়ে জরদা কিনিবারই বা কি দরকার? বাড়ির পাশে প্রফুল্লর দোকান হইয়া আমাকে ডুবাইবে দেখিতেছি—"

কি আপদ!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রবাবু পত্রটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। পুরা চার পৃষ্ঠা ধরিয়া ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে কেবল ওই একই কথাই লিখিয়াছে লোকটা।

তৃতীয় পত্রটিও পুরুষের হস্তাক্ষর।

ঠিকানায় নাম নীলিমা বসু। খামের রঙ গোলাপী। এ পত্রটিও চন্দ্রবাবুকে হতাশ করিল। নীলিমা পুরুষের নাম।

"নীলিমাবাবু,

আপনি যাইবার সময় ছুইটি জিনিস ফেলিয়া গিয়াছেন, হকি-ষ্টিক এবং সিগার-কেস। আপনার ইউরিন পরীক্ষার রিপোর্ট আজ আসিল, এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। চার পার্সেণ্ট সুগার আছে। কি সর্বনাশ—"

কচু খেলে যা।

বাজে চিঠি পড়িবার সময় নাই চন্দ্রবাবুর।

চতুর্থ পত্রটি খুলিলেন। এটি বেশ মোটা চিঠি। পুরুষের হস্তাক্ষর। খাম খুলিতেই একটি ছবি বাহির হইল। অদ্ভুত ছবি? নানা রকম পোস্টকার্ডে নানা রকম ছবি তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এ রকমটি কখনও আর চোখে পড়ে নাই! বাঃ! মুগ্ধনেত্রে চন্দ্রবাবু চাহিয়া রহিলেন! তাঁহার নিষ্প্রভ চোখের দৃষ্টি সহসা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল! ছবি রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে পত্রটি পড়িতে লাগিলেন! বাঃ বাঃ, চমৎকার! এতক্ষণে শ্রম সার্থক হইল! এইতো চিঠির মত চিঠি। বাহাদুর বটে ছোকরা। বাৎস্যায়ন, হাভেলক এলিস, ফ্রয়েড কিছু আর বাকী রাখে নাই। কি ভাষা, কি বর্ণনা! চন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার তিনি পত্রখানি পড়িলেন। তবু তৃপ্তি হইল না। একবার ইচ্ছা হইল, চিঠিখানি রাখিয়া দেন; কিন্তু তখনই আবার মনে হইল, না, সেটা অধর্ম হইবে। রাখিবার দরকার কি? ভাল জায়গাটা টুকিয় লই লেই হইল। এসব জিনিস টুকিতেও সুখ, মাধুরীকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে। মাধুরীর সঙ্গে অবশ্য তিন দিনের আগে দেখা হইবে না; কিন্তু তিন দিন পরে তো হইবে। ইতিপূর্বে অনেকবার তিনি এই ধরনের চিঠি টুকিয়া মাধুরীকে শুনাইয়াছেন। সহসা মাধুরীর মুখখানা মনের উপর ফুটিয়া উঠিল। মাধুরীটা কেমন যেন। কিছুতেই খুশী হয় না, কাছে গেলে প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকে। অথচ কি সুন্দর মুখখানি, হাসিলে গালে টোল পড়ে; কিন্তু কিছুতেই হাসিবে না। যাই হোক, এই চিঠির খানিকটা মাধুরীকে শুনাইতেই হইবে—দেখি, তাতে কি না এবার!

সাগ্রহে টুকিতে লাগিলেন।

টোকা হইয়া গেলে আদ্যোপান্ত পত্রটি আর একবার পড়িয়া চন্দ্রবাবু সেটি খামে পুরিয়া ফেলিলেন। ছবিটি অবশ্য বাহিরে রহিল!

এইবার পঞ্চম চিঠি।

ঠিকানা ইংরেজিতে টাইপ করা। নীল খাম।

এই ধরনের চিঠিতে অনেক সময় অপ্রত্যাশিত রকম মজা পাওয়া যায়। অনেক স্বামী টাইপ-করা খাম স্ত্রীকে দিয়া আসেন। টাইপিস্ট ছুঁড়ীগুলোও তাহাদের প্রেমাস্পদকে মাঝে মাঝে চমৎকার চিঠি লেখে। টাইপ-করা ঠিকানায় অনেক ভাল ভাল জিনিস মিলিয়াছে অনেকবার।

চন্দ্রবাবু আর এক খিলি পান এবং আর একটু জরদা মুখবিবরে প্রেরণ করিয়া অর্ধনিমিত-লোচনে ধীরে ধীরে চোয়াল নাড়িতে লাগিলেন। লালারসে মুখ ভরিয়া উঠিল। জানালা খুলিয়া আর একবার পিক ফেলিলেন। বাস্ রে, ভীষণ বিদ্যুৎ হাসিতেছে! জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ চিঠিটা যেন নেশার মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কি সাংঘাতিক বর্ণনা! ইহা পড়িলে মাধুরী এবার নিশ্চয়—

পঞ্চম চিঠিটা খুলিলেন।

"অনঙ্গ,

তুমি আসবে শুনে সুখী হলাম। তোমারই আশাপথ চেয়ে আছি। আর পারছি না। তুমি আমাকে নিয়ে যাও, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, যেখানে হোক নিয়ে যাও। তুমি যেখানে যেমন ভাবে রাখবে, সেইখানেই তেমনি ভাবে থাকব আমি। কেবল এ নরক থেকে উদ্ধার কর আমাকে। তুমি দেরি ক'রো না। বুড়োটা কাল সকালে ডিউটিতে বেরুবে—তিন দিন পরেই ফিরবে আবার। আশা করি কাল বিকেলে কিংবা পরশু সকালে এসে পড়বে। আমি তৈরী থাকব। আমার অসংখ্য চুম্বন নাও।

ইতি—

"তোমারই মাধুরী"

প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বাহিরে একটা বজ্র পড়িল।

নিমগাছ

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ!

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই—

কিম্বা ভেজে বেগুন-সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক···দাঁত ভাল থাকে।

কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হ'ন।

বলে—"নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না"।

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ—সে আর এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠল,—"বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি ··কি রূপ!

থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার ··এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ—"

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।

অশ্রুধারা

অন্ধকারে একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম মাঠে। সে-ও সঙ্গে ছিল না। তার অঙ্গসৌরভ, বলয়-নিক্কণ, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব করছিলাম। পাশাপাশি ছিল, অতিশয় কাছাকাছি। আমারও মুখে কথা ছিল না, তারও না। আলাপ বন্ধ ছিল না তবু। দু'জনেই কথা কইছিলাম। কিন্তু নীরবে। তার সমস্ত অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল আমার কল্পনায় তাই যখন নীরব ভাষায় সে আমাকে প্রশ্ন করলে—"আমাকে তুমি তো কখনও দেখ নি, তবু চাইছ কেন এত করে ?"

তখন আমি অসঙ্কোচে উত্তর দিলাম—"তোমাকে আমি জানি।"

"কি করে জানলে ?"

"কি করে তা জানি না, কিন্তু জানি।"

নিবিড়তর হয়ে উঠল অন্ধকার।

পাশাপাশি হাঁটলাম অনেকক্ষণ···কতক্ষণ মনে নেই। মনে হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।··সহসা তার আর একটা নীরব প্রশ্ন সঞ্চারিত হল আমার মনে।

"এত করে চাইছ যদি নিচ্চ না কেন ?"

"ধরা দিলে কই ?"

মদিরতর হয়ে উঠল তার অঙ্গ-সৌরভ।

মনে হল তার চকিত দৃষ্টির চাহনি বিদ্যুতের মতো চিরে চলে গেল, অন্ধকারকে। চতুর্দিকে বিদ্যুতান্বিত হয়ে উঠল ক্ষণকালের জন্য।

"সর্বদা ধরে রেখেছ, তবু বলছ ধরা দিই নি।"

"আমি যেখানে চাই সেখানে দাওনি।"

"কোথাও চাও ?"

"ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে।"

দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিঃশ্বাস! স্পন্দিত হয়ে উঠল অন্ধকার···মনে হল খুব কাছে সরে এসেছে···তার চোখের জল গালে পড়ল আমার···এক ফোঁটা জল···বরফের মতো ঠাণ্ডা···

সহসা সচেতন হলাম, বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ির দিকে ফিরলাম। সে-ও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি···সে-ও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে। সহসা

অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন·· তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ পেলাম মনে হল। পাশাপাশি ছুটে চলেছি। নির্জন পথ ঊর্ধ্বশ্বাসে পার হলাম নীরবে।—তারপর সুদীর্ঘ গলিটা। নীরন্ধ্র অন্ধকার। গলির শেষে আমার প্রকাণ্ড নির্জন বাড়িটা দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এখনই গ্রাস করবে আমাকে। দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলাম। সে-ও উঠল। ঘরে ঢুকলাম, সে-ও ঢুকল। সুইচ্ টিপলাম তাড়াতাড়ি—তীব্র আলোয় ভরে উঠল চতুর্দিক। দেখি, কেউ নেই।

প্রজাপতি

নীল শেড দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েক দিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসেছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখা-পড়া করি ও শেড্‌টির উপর চুপ ক'রে বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছুদিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী।

বন্ধু সোমেশ্বর এসে প্রবেশ করলেন। ইদানীং প্রায় আসছে। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। ওর বোন বেলার সম্বন্ধে আজকাল যে একটু দুর্বলতা পোষণ করছি সেটা ও টের পেয়ে গেছে। বেকায়দায় পড়ে গেছি। সোমেশ্বর এসেই কাজের কথা পাড়লে একেবারে।

চুপ করে রইলাম।

"যা হোক একটা ঠিক করে ফেল ভাই"—তারপর একটু থেমে বললে—"শেষ পর্যন্ত বিয়ে তো করবেই, সবাই করে, বেলাকে যদি কর, আমি নিশ্চিন্ত হই। বেলা তোমাকে ভালও বাসে—"

সবই ঠিক—তবু চুপ করে রইলাম। আশা যখন বেঁচেছিল তখন তাকে বলেছিলাম যে আর কখনও বিয়ে করব না—এখন বুঝতে পারছি বিয়ে করতে হবে—বেলাকেই করতে হবে—দ্বিধাটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না কিছুতেই।

"চুপ করে আছ কেন? তোমার সত্যি যদি মত না থাকে আমি জোর করতে চাই না। খুলে বলো সেটা। তাহ'লে দ্বিজেনের সঙ্গে চেষ্টা করি। তুমি রাজী হলে অবশ্য আর কোথাও যাব না আমি। দ্বিজেনের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয় সে আপত্তি করবে না, তবে···"

ওই খোঁচা-গোঁফ-ওলা দ্বিজেন বেলাকে বিয়ে করবে!

ওর সে মতলব আছে না কি?

বললাম—"দ্বিজেনের কাছে যাবার দরকার নেই। আমি বিয়ে করব। তবে কিছুদিন সময় দাও ভাই।"

"তুমি কথা দিলে অপেক্ষা করতে পারি।"

চুপ ক'রে রইলাম।

"কথা দিচ্ছ তো?"

"দিচ্ছি।"

"বেশ। বেলাকে সুখবরটা দিয়ে আসি তাহলে।"

সোমেশ্বর চলে গেল।

এরপর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য।

হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল—"তাহ'লে আমার দায়িত্বও ফুরোল—আমিও চললাম।"

প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

মালাবদল

গভীর রাত্রি। আকাশে জ্যোৎস্নার পাথার। একরাশি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে একধারে। একরাশি শুভ্র চন্দ্রমল্লিকা যেন।

দ্বিতলের বাতায়নে বন্দনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে একা। আজ তার জীবনের পরম রাত্রি। স্বামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে। ঠিক প্রথম নয়, তবু প্রথম। বাসর ঘরের ভিড়, ফুলশয্যার অস্বাভাবিকতা, সমাজের কলরব সমস্ত চুকে গেছে। আজই প্রথম প্রকৃত মিলনরাত্রি।

···নিরালা জ্যোৎস্না-যামিনী নিবিড় হয়ে আসছে।

চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল—

ধাপে ধাপে সুর চড়িয়ে ডেকে উঠল পাখিটা। জ্যোৎস্নায় শিহরণ লাগল। খোঁপা থেকে বেলফুল পড়ে গেল একটা। ফুলটা হাসছে···।

আকাশের ছোট ছোট মেঘগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। চন্দ্রমল্লিকার রাশি নেই, একজোড়া রাজহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে পাশাপাশি। স্বপ্নলোক যেন।

স্বপ্নলোকই তো। বন্দনার স্বপ্ন সফল হয়েছে, অমন রূপবান, গুণবান স্বামী তাকেই পছন্দ করেছেন। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব ছিল না। কত রূপসী, কত বিদূষী, কত ধনীর দুলালী এসেছিল ভিড় করে। কিন্তু তার সুরের কাছে পরাভব মানতে হয়েছিল সবাইকে।

…একটা সূক্ষ্ম গর্ব গোলাপী নেশার মতো সঞ্চারিত হতে লাগল তার মনে। হবে না? মনে পড়ল কি কৃচ্ছ্রসাধনই না সে করেছে। সেতার, এস্রাজ, বীণ্। দিবারাত্রি গলা সাধা। তানপুরার সঙ্গে বড় বড় রাগ-রাগিণীর আলাপ। জীবনে আর তো কিছুই সে করে নি। গত ষোল বৎসর সুরের সাধনাই করেছে কেবল একাগ্রচিত্তে। সুরের ঝরণাতলায় দেখা হল স্বামীর সঙ্গে। স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল মানস-পটে ধীরে ধীরে। আজ রাত্রে বাগেশ্রী আলাপ করে শোনাবে সে। সেতারটা পাশের ঘরে এনে রেখেছে।

…ঝন্ করে শব্দ হল একটা। সেতারের তারটা ছিঁড়ে গেল নাকি? ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল বন্দনা। পাশের ঘরের দরজায় একটি তন্বী রূপসী দাঁড়িয়ে আছে। অপরূপ রূপসী।

"আমি চললুম।"

"কে আপনি?

"তোমার গানের সুর। এতদিন আমাকে নিয়ে তন্ময় হয়ে ছিলে তাই তোমার কাছে ছিলাম। এখন তুমি আর একজনের গলায় মালা দিয়ে তারই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমি চললুম।"

বন্দনাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল যেন। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বন্দনা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে আকাশের দিকে চোখ পড়ল। হংসমিথুন স্বচ্ছ-বাসনা একটি পরী উড়ে চলেছে যেন অজানার উদ্দেশ্যে। ওড়নাটা উড়ছে আকাশ জুড়ে…।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনের দিক থেকে চোখ দুটো টিপে ধরেছে। নিঃশব্দচরণে স্বামী কখন এসে প্রবেশ করেছেন সে টের পায় নি।

শেষ-কিস্তি

সেই সবে ডাক্তারি পাশ করেছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে এবং নিজের নৈপুণ্যে তখন অগাধ বিশ্বাস। রোগী একটা পেলেই হয়। সাজ-সজ্জা করে রাস্তার ধারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উন্মুখ হয়ে বসে থাকি। বুড়ো দীনু ডাক্তারেরই যত 'কল'—অথচ লোকটা যতদূর সে-কেলে হতে হয়—অতি-আধুনিক আবিষ্কারের ধার ধারেন না কোন। নাড়ী টিপে, জিব দেখে, পেট টিপে, অত্যন্ত অনাড়ম্বর পদ্ধতিতেই বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন, অথচ আমরা—যাক্ সে কথা। ওই দীনু ডাক্তারই আমাকে ডাকলেন একদিন তাঁর একটা 'কেসে'। সে 'কেসে' দু'জন নামজাদা ডাক্তার এসেছিলেন, আমাকে ডাকা হয়েছিল রাত জাগবার জন্যে। রোগীর কাছে সর্বদা একজন কৃতবিদ্য ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সবাই। রাত্রির ভারটা আমার উপর দিয়েছিলেন দীনুবাবু। সম্ভবত আমার দাদামহাশয়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বলে।

গিয়ে দেখি হৈ-হৈ ব্যাপার রৈ-রৈ কাণ্ড। আশপাশের যত নামকরা ডাক্তার সবাই সমবেত হয়েছেন। কোলকাতা থেকে শুধু দু'জন ডাক্তারই নয়, নার্সও এসেছেন। আমিও গিয়ে হাজির হলাম—অথচ ছেলেটির হয়েছে ম্যালেরিয়া—ম্যালিগ্‌নান্ট টাইপের অবশ্য—কিন্তু তবু, ম্যালেরিয়ার জন্যে এত ধুমধাম কেন বুঝলাম না। গ্রেন কয়েক কুইনিন দিলেই তো চুকে যেত।

সাড়ম্বর অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে মোটা মোটা ফি নিয়ে বড় বড় ডাক্তাররা বিদায় নিলেন। ঠিক হল একজন নার্স শয্যাপার্শ্বে মোতায়েন থাকবেন, আমি থাকব পাশের ঘরে, দরকার বুঝলে আমাকে ডাকা হবে, তাছাড়া দু'ঘণ্টা অন্তর নাড়ীও পরীক্ষা করতে হবে ঘড়ি ধরে—শ্বাস-প্রশ্বাসও গুণতে হবে। যাবার আগে দীনু ডাক্তার বলে গেলেন—"তুমি এখানে আসবার আগে, আমার সঙ্গে দেখা কোরো একবার—"

"আচ্ছা।"

রাত্রে সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে নানারকম ইনজেকশনের সরঞ্জাম ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লাম। দীনু ডাক্তার বাইরের ঘরে একা বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

"এস, ব'স। একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। পাল্‌স, রেস্‌পিরেশন গোনা ছাড়া আর যেন কিছু করতে যেও না তুমি। কোন ইনজেকশন ফিনজেকশন দিও না যেন—"

"পাল্‌সটা যদি খারাপ হয়, একটা ষ্ট্রিকনিন বা ক্যামফার ইন ইথার দিতে ক্ষতি কি—"

"কিছু ক'রো না—বদনাম হয়ে যাবে—"

মিনিট খানেক গড়াগড়া টেনে বললেন—"ও ছেলে বাঁচবে না—"

"ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন পড়ে গেছে, না বাঁচবার কোন কারণ দেখছি না তো—"

"কিছুতেই বাঁচবে না। এর আগে ছ'টা মরেছে। ওর ছেলে বাঁচবে না—"

"ছ'টা মরেছে!"

"হ্যাঁ। একটা ছেলে জন্মায়, সাত আট বছর বেঁচে থাকে, তারপর একটা কিছু হয় আর পট ক'রে মরে যায়। কোনবারই চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি। মরে যাবার বছর খানেক পরেই আবার একটা ছেলে জন্মায়—বছর কয়েক বাঁচে—তারপর অসুখ হয় আর মরে যায়। আমার হাতেই ছ'জন গেছে—এটাও যাবে! খরচ করাতে আসে খালি—"

বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে তামাক টানতে লাগলেন।

আমার মনে হল বুড়োর বোধহয় ভীমরতি হয়েছে। ছ'জন মরেছে বলে সপ্তমকেও যে মরতে হবে—একি একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি হ'ল! আর কিছু যদি নাই করতে হয়, তাহ'লে শুধু শুধু আমাকে একশ' টাকা দেবার মানে কি? আমার মনে যাই হোক বাইরে চুপ করে রইলাম। বুড়োর সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

গভীর রাত্রে নার্স এসে ডাকলে।

গিয়ে দেখি খোকার বাবা…এ অঞ্চলের বিখ্যাত ধনী বৃদ্ধ জগৎ সেন—বিছানার একধারে চুপ করে বসে আছেন। তাঁর দিকে কটমট করে চেয়ে খোকা বলে চলেছে—"ডাক্তারের একশ' টাকা আর নার্সের পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দাও না, আমি চলে যাই! কেন আর আটকে রেখেছ আমাকে, দিয়ে দাও

শিগ্‌গির, আমি আর থাকতে পারছি না—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—শিগ্‌গির দিয়ে দাও—"

বিছানা ছেড়ে ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল সে। দু'জনে মিলে চেপে ধরতে হ'ল তাকে।

শিগ্‌গির দাও—শিগ্‌গির দাও—"

যেন আট বছরের ছেলের কণ্ঠস্বর নয়—একজন প্রবীণ বুড়ো যেন খন-খন করে কথা বলছে! এ অবস্থায় হায়োসিন হাইড্রোবোম্ দেওয়া উচিত, না মরফিন দেওয়া উচিত ভাবছি—এমন সময় জগৎ বাবু এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে বলে উঠলেন—"নবীন বাবু দয়া করুন আমাকে—আমি সুদ-সমেত পাই পয়সা সব শোধ করে দিচ্ছি…আপনি যাবেন না, থাকুন, দয়া করুন আমাকে—"

"না, জোচ্চরের বাড়ি আমি থাকি না—"

"ওরে খোকা, বাবা আমার—"

আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন জগৎ বাবু।

খোকা আবার ঠেলে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল।

"শিগ্‌গির ফিস দিয়ে দাও এদের—"

"দিচ্ছি দিচ্ছি—"

আলুথালু বেশে উঠে পড়লেন জগৎ বাবু। তাড়াতাড়ি 'সেফ' খুলে টাকা বার করে আমাকে আর নার্সকে দিলেন।

খোকা যেন তৃপ্ত হয়ে চোখ বুজল।

সে চোখ আর খুলল না।

দুই ভিক্ষুক

বারাণসীর জনবহুল পথের ধারে অন্ধ ভিখারীটি বসে থাকে। পোড়া পোড়া কালো চেহারা। যেন ঝলসানো। অল্প কয়েকদিন হল এসেছে। কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এমন কি অন্যান্য ভিখারীরাও তার সম্বন্ধে অজ্ঞ। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয় না। রাস্তার এক ধারে ছেঁড়া কাপড়টি

পেতে সসঙ্কোচে বসে থাকে শুধু নীরবে। তবু ভিক্ষা মেলে। কাশীতে পুণ্যার্থীর ভিড়, পুণ্যসংগ্রহের জন্যই লোকে আসে এখানে, ভিক্ষা দিতে কার্পণ্য করে না। নীরব ভিখারীটির ছেঁড়া কাপড়ও ভরে ওঠে রোজ নানা জনের নানা দাক্ষিণ্যে। আধলা, পয়সা, ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি এমনকি আধুলিও পড়ে মাঝে মাঝে। গোটা টাকাও পড়েছিল একদিন একটা। খাবারও জমে নানা রকম। ভিখারী কিন্তু বসে থাকে নীরবে। অন্ধ চোখের দৃষ্টি নির্বিকার। গভীর রাত্রে রাস্তা-ঘাট নির্জন হলে ধীরে ধীরে ওঠে। কাপড়ের উপর সঞ্চিত সমস্ত জিনিস পুঁটুলি করে বেঁধে লাঠি ঠক ঠক করে গঙ্গার ঘাটে যায়—তার পর গঙ্গাগর্ভে ফেলে দিয়ে আসে সব। সে যা চায় তা পায় নি। কাপড় বিছিয়ে আবার বসে এসে রাস্তার ধারে। কতদিন বসে থাকতে হবে কে জানে!

দুই

সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পথ জনবিরল হয়ে এসেছে। আর-একটি ভিখারীর আবির্ভাব হল সেই পথে—ন্যুব্জদেহ স্থবির। গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, পায়ে ন্যাকড়া জড়ানো। মাথায় জট প'ড়ে গেছে। শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ। এই ভিখারীটি এসে প্রথম ভিখারীর কাছে দাঁড়াল এবং নিজের ভিক্ষার থলিটি তার কাপড়ে উজাড় করে ঢেলে দিলে। ঢেলে দিয়ে দাঁড়াল না, চলে যাচ্ছিল, সহসা প্রথম ভিখারী পুলকিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল তার। গায়ের রঙ টকটকে ফরসা হয়ে গেল—মাথার চুল সোনালী। চেহারাই বদলে গেছে একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার ক'রে উঠল, আমায় ক্ষমা ক'রে যাও মহারাজ, চলে যেও না। আমি ক্ষমা চাইছি, হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাইছি—

ন্যুব্জদেহ ভিখারী ঘুরে দাঁড়াল।

সাহেব বলতে লাগল, ক্ষমা কর আমাকে মহারাজ। কতদিন যে তোমার আশায় ব'সে আছি! অভিশপ্ত জীবন আর বইতে পারছি না। কত রৌরবে পুড়েছি, কুম্ভীপাকে ঘুরেছি। এখন আমার উপর আদেশ হয়েছে, ভারতবর্ষে ভিখারী জীবন যাপন কর গিয়ে, যদি কোনদিন তার হাতে ভিক্ষা পাও তবেই তোমার রূপান্তর ঘটবে। সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে, তা হ'লেই তোমার মুক্তি। আমায় ক্ষমা কর মহারাজ···

ম্লানদেহ ভিখারীর মুখও আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যাক, এতদিনে দেখা পাওয়া গেছে তা হলে!

মিস্টার হেস্টিংস? তোমাকে আমিও তো খুঁজছি জন্মজন্মান্তর ধরে তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি, তা তোমাকে না জানানো পর্যন্ত আমারও যে মুক্তি নেই!

ক্ষমা করেছ?

নিশ্চয়।

দেখতে দেখতে ম্লানদেহ স্থবির ভিখারী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হ'ল।

ওয়ারেন হেস্টিংস আর মহারাজ নন্দকুমার পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন।

একই ব্যক্তি

বাক্স খুলে তাঁর এই চিঠিখানা পেলাম।

শ্রীমতী অসীমাসুন্দরী দেবী

প্রাণাধিকাসু

দেখ তো, মিছি মিছি আমায় এত ভাবিয়েছিলে! কত রকম 'হয়তো' সে এসে আমায় চিন্তিত করে তুলেছিল তার আর ঠিক নেই। বড় চিঠি না লিখলে উত্তর দেবে না? কত বড? ক হাত লম্বা চওড়া চিঠি চাও? শেলী, রবীন্দ্রনাথই তো প্রিয় কবি জানতাম, হঠাৎ 'মিলটনি' ফরমাশ ক'রে বসছ কেন, বুঝতে পারছি না। যাক, চেষ্টা করব তবু।

রাগ করেছি কিনা? তুমি এ অবস্থায় কি করতে? রাগের চেয়ে আমার ভয়ই বেশি হয়েছিল কিন্তু। আমার গা ঘেঁষে আশঙ্কাও থাকে যে। আমি কয়েকদিন থেকে রোজই তোমার চিঠি আশা করছি। দু-একদিন পোস্টাফিস পর্যন্ত গেছি। চিঠি না আসাতে সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।

আচ্ছা, তোমার কাশি এখনও সারছে না কেন বল তো? কাশি একেবারে না সারা পর্যন্ত গান গেয়ো না। সেরে গেলেই গাইতে হবে কিন্তু। তুমি লিখেছ, ভগবান বোধ হয় দয়া করে বিয়ের সময়টুকু পর্যন্ত

গানের গলাটা একেবারে নষ্ট করে দেন নি। ভগবানের অসীম দয়া। আজকাল ভাবছেন, এখন আর গান দিয়ে কি দরকার···

তোমার অসীম দয়াময় ভগবানকে বলো, প্রভু, যা যা করবার তা তো করেছই, এখন দয়া করে তোমার দয়াটুকু ফেরত নাও, আমি একটু গান গেয়ে বাঁচি। না হয় তোমায় কিছু 'সিন্নি' দেব। তোমার এই করুণাময় ভগবানটির সঙ্গে আমার যে আলাপ নেই, থাকলেই আমিই আমার সিমুর জন্যে অনুরোধ করতাম একটু। সেতার বাজানোটা ছেড়ে দিলে সত্যি সত্যি? টাকার জন্যে ভাবছ কেন? তোমার টিউটারের মাইনে আমি যেমন করে হোক পাঠাব। লিখেছ পরে শিখব। কিন্তু আমার নিজের জীবনে দেখেছি, যেটা পরে শিখব বলে ফেলে রেখেছি তা আর শেখা হয় নি। টাকার জন্যে ভেবো না তুমি, অত সঙ্কোচেরও দরকার নেই, অবিলম্বে আরম্ভ কর সেতার।

···এখন রাত্রি অনেক। রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ হয়েছে। বারোটা বেজে গেছে বোধ হয়। 'বোধ হয়' বলছি, তার কারণ আমার প্রৌঢ় 'টাইমপীস'টি কেন জানি না, হঠাৎ সাতটা এগারো মিনিটে থেমে গেছে। কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। পথ-চলতি পথিক যেন হঠাৎ কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, কিংবা হঠাৎ কোন স্মৃতি এসে মনের গতি রোধ করে দিয়েছে ওর! থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে যেন। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে, এই ঘড়ি যখন দোকানদারের গ্লাস কেসে বন্ধ ছিল, তখন হয়তো কোন একটি সুন্দর সোনার হাতঘড়ি এর পাশে থাকত। দু'জনের ভাবও হয়েছিল হয়তো। হয়তো ভেবেছিল কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না। সুন্দর স্বচ্ছ কাচের ঘরটিতে পাশাপাশি দিনের পর দিন কেটে যাবে। কিন্তু হঠাৎ একদিন খরিদ্দার এসে হাজির। গরিব খরিদ্দার আমি, কিনে নিলাম 'টাইমপীসটি'কে। সোনার হাতঘড়ি গিয়ে অলঙ্কৃত করল কোন ধনীর মণিবন্ধ। আজ চাঁদনি রাত, আমার 'টাইমপীস' হয়তো তার সঙ্গিনীর কথা ভেবে ৭টা ১১ মিনিটের ঘরে থেমে আছে—খেয়ালই নেই যে, সময় বয়ে চলেছে। থাক্, একে আজ দম দিয়ে চালাব না। সোনার হাতঘড়িটিও কি এর কথা ভাবছে আজ?···অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে। আমার কিন্তু জ্যোৎস্নার চেয়ে ঘনঘোর বর্ষা বেশি ভাল লাগে। আজ মধু চাঁদনি প্রাণ উন্মাদিনী—সত্যি কথা, কিন্তু এর চেয়েও—

কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

এই অবস্থাটা আরও বেশী ভাল লাগে আমার। অনেক কবি চাঁদের সঙ্গে প্রিয়ার মুখের তুলনা করেছেন। আমার এতকাল প্রিয়া ছিল না, জিনিসটা প'ড়েই এসেছি, মন্দও লাগে নি। এখন কিন্তু সিমুর মুখের সঙ্গে চাঁদের কোন রকম সাদৃশ্য আছে ভাবলেও রাগ হয়। একটুও নেই, থাকতে পারে না। প্রথমত, চাঁদের আলো ধার-করা, সিমুর আলো সিমুরই। দ্বিতীয়ত, চাঁদ তার এই ধার-করা রূপ নিয়ে আকাশে সমস্ত রাত 'ধরনা' দিয়ে প'ড়ে আছে, খেয়ালী হাওয়ায় ভেসে-আসা যে কোন চলতি মেঘ তাকে জড়িয়ে ধরে যতক্ষণ খুশি থাকছে রূপালী নেশায় বিভোর হয়ে। চাঁদের এতটুকু লজ্জা-শরম নেই। এ যেন কোন পথচারিণী অভিসারিকা পাউডার-পমেড মেখে রূপের বেসাতি করতে বেরিয়েছে। এর সঙ্গে কি আমার সিমুর লজ্জা-মাথা সুন্দর মুখখানির তুলনা সম্ভব? আমি চোখের সামনে মুখখানি দেখতে পাচ্ছি যে। লজ্জা হলে আবার চোখে হাত দেওয়া হয়! আমার চোখে চোখে চেয়ে কতদিন কথা বল নি, মনে আছে? এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়েছিল তোমার। শুভদৃষ্টি পর্যন্ত কর নি—কম দুষ্টু নাকি তুমি! তোমার সঙ্গে চাঁদের তুলনা চলতেই পারে না। হ্যাঁ, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একটি কবি চাঁদের সম্বন্ধে বড় খাঁটি কথা বলেছেন। ভারতচন্দ্র। লোকটা সত্যিই প্রিয়াকে ভালবাসত।

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদ-নখে প'ড়ে তার কাছে কতগুলা॥

··আজ অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে।···কত কথা! এই গভীর রাত, চারদিকে জ্যোৎস্না, একা ঘর, বেচারী ঘড়িটি পর্যন্ত চুপ ক'রে চেয়ে আছে, তার মৌন-ব্যথিত দৃষ্টিতে যেন আমার মনের কথাটি ফুটে রয়েছে!

ঠিক এই মুহূর্তে তুমি আমার মনের কত নিকটে আছ··অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, অথচ দু'জনের দেহের মধ্যে প্রায় ৪০০ মাইল ব্যবধান। ব্যবধান সত্ত্বেও কিন্তু মনে হচ্ছে, তোমাকে পেয়েছি, এসেছ তুমি আমার কাছে। দেখতে পাচ্ছি, তুমি শুয়ে ঘুমুচ্ছ—এলোমেলো কয়েকটা চুল কাঁপছে কপালের

উপর…কান দুটি চুল দিয়ে ঢাকা…চোখ বুজে আমারই বালিশে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে—"

কুড়ি বছর আগেকার চিঠি।

একি শুধু কথাই? মনের কথা নয়? কি জানি, আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে। বিয়ের পূর্বে এঁর সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম, বিয়ে করে দেখলাম, ঠিক সে-রকমটি নন তিনি। কেমন যেন ভালমানুষ-গোছের। সর্বদাই আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করবার জন্যে ব্যস্ত। তারপর ক্রমশ কতদিন কাটাল। ক্রমশ কেমন বদলে গেলেন যেন। এখন মনে হচ্ছে, ওঁকে চিনতে পারি নি। অথচ একসঙ্গে কুড়ি বচ্ছর একাদিক্রমে এক ঘরে বাস করেছি। এক বিছানায় শুয়েছি। এঁরই সাত সন্তানের জননী আমি। পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম। কিন্তু এ কথা আজ স্বীকার করছি, আমাদের মনের মিল হয় নি। উনি যে-জগতের লোক ছিলেন, সে জগতে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম। চিঠিতে ওঁর যে কান্ত-কোমল রূপ ফুটে উঠেছে, আসলে কিন্তু সে-রকম লোক ছিলেন না উনি। অত্যন্ত রাশভারি কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন এবং নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন। কাছাকাছি কেউ জোরে কথা বললেও বিরক্ত হতেন, বকতেন, এমন কি, মারধোরও করতেন। ছেলেমেয়েরা এর জন্যে কত বকুনি খেয়েছে, ঝি-চাকর কতবার লাঞ্ছিত হয়েছে। অসুস্থ হলে পশুরা যেমন নির্জন স্থান খুঁজে আশ্রয় নেয়, কারও সান্নিধ্য পছন্দ করে না, ওঁরও অবস্থা অনেকটা তেমনই ছিল। এক-আধ দিন নয়, সারা জীবনই উনি এমনিভাবে কাটিয়েছেন। অথচ শরীর ওঁর বেশ সুস্থই ছিল। কেন যে এমন করতেন জানি না। মোট কথা, আমি বুঝতে পারি নি ওঁকে। একটা জিনিস কিন্তু বলব—খুব কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনে কখনও কোন অকর্তব্য করেন নি। আমাদের আধিভৌতিক কোন অসুবিধা ঘটতে দেন নি। যতদিন বেঁচেছিলেন, আমাদের কোন কষ্ট ছিল না মৃত্যুর পরও কোনও কষ্ট নেই। ছেলেদের মানুষ করে গেছেন, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে গেছেন, শহরে পাকা বাড়ি করে গেছেন, লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করে গেছেন। সেদিক দিয়ে আমার কোন কষ্ট নেই। তবে এতদিনের সঙ্গীকে হারিয়ে একটা অভাব বোধ করছি বইকি। আর একটা কথা। তিনি মুখে যদিও বলেন

নি কিছু কখনও (চিঠিতে অত কথা লিখতেন, মুখে কিন্তু বলতেন না কিছু) তবু এটা আমি অনুভব করতাম যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন। মৃত্যুদিনের সে ঘটনাটা ভুলব না কখনও।

ডাক্তারবাবু আসতেই বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়—দেখা করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি। চললুম।

কোথায় ?

কোথায় আবার। হুকুম এসেছে—

ওসব বলছেন কেন ? কোনও কষ্ট হচ্ছে ?

হ্যাঁ বুকের কাছে একটু। ওসব কিছু নয়। সিমু, তুমি একটা গান গাও।

কোন্‌টা গাইব ?

যেটা খুশি।

ডাক্তারবাবুর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, গান না।

ধরলাম, জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে···

গান শুনতে শুনতেই মারা গেলেন তিনি।

আজ নীলিমা আসবে। অত্যন্ত অধীর-চিত্তে তার প্রতীক্ষা করছি। নীলিমার অদ্ভুত ক্ষমতা, তার শরীরে নাকি প্রেতাত্মা ভর করে। যে-কোন লোকের প্রেতাত্মা সে নাকি আনতে পারে। সেদিন বকুলমাসীকে আনিয়েছিল নাকি। বকুলমাসীর গলার স্বর নাকি অবিকল শুনতে পেয়েছিল তার ছেলেরা।

নীলিমার চোখ-মুখ হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে গেল যেন।

একি, এ যে ঠিক তাঁরই দৃষ্টি। নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমাকে ডেকেছ কেন ?

অবিকল তাঁরই গলার স্বর।

একটু ইতস্তত করে বললাম, আমাকে চিনতে পারছ না ?

না।

একেবারেই চিনতে পারছ না ?

না।

আমাদের মনে পড়ে না তোমার ?

না।

একটুও না ?

না !

তাজমহল

প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম, তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম। প্রথম দর্শনের সে বিস্ময়টা এখনও মনে আছে। ট্রেন তখনও আগ্রা স্টেশনে পৌঁছয় নি। একজন সহযাত্রী বলে উঠলেন, ওই যে তাজমহল দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম।

ওই যে—

দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম। চুনকাম করা সাধারণ একটা মসজিদের মত—ওই তাজমহল ! তবু নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম ! হাজার হোক তাজমহল। শা-জাহানের তাজমহল; অবসন্ন অপরাহ্নে বন্দী শা-জাহান আগ্রা দুর্গের অলিন্দে বসে এই তাজমহলের দিকেই চেয়ে থাকতেন। মমতাজের বড় সাধের তাজমহল। আলমগীর নির্মম ছিলেন না। পিতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি তিনি···মহাসমারোহে মিছিল চলেছে, সম্রাট শা-জাহান চলেছেন প্রিয়া সন্নিধানে ? আর বিচ্ছেদ সইল না···শবাধার ধীরে ধীরে নামছে ভূগর্ভে···ওই তাজমহলেই মমতাজের ঠিক পাশে শেষ-শয্যা প্রস্তুত হয়েছে তাঁর। আর একটা কবরও ছিল ··হয়তো এখনও আছে ·ওই তাজমহলেরই পাশে। দারা সেকোর –

চুনকাম-করা সাধারণ মসজিদের মত তাজমহল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠে নি; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে

ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউবীথি থেকে নয়—মনে হল, যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মর-ধ্বনি নয়—যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মত স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল—সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনা-পটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহানমহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর অনেকদিন কেটেছে।

কোন্ কণ্ট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেলওয়ালা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মত সিগারেট-পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভাড়া নেয়—এ সব খবরও পুরানো হয়ে গেছে। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায়, উষায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে বহুবার বহুরূপে দেখেছি তারপর তাজমহলকে। এতবার যে, আর চোখে লাগে না, চোখে পড়েই না··· পাশ দিয়ে গেলেও নয়। তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল। আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু—গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে।

সেদিন 'আউটডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি, এক বৃদ্ধ মুসলমান গেট দিয়ে ঢুকল। পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা। ঝুড়ির ভারে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে বেচারীর। ভাবলাম, কোনও মেওয়াওলা বুঝি। ঝুড়িটা নামাতেই কিন্তু দেখতে পেলাম, ঝুড়ির ভেতর—মেওয়া নয়, বোরখাপরা মহিলা বসে আছে একটি। বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মত, আলখাল্লা পরা ধবধবে সাদা দাড়ি। এগিয়ে এসে আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে। নিতান্ত গরিব সে। আমাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে 'ফী' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে—

কাছে যেতেই দুর্গন্ধ পেলাম একটা। হাসপাতালের ভিতরে গিয়ে বোরখা খুলতেই (আপত্তি করেছিল সে ঢের) ব্যাপারটা বোঝা গেল ক্যাংক্রাম্‌ অরিস! মুখের আধখানা পচে গেছে। ডান দিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না। দূর থেকে পিঠে করে বয়ে এনে এ রোগীর চিকিৎসা চলে না। আমার 'ইন্‌ডোরে'ও জায়গা নেই তখন। অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই থাকতে বললাম। বারান্দাতেও কিন্তু রাখা গেল না শেষ পর্যন্ত। ভীষণ দুর্গন্ধ! অন্যান্য রোগীরা আপত্তি করতে লাগল। কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার এমন কি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে রাজী হল না। বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে। সকলের আপত্তি দেখে সরাতে হল বারান্দা থেকে। হাসপাতালের কাছে একটা বড় গাছ ছিল। তারই তলায় থাকতে বললাম। তাই থাকতে লাগল। হাসপাতাল থেকে রোজ ওষুধ নিয়ে যেত। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ইন্‌জেকশন দিয়ে আসতাম। এ ভাবেই চলছিল।

একদিন মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আমি কল থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা! মোটর ঘোরালাম। সামান্য চাদরের আচ্ছাদনে মুষলধারা আটকায় না। বেগম সাহেব দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে। কাঁপছে ঠকঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বললাম, হাসপাতালের বারান্দাতেই নিয়ে চল আপাতত। বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলে, এর বাঁচবার কি কোণও আশা আছে, হুজুর?

সত্যি কথাই বলতে হল, না।

বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি চলে এলাম।

পরদিন দেখি, গাছতলা খালি। কেউ নেই।

আরও কয়েকদিন পরে। সেদিনও কল থেকে ফিরছি—একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে বুড়োকে দেখতে পেলাম। কি যেন করছে বসে বসে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ। কি করছে বুড়ো ওখানে? মাঠের মাঝখানে মমূর্ষু বেগমকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে না কি? এগিয়ে গেলাম। কতগুলো ভাঙা ইট আর কাদা দিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে!

কি হচ্ছে এখানে মিঞা সাহেব ?

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।

বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর !

কবর ?

হাঁ হুজুর।

চুপ করে রইলাম। খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর জিজ্ঞাসা করলাম তুমি থাক কোথায় ?

আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়াই গরিব-পরবর।

দেখি নি তো কখনও তোমাকে। কি নাম তোমার ?

ফকির শা-জাহান !

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই ! আমার সমস্যা—দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক্‌। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া, গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথায় রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সে সব কিছু না করিয়া তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা ?

ঘরের কোণে কুঁজোয় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম, ঢক্‌ঢক্‌ করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

আর এক গ্লাস।

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

আর এক গ্রাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—

ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন।

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড, চার্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

অভিজ্ঞতা

তখন সরকারী চাকরি করি। একটি বড় শহরে সদর হাসপাতালের ভার লইয়া আছি, একদিন পাশাপাশি দুইটি কটেজে দুইটি রোগী ভরতি হইল। রোগী লইয়াই কারবার, বিব্রত হইবার কথা নয়, কিন্তু এ দু'জনকে লইয়া বেশ একটু বিব্রত হইলাম। বিব্রত হইবার প্রধান কারণ রোগীরা নয়, রোগীর পিতারা। একজন ডাক্তার, আমার খুঁত ধরিবার জন্য সর্বদা উদ্যত-মনোযোগ। আর একজনের পেশা কি তাহা তখনও জানিতাম না, লোকটি নিতান্ত গোবেচারী ভালমানুষ-গোছের। প্রত্যহ সন্ধ্যাহ্নিক ও গীতা-পাঠ করেন। বয়সে আমার অপেক্ষা অনেক বড়, মাথার চুল সব পাকা, কিন্তু আমি গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং যে দুই চারিটি প্রশ্ন করেন, সসঙ্কোচে করেন। অতিশয় ভদ্রলোক। ইঁহাকে লইয়া বিব্রত হইবার কারণ ইঁহার অতি-

নির্ভরশীলতা। ভদ্রলোক সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছেন। আমার সমস্ত নির্দেশ নীরবে বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া যাইতেছেন, কোনরূপ ব্যস্ততা নাই। অথচ রোগীটি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং রোগটি টাইফয়েড। দুইটিই টাইফয়েড, ডাক্তারবাবুর পুত্রটির চিকিৎসা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলাম, তবু কিন্তু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছিলাম না। তিনি অতি আধুনিক একখানি বিলাতি গ্রন্থ খুলিয়া তদনুসারে চলিতে চাহিতেছিলেন। মফস্বলের হাসপাতালে অত সব বন্দোবস্ত ছিল না। তিনি ক্রমাগতই আফসোস করিতেছিলেন, আহা কলিকাতায় লইয়া গেলেই হইত। কলিকাতা না গিয়াও কিন্তু কলিকাতার প্রায় সমস্ত সরঞ্জাম তিনি ডাকযোগে, তারযোগে রেলযোগে, লোকযোগে যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পত্রযোগে কলিকাতার দুই চারিজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশও আসিয়া পড়িয়াছিল। কর্মিৎকর্মা ভদ্রলোক মফস্বলীয় ত্রুটি সংশোধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেন নাই।

পাশের কটেজে বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। কোন অশোভন আড়ম্বর নাই, কোন অহেতুক ব্যগ্রতা নাই। একাই নীরবে নিপুণহস্তে সেবা করিয়া চলিয়াছেন। যাহা বলিতেছি বিনা মন্তব্যে নিখুঁতভাবে তাহাই করিতেছেন।

ডাক্তারবাবুটির অতি-বৈজ্ঞানিকতা এবং বৃদ্ধটির অতি-নির্ভরশীলতা দুইই আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

ডাক্তারবাবুটি আমার পূর্বপরিচিত, নিকটবর্তী একটি শহরে প্র্যাক্টিস করেন। তাঁহার ছেলেটি এখানে হোস্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়ে। হোস্টেলেই জ্বর হইয়াছিল। বাড়াবাড়ি হওয়াতে এবং অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিপজ্জনক মনে হওয়াতে আমারই পরামর্শে তাহাকে হাসপাতালে আনা হইয়াছে। ডাক্তারবাবুও সপরিবারে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমাকে দিনে অন্ততঃ দশবার গিয়া রোগী দেখিতে হইতেছে। একটু টেম্পারেচার বাড়িলে, একটু বেশিক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিলে, একটু অস্থির হইলে, একটু কাশিলে ডাকের উপর ডাক আসিতেছে। প্রতিবারই যাইতেছি এবং প্রতিবারই তাঁহার আফসোস শুনিতেছি—আহা, সময়মতো যদি কলকাতা নিয়ে যেতাম। তাঁহার স্ত্রীর আফসোস আরও বেশি। নীলরতন সরকার নাকি তাঁহার সইয়ের মায়ের বকুল ফুলের কি একটা হন।

বৃদ্ধটি এ অঞ্চলে আগন্তুক। ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। প্রশ্ন করিয়া

জানিয়াছিলাম তাঁহার এই পুত্রটির চাকরিব্যপদেশে তাহাকে লইয়া তিনি এখানে আসিয়া ধর্মশালায় উঠিয়াছিলেন। ছেলেটি সেখানেই জ্বরে পড়ে। জ্বর বাড়াবাড়ি হওয়াতে তাহাকে লইয়া তিনি হাসপাতালে আসিয়াছেন।

উভয়ক্ষেত্রেই টাইফয়েড তাহার অপ্রতিহত প্রতাপে এবং অনিবার্য গতিতে চলিতেছিল।

দুই

একদিন গভীর রাত্রিতে ডাক আসিল।

"শিগগির চলুন একবার, শিগগির।"

ডাক্তারবাবু আলুথালু বেশে নিজেই আসিয়াছেন।

"হেমারেজ শুরু হয়েছে। চলুন, শিগগির—"

প্রায় ছুটিয়াই গেলাম। হেমারেজ নিবারণের সর্বপ্রকার উপায় অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই কাণ্ড। দারুণ হেমারেজ।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাস করিলেন—"ভিটামিন সি অ্যামপুল আর আছে আপনার? আমার তো আর নেই, কোলকাতা থেকে যে ক'টা এসেছিল সব ফুরিয়ে গেছে··"

আমার ছিল না। বলিলাম।

"কংগো রেড (Congo Red)"।

"না।"

"এখানকার কোনও দোকানে নেই। খোঁজ করে দেখেছিলাম আজ বিকেলে। ভারি ভুল হয়েছে, কোলকাতা থেকে আনিয়ে রাখলেই হত!"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, "অঃ—এমন একটা ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা!"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "একটা মর্ফিন দিলে কেমন হয়?"

"মর্ফিন দিয়েছি, ক্যালসিয়াম দিয়েছি, সিরাম দিয়েছি, ষ্টিপটিসিন দিয়েছি, তারপর আপনার কাছে গেছি······

আর কিছু করিবার ছিল না। আইসব্যাগ পেটের উপর রাখাই ছিল। নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ডাক্তারবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, "কংগো রেড কোথাও পাওয়া যাবে না এখানে? ডাক্তার ভাদুড়ি তো খুব আপ-টু-ডেট্, তাঁর কাছে পাওয়া যাবে না?"

"বলতে পারি না"

"দেখি চেষ্টা করে।"

তিনি একটা মোটর বাইকও যোগাড় করিয়াছিলেন। একটু পরেই সেটা গর্জন করিয়া উঠিল। ফট্ ফট্ ফট্ শব্দে নিশীথ অন্ধকারকে সচকিত করিয়া কংগো রেন্ডের সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

·· মৃত্যুকালে পুত্রের সহিত দেখা হইল না।

ছেলেটির মা মাথার শিয়রে বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া মৃত্যুপথ-যাত্রীর কর্ণে একটি আশ্বাস-বাক্যও বর্ষিত হইল না। যতক্ষণ বসিয়াছিলেন কেবল হাহাকার করিতেছিলেন।

"এমন বেঘোরে তোর প্রাণটা যাবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি রে বাবা···"

একটু পরেই যে চিরকালের মতো সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহার কানের কাছে একটানা এই আর্তনাদ।

তাহার পরদিন যখন তাহারা চলিয়া গেল, আমাকে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিয়া গেল না। আমিই যেন অপরাধী।

তিন

দিন দুই পরে হাসপাতালের নার্স আসিয়া আমাকে জানাইল যে কটেজ ওয়ার্ডের দ্বিতীয় টাইফয়েড রোগীটির অবস্থাও ভাল নয়। নাড়ী বৈকালের দিকে আরও খারাপ হইয়াছে—গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া সত্ত্বেও। সকালে একবার দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সমস্ত দিন আর কোন খবর পাই নাই। নার্সের কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি গেলাম। গিয়া দেখি ছেলেটির মা আসিয়াছেন। মাথার শিয়রে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন। বৃদ্ধ তারস্বরে গীতার পঞ্চম অধ্যায় পাঠ করিয়া চলিয়াছেন। ছেলেটির শ্বাস উঠিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, এইবার শেষকৃত্য করুন। আপনার পায়ের ধুলো ওর মাথায় দিন আশীর্বাদ করুন। ওর সব যন্ত্রণার যেন অবসান হয় এইবার—সব গ্লানি যেন মুছে যায়"

আমি অপ্রস্তুত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

"আসুন ··"

আমাকে ইতস্তত: করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "ইতস্তত:

করছেন কেন, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পদধূলি তো দরকার এ সময়ে। নিন…জুতো খুলুন…দিন বেশ ভাল করে মাখিয়ে দিন ওর সমস্ত মাথায়… আসুন—”

তাহার পর স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “কাঁদবার সময় অনেক পাবে। এখন নাম শোনাও। ছেলে যাচ্ছে, ওর পায়ের দিয়ে দাও…”

এতদিন বহু মুমূর্ষু রোগীর গায়ে ছুঁচ ফুটাইয়া বহুরকমে তাহাদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সেদিন কিন্তু আর সে প্রবৃত্তি হইল না। হঠাৎ যেন দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইয়া গেল। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না। হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিলাম।

পরদিন বৃদ্ধ হাসপাতালে এক হাজার টাকা দান করিয়া চলিয়া গেলেন। চেকটা ভাঙাইতে গিয়া আবিষ্কার করিলাম যে, তিনি একজন বিলাতী ডিগ্রীধারী রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন।

গণেশ জননী

আমি পশু চিকিৎসা করি। যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে পশু চিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয় এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত জানাইতেছি যে, আমি সরকারী পশু-চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি করি। কমিশনার সাহেবের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য উদ্ধারক করিয়া, ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া ‘পাস’ করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়। মনুষ্য-চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মতো নির্ভরযোগ্য ‘প্র্যাকটিস’ আমাদের নাই। এই পরাধীন দরিদ্র দেশে থাকিবার কথাও নয়। তবু মাঝে মাঝে দু’একটা ‘কল’ জোটে। সেদিন এমনি একটি অপ্রত্যাশিত ‘কল’ জুটিল। একটি জরুরি তার পাইলাম। ‘আমার হস্তী অসুস্থ—অবিলম্বে চলিয়া আসুন।’ উল্লসিত হইলাম। মোটা টাকা পাওয়া যাইবে। যেখানে যাইতে হইবে তাহা ট্রেনযোগে সাত-আট ঘণ্টার পথ। এতদূর যাইতে হইবে, হাতীর অসুখ খুব কম করিয়া ধরিলেও দুইশত টাকা

'ফি' পাওয়া যাইবে। বাক্সপ্যাটরা-বাঁধিয়া সানন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। সামনেই পূজা...বিরাট পরিবার...ভগবান জুটাইয়া দিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে গন্তব্য স্থানে পৌছানো গেল। মফস্বল জায়গা, ছোট গ্রাম। স্টেশনটি ছোট। বেশি যাত্রী নাই। সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক। স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম। যিনি আমাকে স্টেশন হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া হাতল ঘুরাইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া সসম্ভ্রমে আমাকে প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি ভেটেরেনারি সার্জন?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন, আসুন, আমি আপনাকেই নিতে এসেছি।"

তাড়াতাড়ি আমার সুটকেশটা ভদ্রলোক তুলিয়া লইলেন। গোমস্তার মতো চেহারা। পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা, গায়েও মলিন জামা কাপড়, এক মুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়ি, পাঁচ-সাত দিন কামানো হয় নাই। আমি ভাবিলাম, যে জমিদারের হাতী ইনি বোধ হয় তাঁহারই কর্মচারী।...স্টেশন হইতে বাহির হইলাম। আশা করিতেছিলাম মোটর বা ওই জাতীয় কিছু একটা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু দেখিলাম সে সব কিছুই নাই। ভদ্রলোক সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিলেন। সাইকেলটি স্টেশনের বাহিরের দেওয়ালে ঠেসানো ছিল। তিনি আমার জন্য একটি ছ্যাকড়া গাড়ি ঠিক করিয়া দিয়া সাইকেলে আরোহণ করিলেন। খানিকক্ষণ পরে ছ্যাকড়া গাড়ি একটি বাড়ির সম্মুখে থামিল। গাড়ির জানাল হইতে মুখ বাড়াইলাম। স্বল্পালোকে যে বাড়িটা চোখে পড়িল তাহা কোন বড়লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হইল না। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ি। এ বাড়ির মালিকের হাতী পুষিবার কথা নয়। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিব কিনা ভাবিতেছিলাম এমন সময় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। সাইকেল যোগে তিনি আগেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সাগ্রহে আহ্বান করিলেন, "আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন—এই ঘরে—হ্যাঁ—" তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে গিয়া বসিলাম।

একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, এক নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা। ভদ্রলোক আমার

সুটকেশটি ঘরের এক কোণে নামাইয়া আমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন —"এক মিনিট বসুন, আমি একবার বাড়ির ভিতর থেকে আসি। দেখি, চা হল কি না!"

"আমার রুগী কোথায়?"

"এইখানেই আছে। আমারই হাতী…"

ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!

মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।

"আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।"

"হয়েছে কি?"

"বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ হয়েছে।"

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতীর খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি—" ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"হাতী পুষেছেন কি শখ করে?"

প্রশ্নটা না করিয়া পারিলাম না!

"আরে না মশাই। জুটে গেছল, গরীব গেরস্ত মানুষ, হাতী পোষবার শখ হতে যাবে কেন—"

চায়ের খালি পেয়ালাটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিলাম, "কি রকম?"

"সে কি আজকের কথা! আমার কিছু ক্ষেত খামার আছে বুঝলেন, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি করে খেতে হয় না। বছর দশেক আগে একদিন অনেক রাত্রে মাঠ থেকে ফিরছি হঠাৎ নজরে পড়ল একটা লোক মুখ গুঁজড়ে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে ঝুঁকে দেখলাম একেবারে অজ্ঞান। লোকজন ডেকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে এলাম। সেবা-শুশ্রূষা করাতে তার জ্ঞান হল। পরিচয় হতে জানতে পারলাম সে একজন কচ্ছি। ব্যবসাদার। ঘোড়া ছুটিয়ে মাঠামাঠি আসছিল, ঘোড়াটা তাকে ফেলে পালিয়েছে। পর দিনই তার লোকজন এসে পড়ল, ঘোড়াটিও পাওয়া গেল। আমাদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল সে। কয়েকদিন পরে দেখি একটা লোক ছোট্ট একটি হাতীর বাচ্চা নিয়ে এসে হাজির—সেই কচ্ছি ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। তিনি

নাকি হাতীর ব্যবসা করেন। একটি চিঠিও লিখেছেন—আপনারা আমাদের প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। হাতীর বাচ্চাটি দেখতে চমৎকার—তখন ছোট্ট ছিল—তুষ্টু তুষ্টু চোখ, ছোট্ট শুঁড়, খুব ভাল লাগল তখন। গিন্নি তো একেবারে আনন্দে আত্মহারা। বললে—ও আমার গণেশ এসেছে। বলেই একবাটি দুধ তার সামনে এগিয়ে দিলেন। বাস্, সেই থেকেই গণেশ থেকে গেল। আমাদের ছেলেপিলেও হয় নি, ওই গণেশই আমাদের সব।"

ভদ্রলোক চুপ করলেন। আমি সবিস্ময়ে শুনিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার এইটুকু বাসায় ওকে রাখেন কোথা?"

"উঠোনের দিকে জায়গা আছে অনেকখানি। তাছাড়া সব বাড়িটাই তো ওর—দরজা দেখছেন না—সব কেটে কেটে বড় করতে হয়েছে যাতে ও যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারে—আমরাই সসঙ্কোচে একধারে বাস করি।"

ভদ্রলোক অকৃত্রিম আনন্দে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"গণেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই, তাহলেই গিন্নি তুলকালাম করবে। একশ' বিঘে জমি আছে মশাই—যা কিছু হয় সব ওরই পেটে যায়—একটা হাতীর খোরাক, বুঝছেন না? পুজোর সময় ওর সাজ করিয়ে দিতে হয়—এবার গিন্নি একটা রূপোর ঘণ্টা করিয়ে দিয়েছে···স্যাকরার ধার শোধ করতে পারিনি এখনও···"

ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হাতী পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।

"খুব পোষ মেনেছে?"

"পোষ মেনেছে মানে! গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নী যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।"

"রান্নাঘরে ও ঢুকতে পারে?"

"আরে মশাই আমাদের ঘর কি আর মানুষের ঘর আছে, হাতীর ঘর হয়ে গেছে। এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট, এ ছাড়া আর দুটি ঘর আছে—এক রান্না ভাঁড়ার আর একটি শোবার—দুটোই বিরাট 'হল'—মানে 'হল

করতে হয়েছে···ওর জন্যে · বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না···এই দিক দিয়ে উনি বেড়াতে বেরোন, কেটে বড় করতে হয়েছে··"

"আপনাদের সব কথা বোঝে?"

"সমস্ত। মানুষ একেবারে। মান-অভিমান পর্যন্ত করে। এই যে খাওয়া বন্ধ করেছে, আমার বিশ্বাস সেটা অভিমানে।"

"কেন, কিছু হয়েছিল না কি?"

"বাগান থেকে ল্যাংড়া আম এসেছিল মশাই—মালী দিয়ে গিয়েছিল—আমি বাড়ি ছিলাম না, গিন্নিও পাড়ায় কোথা বেরিয়েছিলেন—এসে দেখেন একটি আমও নেই। সব গণশা খেয়েছে। তাই গিন্নি একটি চাপড় মেরে বলেছিলেন—রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটি রাখতে পার নি আমাদের জন্যে। সেই যে কোঁস করে গুম মেরে বসেছে, তার পর থেকে আর জল স্পর্শ করে নি। এরকম মাঝে মাঝে করেও। একটু বকলে ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়·· কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা খাওয়া বন্ধ আর কখনও করে নি···তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো—ভয় হয়ে গেছে আমাদের···"

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।

"চলুন দেখি গিয়ে।"

ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথ টব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।

"খাও লক্ষ্মী তো—লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু—"

গণেশ কুলার মত কান দুটি নাড়িয়া কোঁস করিয়া শব্দ করিল।

মহিলা আমার দিকে তাকাইয়া সজলকণ্ঠে বলিলেন, "ওর নিশ্চয় কোন অসুখ করেছে—ওকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি।"

দেখিলাম। রোগের কোন চিহ্ন পাইলাম না। গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ। ব্যাপারটা অভিমানই।

ফিরিবার সময় কর্তা বলিলেন—"আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু—

"অপরের কাছে হলে দু'শ টাকা নিতাম কিন্তু আপনার কাছে কিছু নেব না।"

"না, না, তা কি হয়! এত কষ্ট করে এসেছেন—"

"না, আমি নেব না—"

কিছুতেই লইতে রাজী হইলাম না। তখন তিনি বারান্দায় গিয়া দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়া যাও।"

বুঝিলাম গণেশজননী নিজের গহনা বন্ধক দিয়া আমার 'ফি' সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

অর্জুন মণ্ডল

এক

কড়া নাড়ার শব্দে বসলাম। শীতকালে এতরাত্রে কে এল আবার?

কে?

আমি, আমি—কপাট খোল।

খুললাম। সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বাললাম। দেখি খর্বকায় একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। আজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।

আমার চিঠি পাও নি নিশ্চয়?

না।

চিতুয়া পোস্ট করে নি তা হলে? শালা ডাকু। নিজে হাতে পোস্ট করলেই ঠিক হত, তাকে দেওয়াই ভুল হয়েছিল। ভুল ভুল—এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।

হঠাৎ অর্জুনকাকাকে চিনতে পারলাম আমি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরই চিনিয়ে দিলে তাঁকে। বহুদিনের যবনিকা স'রে গেল যেন।

অর্জুনকাকা! হঠাৎ এত রাত্রে কোথা থেকে?

তীর্থে যাচ্ছি। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই। শহরের জিনিসপত্রও কিনতে হবে কিছু। তোমাকে এত রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দিলাম বোধ হয়। আমার ধারণা ছিল, চিঠি পেয়েছ তুমি।

না, না তার জন্যে কি হয়েছে—

হয় নি কিছু। তোমার কাছে খবর না দিয়ে আসবার জোরও আমার আছে। কিন্তু চিঠুয়াটার কথাই ভাবছি। এই সব ছোটোখাটো ব্যাপার থেকেই মানুষের ভবিষ্যৎ বুঝা যায় কিনা—

অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। 'বুঝা' 'দিব' নিয়ে আগে কত হাসাহাসি করেছি আমরা।

ডাকের গোলমাল হয়েছে হয়তো।

না, ও কথা মানব না আমি।

অর্জুনকাকা বারান্দা থেকে নেমে গেলেন এবং গাড়ি থেকে নিজেই নিজের জিনিসপত্র নামাতে উদ্যত হলেন।

আপনি ছেড়ে দিন না, গাড়োয়ানই নামাবে এখন।

কেন ওকে বেশি পয়সা দিতে যাব মিছামিছি।

'মিছামিছি'ও অর্জুনকাকার বিশেষত্ব।

দাঁড়ান, আমার চাকরটাকে ডাকি তা হলে।

চাকরকেই বা ডাকবে কেন? আমার গায়ে জোর নাই না কি?

অবলীলাক্রমে নামিয়ে ফেললেন সব! বিছানা, প্রকাণ্ড একটা তোরঙ্গ, লোহার উনুনও একটা। চুক্তি-মাফিক গাড়োয়ানকে পাই-পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললেন, কোন্ ঘরটায় শুব?

বাইরের দিকে খালি ঘর ছিল একখানা। তাতে একটা চৌকিও ছিল।

সেইটেই খুলে দিলাম। অর্জুনকাকা বললেন, যাও, তুমি শুয়ে পড় এইবার। অনেক রাত হয়েছে। আমি এই চৌকির উপর নিজেই বিছানা বিছিয়ে নিচ্ছি। তুমি যাও।

আপনার খাওয়া-দাওয়া?

রাত্রে আমি কিছুই খাই না।

দু-চারখানা লুচি-টুচি ভেজে দিক না, কি আর এমন রাত হয়েছে?

বিছানা পাততে-পাততে অর্জুনকাকা বললেন, তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি?

চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি, বুঝলে?

ও।

নিজেই ভুগবে শালা। আমার কি!

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাও, আর রাত করো না, শুয়ে পড়।

সত্যিই কিছু খাবেন না?

দেখ, বেশি যদি পীড়াপীড়ি কর, বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে চলে যাব তাহলে।

বুঝলাম, অর্জুনকাকা বদলান নি। আর দ্বিরুক্তি না করে শুতে চলে গেলাম। শুলাম বটে, কিন্তু ঘুম এল না। অর্জুনকাকার কথাই ভাবতে লাগলাম। অর্জুনকাকার কথা বাবার মুখে খানিকটা শুনেছি—নিজেও দেখেছি খানিকটা, আশ্চর্য জীবন লোকটার! স্বাধীন দেশে জন্মালে দিগ্বিজয় করতে পারতেন। এ দেশে কিছু হল না। জাতে জেলে। চল্লিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসে হাটে বেচতেন। আমাদের বাড়ির সামনে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনেই হাট বসত। অর্জুনকাকার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটা এখনও আমার মনে আছে।

হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চীৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল, তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কি যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুনকাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুনকাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তারবাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।

বাবা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কি কেড়ে নিচ্ছে? কারা?

জমিদারের সিপাহীরা। মাছ কেড়ে নিচ্ছে আমার। রোজই নেয় কিছু কিছু। আজ এই বড় রুইটা নিতে যাচ্ছিল। দেব না বললাম তো মারলে এক চড়। আমিও ঘুরিয়ে এক চড় মেরেছি শালাকে।

গুরুতর ব্যাপার। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের বিরুদ্ধে সামান্য জেলের এই বিদ্রোহ হেসে উড়িয়ে দেবার মত তুচ্ছ ঘটনা নয়। বাবা একটু বিব্রত হলেন। সামান্য অবাধ্যতার জন্য এই জমিদার একজন গরিব প্রজার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছেন কিছুদিন আগে।

আচ্ছা, তুমি চুপ করে বস এইখানে।

বাবার পা ছেড়ে অর্জুনকাকা এক কোণে বসলেন গিয়ে। সিপাহী দুজনও এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, এর মাছ কেড়ে নিচ্ছিলে কেন তোমরা ?

এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই চাহিয়ে !

নেহি দেগা—কোণ থেকে গর্জন করে উঠলেন অর্জুনকাকা।

সিপাহীদের চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

ডাক্তার বলে বাবাকে ইতর ভদ্র সকলেই খাতির করত। তাই সিপাহীরা আত্মসম্বরণ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবা সিপাহীদের বললেন, আচ্ছা, তোমরা যাও। তোমাদের মালিককে যা বলবার আমি বলব। ওকে তোমরা কিছু বলো না এখন।

সিপাহীরা চলে গেল।

জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাপ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেশাই এ রকম করে থাকেন। অর্জুনকাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অত বড় দুর্ধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তারবাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো! উঃ বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস। বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা একদিন এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন আবার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।

কি বল ?

আমি কিছু লিখাপড়া করতে চাই! আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

এইবার বাবার তাক লাগল।

তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?

আমার স্ত্রী। আমার জমি-জমা কিছু আছে, আমার স্ত্রীর ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোন রকমে। আমিও রোজগার করব কিছু।

কটি ছেলেপিলে তোমার?

সাতটি মেয়ে, ছেলে নাই।

বাবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুনকাকার চোখে জলন্ত আগ্রহ দেখে হাস্য সংবরণ করতে হল তাঁকে।

পড়াশোনা করবে, সে তো ভাল কথাই। কিন্তু করবে কি করে? স্কুলে তো আর নেবে না তোমায়—

নেবে না?

এ বয়সে কি আর স্কুলে নেয়!

তবু আমি পড়ব। আপনি যদি একটু দয়া করেন, তা হলে হয়।

কি করব বল?

আপনার চরণে যদি আশ্রয় দেন একটু। আপনার হাতায় আ ছোট কুঁড়ে বেঁধে থাকব, আর আপনার ছেলেদের কাছেই পড়ব, তাদের পুরো বই-টই নিয়ে—

বাবা একটু চুপ করে রইলেন। অর্জুনকাকার আগ্রহ দেখে তাঁকে তিনি নিরস্ত করতেও পারলেন না, অথচ এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাবে সায় দিতেও কেমন যেন লাগছিল তাঁর। একটু চুপ করে থেকে দ্বিধাভরে শেষে বললেন, বেশ, পার তো আমার আপত্তি কি!

তার পরদিন বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে অর্জুনকাকা এসে পড়লেন, দেখতে দেখতে ছোট কুঁড়েঘরটি বানিয়ে ফেললেন। আমরা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, আর সেই দিন থেকে তিনি হলেন আমাদের অর্জুনকাকা। আমাদের যে মাস্টারমশাই পড়াতেন, তিনিই অর্জুনকাকার অক্ষরপরিচয় করিয়ে হাতেখড়ি দিয়ে দিলেন। আমাদেরই প্রথম ভাগ এবং ফার্স্ট বুক নিয়ে তাঁর পড়া শুরু হয়ে গেল। কিন্তু দেখতে দেখতে আমাদের ছাড়িয়ে গেলেন তিনি।

অর্জুনকাকা খুব ভোরে উঠতেন—এত ভোরে যে, আমরা টেরই পেতাম না। আমরা উঠে দেখতাম, তিনি কাজে বেরিয়ে গেছেন। মজুরের কাজ করে বেড়াতেন দিনের বেলায়; যা পেতেন স্ত্রীকে দিয়ে আসতেন।

ফিরতেন বিকেলে। বিকেলে এসেই তিনি খাওয়া-দাওয়া করতেন। প্রায়ই রাঁধতেন না! দই চিঁড়ে কলা প্রিয় খাদ্য ছিল তাঁর, ছাতু খেতেন কখনও কখনও। খেয়ে উঠেই হাতের লেখা লিখতেন দিনের আলো থাকতে থাকতে। সন্ধ্যা হলে প্রদীপ জেলে পড়তে বসতেন। রেড়ির তেলের বেশ বড় একটা প্রদীপ ছিল তাঁর। ভোরে কাজে বেরোবার আগে তিনি যে পড়াটা পড়তেন, তা আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যে ভাবে পড়তেন, তার থেকে তা আন্দাজ করে নেওয়া অসম্ভব ছিল না। শিরদাঁড়া একটু বেঁকতে দেখি নি। টেবিল চেয়ার ছিল না, আমাদের মত চাপটালি খেয়েও বসতে পারতেন না তিনি, উবু হয়ে বসতেন। সামনে থাকত একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স, তার উপর খবরের কাগজ পাতা। তাতেই একটি ছোট ইটের উপর তিনি প্রদীপটি রাখতেন। সেই কেরোসিন-কাঠের বাক্সটি একাধারে ছিল তাঁর টেবিল এবং শেল্ফ। নীচের ফাঁকটায় তাঁর বই খাতা দোয়াত কলম থাকত। কি সুন্দরভাবে যে গুছিয়ে রাখতেন সেগুলিকে! খাগের কলমটি, পেন্সিলটি নিখুঁতভাবে কাটা। আমার পেন্সিল-কলমও তিনিই কেটে দিতেন। পিতলের দোয়াতটি ঝকঝক করত। প্রত্যেক বইয়ে কি সুন্দর মলাট দিতেন!

কিছুক্ষণ পড়বার পরই কিন্তু ঘুম পেত তাঁর। কিন্তু ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করবার লোক অর্জুনকাকা নন। উঠে চা করতেন ঘুঁটের উনুন জেলে। ঘুঁটের ধোঁয়ায় শুধু ঘুম নয়, মশাও পালাত। একটি ঘটি চা খেতেন তিনি—এক-আধ কাপ নয়। রাত্রে আর কিছু খেতেন না। চা খেয়ে আবার শুরু করতেন পড়া। কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুল ধরত। চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধ'রে টানতেন। ঠাস ঠাস করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও। আমরা হাসতাম। কারণ অর্জুনকাকার সাধনার ঠিক স্বরূপটি বোঝবার মত বয়স হয় নি আমাদের তখনও। এখন বুঝতে পারি, পুরাকালে শিক্ষার্থী যেমন গুরু-গৃহে বাস করে অধ্যয়ন করত, অর্জুনকাকাও তেমনি আমাদের বাড়িতে থেকে পড়তেন। অর্জুনকাকার গুরুস্থানীয় হবার মত লোক অবশ্য কেউ ছিল না, তিনি নিজেই নিজের গুরু ছিলেন, কিন্তু তাঁর মনোভাব ছিল সেকালের বিদ্যার্থীদের মত। ও-রকম নিষ্ঠা আর কোথাও দেখি নি। মাঝে মাঝে দু-এক দিনের জন্য বাড়ি যেতেন অবশ্য, কিন্তু তা দু-এক দিনের জন্যই। মাসের অধিকাংশ দিনই পড়াশোনা

করতেন তাঁর কুঁড়েঘরে বসে। এইভাবে পড়ে বছর দেড়েকের মধ্যে বাংলায় 'সীতার বনবাস' এবং ইংরেজীতে 'রয়েল রীডার নম্বর ফোর' পর্যন্ত পড়ে ফেললেন তিনি, আরও শিখলেন কিছু কিছু। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ত্রৈরাশিক বেশ কষতে পারতেন। তাঁর উৎসাহ দেখে স্কুলের মাস্টার পণ্ডিত সবাই সাহায্য করতেন তাঁকে। অর্জুনকাকা বিনামূল্যে কারও সাহায্য নেবার লোক নন। নানাভাবে প্রতিদানও দিতেন তিনি। দইটা মাছটা কলাটা মুলোটা তো দিতেনই, সেবাও করতেন। কারও পা টিপে দিতেন, কারও কাপড় কেচে দিতেন, কারও বাজার করে দিতেন, কিছুতেই আপত্তি ছিল না তাঁর।

এইভাবেই হয়তো আরও কিছুদিন চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে সব ওলটপালট হয়ে গেল। হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এক সাহেব সিভিল সার্জন এলেন একদিন। সকালে স্টেশনের কুলি তাঁর জিনিসপত্র বয়ে এনেছিল, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ফেরবার সময় জিনিস বইবার লোক পেলেন না সাহেব। হাসপাতালের চাকরটা অসুস্থ, আমাদের চাকরও বাড়ি গিয়েছিল। কাছে কুলি-জাতীয় কাউকে না পেয়ে সাহেব (এবং বাবাও) বিপন্ন বোধ করছিলেন। স্টেশন বেশ একটু দূরে, সাহেবের মালও নেহাত হালকা নয়। অর্জুনকাকা নিজের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিলেন। অবসর সময়ে তিনি বসে বসে দড়ি পাকাতেন এবং প্রতি হাটে তা বিক্রি করতেন। বাবা গিয়ে তাঁকে বলতেই তিনি সাহেবের জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, এগিয়ে এসে সাহেবকে সেলাম করে বললেন—Yes sir, I shall carry your things most gladly। অর্জুনকাকার মুখে সাহেব ইংরেজী শুনবেন প্রত্যাশা করেন নি, শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বাবার মুখে অর্জুনকাকার ইতিহাস এবং অধ্যবসায়ের গল্প শুনে আরও মুগ্ধ হলেন। স্টেশনে মালপত্র নামাতেই সাহেব তাঁকে একটি টাকা দিতে গেলেন। অর্জুনকাকা পুনরায় সেলাম করে বললেন—Thank you sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.

বিস্মিত সাহেব প্রশ্ন করলেন, Why ?

You are our Doctor Babu's honoured guest.

সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে গেলেন। অর্জুনকাকা জিনিসপত্র নামিয়ে

চলে যাবার পর সাহেব বাবাকে বললেন, ও যদি চায়, আপনি ওকে অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে ভরতি করে নিন। কিছুদিন পরে পরীক্ষা দিয়ে পাকা ড্রেসার হোক। তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।

খবরটা শুনে অর্জুনকাকা অবাক হয়ে গেলেন, একটু দমেও গেলেন। একাগ্রচিত্তে তিনি যে পথে সবেগে চলেছিলেন, হঠাৎ বাধা পেয়ে এবং সে বাধা দুরতিক্রম্য অনুভব করে (স্বয়ং ডাক্তারবাবু যখন তাকে ড্রেসার হতে বলেছেন তখন তা দুরতিক্রম্য ছাড়া আর কি!) অর্জুনকাকার এমন অদ্ভুত একটা ভাবান্তর হল যা প্রায় অবর্ণনীয়। হতাশা, জেদ, বাধ্যতা, আত্মসমর্পণ, ক্ষোভ এবং এই সবটার জন্য দায়ী যে অদৃশ্য শক্তি, তার বিরুদ্ধে আক্রোশ—সমস্তটা সমবেতভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে।

ইতিপূর্বে তাঁর মুখের এ-রকম ভাবান্তর আরও কয়েকবার লক্ষ্য করেছিলাম আমি; অর্জুনকাকা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর ঘরে একা থাকতেন, আমি মাঝে মাঝে ফুটো দিয়ে (তাঁর দরমার ঝাঁপে অসংখ্য ফুটো ছিল) তাঁকে লক্ষ্য করতাম। তাঁর মুখের এ-রকম ভাবান্তর হতে অনেকবার দেখেছি। এর চেয়েও বেশি অস্থির হতেও দেখেছি। হঠাৎ তাঁর চোখমুখ কেমন যেন হয়ে যেত, উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতেন, মনে হত, জিবটা যেন চিবুচ্ছেন—নাকটা খুব জোরে কুঁচকে খুব ঘন ঘন চিবুতেন মনে হত। ছোট একটা হাত-আয়না ছিল তাঁর। চালে গোঁজা থাকত সেটা। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ সেইটে পেড়ে ভ্রূকুটিসহকারে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকেই চেয়ে থাকতেন খানিকক্ষণ। অতীত জীবনে যে সব দুরতিক্রম্য বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি, অন্যায়ভাবে নিয়তির কাছে যতবার পরাভূত হয়েছেন, তার সমস্ত পুঞ্জীভূত গ্লানি তাঁকে মাঝে মাঝে পাগল করে তুলত বোধ হয়। আয়নার দিকে চেয়ে নিজেই নিজেকে ভ্যাঙচাতেন। হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি পেতেন তাতে।

বাবার কথা শুনে বললেন, কাল থেকে ঘা ধোয়াব! সে কি! তিন-তিনখানা ডিকৃশনারি আনতে দিয়েছি আমি—

অত ডিকৃশনারি কি হবে?

মুখস্থ করব।

মুখস্থ করবে? কি হবে ডিক্‌শনারি মুখস্থ করে? তা ছাড়া অত পড়েই বা তোমার লাভ কি, পরীক্ষা তো তোমায় দিতে দেবে না।

দেবে না? কেন?

এই নিয়ম। প্রাইভেট্‌লি মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে। আর পারে শিক্ষকরা—তাও তিন বছর চাকরি করার পর। অর্জুনকাকা বললেন, শুনেছি হাই স্কুলে টেস্ট্‌ পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক দেওয়া যায়।

তা যায় বটে। কিন্তু তার পর আর পারবে না, কলেজে ভরতি হতে হবে। আই. এ. পাশ করতে বুড়ো হয়ে যাবে। তাতে লাভটা হবে কি? তার চেয়ে এইতেই লেগে পড়। কম্পাউণ্ডার হতে পার যদি কাজ হবে একটা।

অর্জুনকাকা চুপ করে রইলেন।

পরদিন থেকেই অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসারের পদে বাহাল হয়ে গেলেন তিনি। ড্রেসার করিম মিয়ার কাছে প্রথম পাঠ নিলেন ব্যাণ্ডেজ পাকাতে হয় কি করে। করিম মিয়ার খুব সুবিধে হল। ছাপোষা লোক তিনি। মুরগী ছাগল, গোটা দুই বিবি এবং গোটা বারো ছেলেমেয়ে নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে, হাসপাতালের কাজে মন দেবার অবসর পেতেন না তিনি। বাবার কাছে প্রায়ই বকুনি খেতেন। অর্জুনকাকাকে শাগরেদ পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি। অর্জুনকাকাই সমস্ত কাজ করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে ব্যাণ্ডেজ পাকানো, ছুরি কাঁচি পরিষ্কার, খাতায় রুল্‌ টানা, টেবিল ঝাড়া—সমস্ত হয়ে যেত। হাসপাতালের চাকরটার আসতে দেরি হলে তার কাজও করে দিতেন। কম্পাউণ্ডার হারাধনবাবুও প্র্যাক্‌টিস করবার সময় পেলেন। স্টক মিকশ্চার, স্টক মলম অর্জুনকাকাই করতে শিখে গেলেন অল্প কিছুদিন পরে। সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিষ্কার করতেন, লেবেল ময়লা হয়ে গেলে পরিষ্কার অক্ষরে লিখতেন সেগুলি। এমন কি বাবার হয়ে রিটার্নও করে দিতেন প্রত্যহ। অর্জুনকাকা হাসপাতালের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠলেন দেখতে দেখতে। হাসপাতালের চেহারাই বদলে গেল। অর্জুনকাকার দৈনন্দিন কার্যক্রমও বদলে গেল অবশ্য খানিকটা। মজুরি খাটবার জন্যে আর বেরুতেন না। অ্যাপ্রেন্টিস ড্রেসার হিসাবে সিভিল সার্জন যে বেতন মঞ্জুর করেছিলেন, যদিও তা সামান্যই, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন তিনি। লেখাপড়া বন্ধ করেন নি,

বরং বাড়িয়েছিলেন। বাংলায় বঙ্কিম [illegible]
করে অনেক গ্রন্থাবলীই কিনে পড়েছিলেন তিনি। ইংরেজীতে রবিনসন ক্রুসো, গ্যালিভার্স ট্রাভলস্, পিলগ্রিমস প্রগেস জাতীয় বই কিনে শেষ করতে লাগলেন একটার পর একটা। ডিক্শনারি মুখস্থ করবার উদ্যমটা নিয়োজিত করতে হল ড্রেসারিবিষয়ক জ্ঞান আহরণে। কোর্স ছিল অবশ্য ছোট একখানা চটি বই। কিন্তু ওইটুকতেই সন্তুষ্ট থাকবার লোক অর্জুনকাকা নন। তিনি সেই বইটা আগাগোড়া মুখস্থ তো করলেনই, সে বিষয়ে আরও যে সব বই বাজারে ছিল তাও আনিয়ে পড়ে ফেললেন একে একে। এতে কিন্তু ফল শেষ পর্যন্ত ভাল হল না। কারণ সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন অন্য একজন লোক।

তিনি এতবড় একজন দিগ্‌গজকে পরীক্ষার্থীরূপে পাবেন আশা করেন নি। কোন কোন বিষয়ে অর্জুনকাকার জ্ঞান তাঁর চেয়েও বেশি—এটা বরদাস্ত করা শক্ত হল তাঁর পক্ষে। তিনি সহজ সরল উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু অর্জুনকাকা অনেক বই পড়েছেন, একই প্রশ্নের নানা বিচিত্র উত্তর জানা ছিল তাঁর। প্রত্যেক ব্যাণ্ডেজের উদ্ভব, উপযোগিতা, ইতিহাস, সুবিধা, অসুবিধা তন্ন তন্ন করে পড়েছিলেন তিনি। বড় বেশি কথা বলছে দেখে পরীক্ষক ধমক দিলেন। অর্জুনকাকা ধমকে নিরস্ত হবার লোক নন। রাত জেগে অনেক বই পড়েছেন, সমানে তর্ক করতে লাগলেন। পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করা ডাক্তারী লাইনে শ্রেষ্ঠতম অপরাধ। ফেল হয়ে গেলেন তিনি। ফেল হয়ে অর্জুনকাকা যেদিন ফিরে এলেন, সেদিনও ওইরকম মুখভাব দেখেছিলাম তাঁর। হতাশা জেদ ক্ষোভ এবং সমস্তটার জন্য দায়ী যে দুরতিক্রম্য নিয়তি তাঁর আক্রোশ —এই সবগুলো একসঙ্গে যেন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখভাবে, চোখের দৃষ্টিতে। সমস্ত দিন ঘর থেকে বেরুলেন না। মাঝে মাঝে সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠেছে, চালে গোঁজা আয়নাটা পেড়ে অতি কুৎসিতভাবে ভ্যাঙচাচ্ছেন নিজেকে। অবশ্য ওই একদিন মাত্র। পরদিন থেকেই আবার কাজে লেগে গেলেন পূর্ণ উদ্যমে। যেন কিছুই হয় নি।

পরের বার পাশ করলেন। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে স্কলারশিপও পেলেন। কিন্তু একটা মুশকিল হল। কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যে কটক যেতে হবে। পরিবার রেখে যাবেন কার কাছে? দিন কয়েকের ছুটি নিলেন। ছুটির পর ফিরে এসে কিন্তু তিনি যে খবর দিলেন তা অভাবনীয়।

পাশের গ্রামেই অর্জুনকাকার স্বজাতি বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিল এক ঘর। বেশ ভালো অবস্থা, ছোটখাটো জমিদারি আছে।

তাঁর সাত ছেলে। তিনি নাকি তাঁর সাত ছেলের সঙ্গে অর্জুনকাকার সাত মেয়ের বিয়ে দিতে চান। হাসপাতালে চাকরি হওয়াতে এবং আমাদের সম্পর্কে আসাতে অর্জুনকাকার একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল নিজেদের সমাজে। এ প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়ার কথা, কিন্তু অর্জুনকাকা এতে বিপন্ন বোধ করলেন।

এ এক মহা আফৎ হল!

অর্জুনকাকা 'আপদ'কে 'আফৎ' বলতেন।

বাবা বলতেন, আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হল। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে চলে যাও তুমি। মেয়েরা তোমার সুখে থাকবে। ওরা বড়লোক—

বড়লোক বলেই আমার আপত্তি। বড়লোক মানেই পাজি, বদমাস, চোর, লম্পট, লুচ্চা—

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন অর্জুনকাকা।

আপনি তো সব জানেন ডাক্তারবাবু এই জমিদার শালারাই দেশকে চুষে খেয়ে ফেললে। আমার কি হয়েছিল—আপনি তো সবই জানেন, আপনি না থাকলে আমাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলত শালারা।

সবাই খারাপ নয়। এরা লোক ভাল।

আপনি বলছেন?

অর্জুনকাকার মুখভাব আবার সেইরকম হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ। বড়লোকদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার ইচ্ছে নেই তাঁর, কিন্তু বাবা যখন এতে মত দিচ্ছেন তখন তা অমান্য করবার সাধ্যও নেই। দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি।

বাবা বললেন তোমার মেয়েদের যদি বিয়ে না দাও, তা হলে কার কাছে রেখে যাবে এদের? মাসখানেকের মধ্যেই তো কটক যেতে হবে তোমাকে।

তার জন্যে আমার ভাবনা ছিল না, আমার এক খুড়তুতো ভায়ের কাছে রেখে যাব ভেবেছিলাম। তাকে আনবার জন্যেই কসবায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে।

তোমার যা খুশি করতে পার। কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ে

দিয়ে যাওয়াই ভাল।—এই বলে বাবা উঠে গেলেন। অর্জুনকাকা চুপ করে বসে রইলেন। ক্রমশ তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হতে লাগল। চোখ দুটো নিষ্পলক হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পলক ফেলে জিবটা চিবুতে শুরু করলেন তিনি।

বিয়ের দিনও এক কাণ্ড ঘটল। অর্জুনকাকা তার জমিদার বেয়াইকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি গরীব মানুষ, বেশি বরযাত্রীর হাঙ্গামা বরদাস্ত করবার শক্তি নেই তাঁর, কুড়ি জনের বেশি বরযাত্রী যেন আনা না হয়। বিয়ের দিন দেখা গেল, পঞ্চাশটা ঢোল, কুড়িটা রামশিঙে, পনেরটা কাঁসি এবং দশটা শানাই সমভিব্যাহারে এক বিরাট জনতা চতুর্দিক সচকিত করে অর্জুনকাকার বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অর্জুনকাকা সোজা থানায় চলে গেলেন। দারোগাকে গিয়ে বললেন, আমার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, বাঁচান আমাকে। দারোগা সাহেব ঘোড়া ছুটিয়ে সত্যিই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন অকুস্থলে। ব্যাপারটা অবশ্য পরিহাসেই পর্যবসিত হল শেষ পর্যন্ত। অর্জুনকাকার বেয়াই শুধু লোকজনই আনেন নি, তাদের বসবার, শোবার, খাবার সমস্ত আয়োজনই সঙ্গে করে এনেছিলেন। অর্জুনকাকার বাড়ির সামনের মাঠে তাঁর প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছিল। অর্জুনকাকা কিন্তু এতে খুশি হলেন না। অপমানিত বোধ করলেন। ধনী-হস্তের এই অভিনব অস্ত্রে আহত হয়ে চুপ করে রইলেন। কারণ এ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলে না। গুম হয়ে বসে রইলেন কেবল। হয়তো নির্জনে মুখ-ভঙ্গি করে নিজেই নিজেকে ভেঙচেছিলেন, কিন্তু সে খবর আমরা জানি না।

মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল। অর্জুনকাকা নিজের স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কটক চলে গেলেন।

এরপর বছর-দুই অর্জুনকাকার কোন খবর পাই নি। মাইনার পাশ করে আমরা শহরের হাইস্কুলে গিয়ে ভরতি হলাম। অর্জুনকাকা কটকে কম্পাউণ্ডারি পড়ছেন, এইটুকু শুধু জানলাম। মাঝে কার মুখে যেন শুনেছিলাম, অর্জুনকাকা সেখানেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বছর দুই পরে অর্জুনকাকা হঠাৎ হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে তাঁর সাত জামাই। তাদের স্কুলে ভরতি করে দিয়ে গেলেন। আমাদের অনুরোধ করলেন, আমরা যেন একটু দেখা-শুনা করি। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বললেন, বলছি বটে, কিন্তু কিচ্ছু হবে না। বড় বিলাসী। আর আফৎ জুটেছে এক পিসী—

ট্রেনেই চলে গেলেন।

আমরা বোর্ডিঙে থাকতাম। অর্জুনকাকার জামাইরা একটা বাসা ভাড়া করে রইল। সঙ্গে এল পিসী। তিনিই হলেন গার্জেন। জমিদারি থেকে প্রচুর দুধ, দই, মাছ, ঘি, আম, কাঁঠাল সরবরাহ হতে লাগল, স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক তাদের প্রাইভেট পড়াতে লাগলেন, স্থানীয় মনিহারি দোকানটার বিক্রি বেড়ে গেল, অর্জুনকাকার জামাইদের নিত্য নূতন সাজ-সজ্জায় আমরা ঈর্ষান্বিত হতে লাগলাম। কিন্তু অর্জুনকাকা যা বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই হল। অর্থাৎ জামাইদের কিচ্ছু হল না। জামাইরা প্রমোশন পেলে না। একদিন হঠাৎ আবার শুনলাম অর্জুনকাকা এসেছেন। শুধু এসেছেন নয়, এসো গো-বেড়েন করছেন প্রত্যেকটি জামাইকে। বেচারাদের আর্তনাদে পাড়ায় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে নাকি! দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি বাইরের বারান্দায় ভাঙা আয়না চিরুনি স্নো, পাউডার, সিগারেট বাক্স, কয়েকটা শৌখিন জামা, শাল প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিকে একটা জানলা ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি, অর্জুনকাকা। পিছনে দু'হাত রেখে ক্রমাগত পায়চারি করছেন আর জিব চিবুচ্ছেন। মুখভাব ভয়াবহ। চুপি চুপি সরে পড়লাম। অর্জুনকাকা সেই দিনই চলে গেলেন। তার পরদিন জামাইরাও স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে চলে গেল। এ নিয়ে শুনেছি বেয়াইদের সঙ্গে ঘোরতর মনোমালিন্য হয়েছিল অর্জুনকাকার, কিন্তু বাবা মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিয়েছেন সব।

আমি ক্রমশ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলেজে ভরতি হলাম। তারপর আই এস-সি পাস করে গেলাম মেডিকেল কলেজে। অর্জুনকাকার খবর অনেক দিন পাই নি। এইটুকু শুনেছিলাম যে, তিনি কম্পাউণ্ডারি পাস করে ডিস্ট্রীক্ট-বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি করে বেড়াচ্ছেন। এবার ছুটিতে বাড়ি এসে দেখলাম, অর্জুনকাকা আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমার জন্যেই বিশেষ করে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কেন এসেছেন শুনে অবাক হয়ে গেলাম। আমার কাছে তিনি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মোকোলজি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিতে চান।

তুমি তো পড়ছ এসব, আমাকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য, বিপন্ন হলাম। কিন্তু অর্জুনকাকাকে নিরস্ত করার

করবেন এসব পড়ে ?

তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। আমার কথা শুনে বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে, যেন আমি হাস্যকর অদ্ভুত কিছু বলেছি একটা !

কি করব ? বাঃ !

একটু থেমে তারপর বললেন, শিখব। শিখতে দোষ কি আছে ? তা ছাড়া চাকরি করার আর ইচ্ছা নাই। সব শালা চোর ! প্র্যাক্‌টিস করব ঠিক করেছি। আমাকে ডাক্তারিটা ভাল করে শিখিয়ে দাও তুমি।

যতদিন বাড়িতে ছিলাম, অর্জুনকাকার সঙ্গে পড়তে হত। নিজের অক্ষমতায় লজ্জা হত আমায়। ওই বৃদ্ধের উৎসাহর সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারতাম না। প্রত্যহ রাত্রে এগারোটার শুয়ে ভোর চারটের সময় ওঠবার শক্তি ছিল না আমার। কিন্তু অর্জুনকাকা নাছোড়। রোজ ডাকাডাকি করে ঠিক তুলতেন আমাকে। কেবল দুপুরটা ছুটি পেতাম। অর্জুনকাকা সেই সময়ে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিতেন। খিল দিয়ে দিতেন ভিতর থেকে। আমি মনে করতাম, ঘুমোন বোধ হয়। একদিন জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পিছনে দু'হাত রেখে পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন সারা ঘরটা। জিব চিবুচ্ছেন। ক্ষোভ, দুঃখ, ঘৃণা, ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত মুখে। হাতে ছোট আয়নাখানা। মাঝে মাঝে সেটা তুলে ধরছেন মুখের সামনে আর ভ্যাঙচাচ্ছেন নিজেকে।

ছুটি ফুরোতে আমি পালিয়ে বাঁচলাম। কলকাতায় ফিরেই কিন্তু অর্জুনকাকার বড় স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠি পেলাম একখানা—অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মোকোলজি এবং মেটিরিয়া মেডিকা বিষয়ক বাংলা ভাষায় এবং সহজবোধ্য ইংরেজি ভাষায় লেখা যত বহি সংগ্রহ করিতে পার, অবিলম্বে আমার নামে ভি. পি. যোগে পাঠাইয়া দাও। যা পেলাম পাঠিয়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে খবর পেলাম অর্জুনকাকা সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেছেন। তারও কিছুদিন পরে আমার মেসে এসে হাজির হলেন একদিন। সঙ্গে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। বললেন, এটি আমার নাতি। আমার মেয়ের ছেলে। একে একটা ভাল স্কুলে ভরতি করব বলে এনেছি। ওখানে কিচ্ছু হবে না। তুমি একটা ভাল স্কুল

বেছে দাও। শুনেছি, মর্টন স্কুলে খুব কড়া শাসন, সেখানে দিলে কেমন হয়?

কি হবে অত কড়া শাসনে রেখে?

তুমি বুঝ না, কড়া শাসনই দরকার। তা না হলে এসব ছেলের কিছু হবে না।

তারপর একটু হেসে কবি হেমচন্দ্রের সাহায্য নিয়ে বললেন, হেঁ-হেঁ, এসব দৈত্য নহে তেমন—

চকিতের মধ্যে মুখের পেশীগুলো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে হল জিবটাও যেন নড়ে উঠল মুখের মধ্যে একবার। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

ছেলেটিকে কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

চিতুয়া।

অর্জুনকাকা ধমক দিয়ে উঠলেন।

'চিত্তরঞ্জন' বলতে পার না?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, এমন অসভ্য এরা, ভাল একটা নাম রাখলাম চিত্তরঞ্জন, সে নামকে ক'রে ফেললে চিতুয়া। সবাই ডাকছে—চিতুয়া চিতুয়া! চিত্তরঞ্জন শব্দ মুখ দিয়ে বাহিরই হয় না, কি করবে বেচারারা! অর্জুনকাকার ওপরের ঠোঁটটা একটু কেঁপে থেমে গেল।

চিত্তরঞ্জনকে মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভরতি করে দিলাম।

মর্টনের উপরেই অর্জুনককাকার ঝোঁক বেশি ছিল, কিন্তু আমি মানা করাতে আমার কথাটা রাখলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, টাকার কোন অভাব হবে না, এর বাবা না দেয় আমি দিব, কিন্তু পড়াশুনার ভাল ব্যবস্থা হওয়া চাই। বিলাসিতা না করে, সেইটি দেখো।

আমি যতদিন কলকাতায় ছিলাম, যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, চিতুয়া যাতে চিত্তরঞ্জন নামের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন প্রতিকূলতা করতে লাগল। চুম্বক যেমন লৌহকণা আকর্ষণ করে, চিতুয়া তেমনি নানা কুসঙ্গী জোটাতে লাগল তার চারিদিকে। ক্লাস প্রমোশন অবশ্য পেলে, কিন্তু নিজের জোরে নয়, আমার তদ্বিরে।

…এর পর অর্জুনকাকার যে স্মৃতিটা আমার মনে পড়ছে, তা আমার বিলেত যাওয়ার ঠিক আগের ঘটনা। ভাল ডাক্তার হতে হলে এখানকার

ডিগ্রীই যে পর্যাপ্ত নয়—এ ধারণা তখন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল এখন যদিও ধারণাটা বদলেছে, তখন কিন্তু নামের পিছনে একটা বিলিতি ডিগ্রী লাগাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিলাম। বাবাকে বললাম। তিনি বিব্রত হয়ে পড়লেন একটু। ছেলেকে বিলেত পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। কিন্তু আমাকে সোজা 'না'ও বলতে পারলেন না। ছেলে পড়তে চাইছে, অর্থাভাবে তার পড়া হবে না, ব্যাপারটা কষ্টদায়ক হয়ে উঠল তাঁর কাছে। তিনি ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় আমাদের এক আত্মীয় এসে খবর দিলেন যে, একজন বড়লোক আমার বিলেত যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে প্রস্তুত আছেন, আমি যদি বিলেত যাওয়ার পূর্বে তাঁর মেয়েটিকে বিয়ে করি। আমরা চিরকাল পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে এসেছি, সুতরাং এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারলাম না। এই সব নিয়ে বাড়িতে আলাপ-আলোচনা চলছে, হঠাৎ অর্জুনকাকা এসে উপস্থিত হলেন। আমি বাড়ি এসেছি খবর পেলেই তিনি আসতেন এবং ডাক্তারির নানা তথ্য আহরণ করতেন আমার কাছ থেকে। তিনি আমাদের বাড়ির লোকের মতনই হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও শুনলেন সব। শুনে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। সবাই চলে গেলে আমাকে বললেন, বিয়ে করে বিলেত যাও না, ভালই তো শ্বশুরের টাকা নিতে তোমার আপত্তি কেন?

ওর মধ্যে বড়লোকের দম্ভ প্রচ্ছন্ন আছে একটা, তা আমি সহ্য করতে পারব না।

যাঃ!

অর্জুনকাকা প্রশংসমান দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, বিলেত যেতে কত টাকা লাগে?

পাঁচ-ছ হাজার।

মোটে? আমি দিব তোমাকে টাকা।

আপনি?

হাঁ, ছ' হাজার টাকা পোষ্ট-অফিসে আছে আমার। কালই বাহির করে আনতে পারি। তুমিই নাও টাকাটা। তোমাদের জন্যই তো আমার সব। আমার তো কিছুই ছিল না। চুপ করে রইলাম।

কাল তাহলে টাকাটা বাহির করি?

না, থাক।

কেন, আপত্তি করছ কেন?

থাক না আপনার টাকা। আপনার নাতিরা মানুষ হয় নি এখনও।

হবেও না। সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে। তা ছাড়া ওদের টাকার অভাব কি?

ওদের আমি দিব না কিছু। তুমিই নাও, ভাল কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার। কি বল, বাহির করি? অর্জুনকাকার চোখে আগ্রহ ফুটে বেরুতে লাগল যেন।

না, থাক।

কেন, আমাকে পর ভাবছ?

একটু মুচকি হেসে আমি উঠে গেলাম। অর্জুনকাকা একা বসে রইলেন। ফিরে এসে দেখি, তিনি পায়চারি শুরু করেছেন। উত্তর দিকের বারান্দাটায় ক্রমাগত চক্কর দিচ্ছেন। পিছনে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ, ভ্রূকুটিকুটিল মুখ, চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা অবর্ণনীয়! আমাকে দেখতে পেলেন না, আমিও স'রে গেলাম সেখান থেকে।

কিছুদিন পরেই একটা জাহাজের চাকুরি নিয়ে আমি বিলেত চলে যাই। অর্জুনকাকার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। দেখা হল বিলেত থেকে ফেরবার পর। হঠাৎ এক রাত্রে এসে হাজির। কিন্তু সকালে উঠে দেখি অর্জুনকাকা নেই। তাঁর উনুনটি বাইরের বারান্দার নীচে ধোঁয়াচ্ছে। চাকরটা বললে, বুড়ো বাবু আমার কাছ থেকে কিছু কয়লা আর ঘুঁটে নিয়ে নিজের হাতে উনুনে আঁচ দিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেছেন। এখুনি ফিরবেন। হাতে বিশেষ কোন কাজ ছিল না, তাঁর অপেক্ষাতেই বসে রইলাম। বিলিতি ডিগ্রী সত্ত্বেও চাকরি পাই নি, প্র্যাকটিসও জমাতে পারি নি। কোটিপতি হবার আশায় কলকাতা শহরে গিয়ে বসেছিলাম কিছুকাল। কিছু হয় নি। এখন এই মফস্বল শহরে এসে বসেছি। কোটিপতি হবার সম্ভাবনা না থাকলেও গ্রাসাচ্ছাদন জুটবে বলে মনে হচ্ছে। দশটার সময় এক জায়গায় যেতে হবে, তার আগে হাতে কোন কাজ নেই। অর্জুনকাকার অপেক্ষায় ব'সে রইলাম। একটু পরেই অর্জুনকাকা শিবস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে এলেন। শুধু গা, শুধু পা। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে ভিজে কাপড় গামছা।

অর্জুনকাকা, এত ভোরে কষ্ট করে গঙ্গা নাইতে গেলেন কেন? চাকরটাকে বললেই সে বাথ-রুম দেখিয়ে দিত—

কষ্টটা আর কি! এতেই অভ্যস্ত আমি।

ভিজে কাপড় গামছা জানলার গরাদেতে বেঁধে শুকুতে দিলেন। তারপর এক হাতেই জ্বলন্ত উনুনটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়।

বারান্দায় উনুন রাখতে তোমার আপত্তি নাই তো?

না। উনুন দিয়ে কি করবেন?

দেখ না, বলেই জলের ঘটিটা বসিয়ে দিলেন তাতে। তারপর উনুনের ধারে ছোট মোড়াখানা টেনে এনে তার উপর বসে গা হাত পা সেঁকতে লাগলেন।

তুমি সরে এসে বস না। সোয়েটারই পর আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।

অর্জুনকাকা হাত গরম করে করে দুই গালে দিতে লাগলেন। দু পা ফাঁক করে উনুনটাকে দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দাঁড়ালেন দু-একবার। চাকর চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। অর্জুনকাকার সঙ্গে যে আমার কি সম্পর্ক, তা স্ত্রীকে সবিস্তারে বলেছিলাম। ট্রের দিকে একনজর চেয়ে বুঝলাম, সম্মানিত অতিথির মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে সে।

অর্জুনকাকা সবিস্ময়ে বললেন, এসব কি?

একটু চা খান।

আমার কথা ভুলে গিয়েছ দেখছি।

চা তো আপনি খেতেন।

চা তো খাবই, ওই জল হচ্ছে। চা দুধ চিনি আনতে বল। আমার বাক্সে সব আছে—কিন্তু তোমার এখানে এসেছি, তোমারটাই খাব আজ। সৌখিন পেয়ালার এক-আধ চুমুক খেয়ে কিছু হবে না আমার।

বেশ তো, বেশি করেই খান না।

আমি নিজে হাতেই করব—নিজে খাব, তোমাকেও খাওয়াব।

খাবার-টাবারগুলো?

আমি তো সকালে কিছু খাই না, তুমি জান। আগে দই চিঁড়া খেতাম, এখন তাও ছেড়ে দিয়েছি। আজকাল একবার খাই, শুধু দুপুরে, তাও নিরামিষ।

এত খাবার কি হবে তাহলে, আপনার জন্যে এনেছে—

বেশ আমিই তোমাদের দিচ্ছি। খাও, তোমার ছেলেমেয়েদের ডাক। ছেলেপিলে কটি তোমার?

একটিও হয় নি এখনও।

কেন?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন অর্জুনকাকা। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক যুক্তি অনুসারে আমি যে জন্ম-নিরোধ ব্যাপারে লিপ্ত আছি, তা আর তাঁকে বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

অর্জুনকাকা চাকরটাকে বললেন, তুমি এসব নিয়ে যাও। যাকে বল, কিছু চা চিনি আর দুধ পাঠিয়ে দিতে, তোমার বাবুর জন্যে একটা কাপ রেখে যাও খালি।

চাকর নিয়ে এল সব। অর্জুনকাকা চায়ের পাতা শুঁকে বললেন, এ চা ভাল নয় তোমার। ঠকিয়েছে তোমাকে।

একটু লজ্জিত হলাম। সত্যি কথাই বলেছেন অর্জুনকাকা। ঠকায় নি—অর্থাভাবে সস্তা দামের চা-ই ব্যবহার করি। শহরে অধিকাংশ বাড়িতে পেয়ালারই চাকচিক্য, চা খেলো।

অর্জুনকাকার ঘটির জল ফুটে উঠল। তোরঙ্গ থেকে তিনি কুচকুচে কালো পাথরের বেশ একটি বড় গ্লাস বার করলেন। একটি পিতলের ছাকনিও। চা তৈরি করলেন, আমাকে এক কাপ দিলেন, নিজে এক গ্লাস নিলেন। চা খেতে খেতে নিজের কথা বলতে লাগলেন। মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনাও হয় নি তাঁর। নাতিও মনের মত হয় নি। স্ত্রী মারা গেছেন। প্র্যাক্টিস করতেও আর ভাল লাগে না। দুনিয়ার কারো সঙ্গে বনল না। বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই ঠিক করেছেন শেষকালে।

তোমার প্র্যাক্টিস হচ্ছে কেমন?

চলে যাচ্ছে।

হবে, তোমার ঠিক হবে। আমগাছে আমই ফলবে।—খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

আচ্ছা, তুমি বস। আমি বাজারটা ঘুরে আসি।

অর্জুনকাকা চলে গেলেন।

আমিও রোগী দেখতে বেরুলাম।

যখন ফিরলাম তখন বেলা বারোটা। ফিরে দেখি, অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় অর্জুনকাকা বসে আছেন।

খুব অদ্ভুত জিনিস দেখলাম একটা।

কি ?

দেখবে ? চল না, কাছেই।

বলুন না কি ?

না দেখলে ঠিক বুঝবে না। পাঁচ মিনিটের পথ, চল না।

যেতেই হল। অর্জুনকাকা আমাকে নিয়ে গেলেন এক লোহার দোকানে।

ওই দেখ।

কি ?

বিস্ময়কর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হচ্ছিলাম।

লোহার চাদরটা দেখছ না! হাত দিয়ে দেখ কত মোটা—

কোট-প্যাণ্ট পরা ছিল, ঝুঁকতে একটু কষ্ট হল, তবু অর্জুনকাকার আগ্রহাতিশয্যে ঝুঁকে লোহার চাদরের ঘনত্ব অনুভব করলাম।

ভাল নয় ?

হ্যাঁ, বেশ পুরু মনে হচ্ছে।

পুরুই দরকার।

কি করবেন এ নিয়ে ?

উনুন—চমৎকার উনুন হবে এতে। তোমার জন্যও একটা করতে দি, কি বল ?

দিন।

উনুনের দরকার ছিল না, কিন্তু অর্জুনকাকাকে ক্ষুন্ন করতে পারলাম না। অর্জুনকাকা সোৎসাহে আরও খানিকটা লোহার চাদর, শিক, আংটা প্রভৃতি কিনে নিজেই সেগুলি কামারের ওখানে বয়ে নিয়ে গেলেন। কুলি করতে দিলেন না। কামারকে বললেন, আর একটা উনুনও করতে হবে। বেশ ভাল মজবুত করে বুঝলে ?

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, বাজারে যে তৈরি তোলাউনুন পাওয়া যায়, সে সব বড় অমজবুত। এ দেখো, কি-রকম হবে—

ফিরবার পথে বললেন, এখানে কাঠও বেশ পাওয়া যায়। কাঁঠাল কাঠের দর করে এসেছি, একটা সিন্দুকও করিয়ে নেব ভাবছি।

তার পরদিন শুধু কাঁঠাল কাঠ নয়—ইস্ক্রুপ, কবজা, কাঁটা, লোহার পাত এবং যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক ছুতোর মিস্ত্রিও এসে হাজির হল। অর্জুনকাকা সোৎসাহে সিন্দুক করাতে লেগে গেলেন।

আমাকে বললেন, সিন্দুকটা এমনভাবে করাব, যাতে আমার সব কুলিয়ে যায় ওতে। বিছানাপত্তর, খাওয়াদাওয়ার জিনিস, উনুনটা, বাসন দু-একখানা, বই-টই—পাঁচটা পুঁটুলি করে আর কি হবে! আমার কটা জিনিসই বা আছে। একটু বড় করেই করাব, রাত্রে যাতে ওর উপর শুতেও পারি—কি বল?

বেশ তো।

উঠে-পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলল।

ভাল করে র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাঁদা দেওয়া। বার্নিশ হবে। ওকি করছ তুমি?

একটু ভাল করে খেটে-খুটে কর বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিশও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—

হ্যাঁ, ঠিক করে মেপে নাও—থাম থাম, আমি ধরছি—

আরে বাবা, কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হাঁ, চারটে।

হাঁ-হাঁ-হাঁ, প্যাঁচ কষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—

—এই জাতীয় নানা উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যেত। অর্জুনকাকা মেতে উঠলেন সিন্দুক নিয়ে। একেবারে শ্রান্তিক্লান্তিহীন। জলের মত পয়সাও খরচ হতে লাগল। পিতলের বড় বড় ডুমো ডুমো পেরেক কিনে আনলেন সিন্দুকের শোভাবৃদ্ধির জন্য। কোণে কোণে লোহার পাত দিলেন মজবুত করবার জন্য। মিল্‌টন কাপড় কিনে সিন্দুকের ভিতরে অস্তর দিলেন। যত খরচই হোক, জিনিসটা মনোমত করতে হয়। জীবনে কোন জিনিসই মনোমত হয় নি; এটাকে নিখুঁত করতেই হবে—আমার মনে হল এই ধরনের একটা জেদ যেন পেয়ে বসেছে তাঁকে। অন্তত একটা কাজেও তিনি যে সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছেন, এই সান্ত্বনাটুকু আঁকড়ে তিনি তীর্থবাস করতে চান। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ যেন সিন্দুকটার উপর প্রয়োগ করেছেন তাই।

সিন্দুকটা হলও চমৎকার! যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।

অর্জুনকাকা বললেন, এর উপর লাফাও তুমি।

কেন ?

দেখ কত মজবুত !

আহা, উঠে দাঁড়াও না তুমি।

অনিচ্ছাসহকারেও সিন্দুকটার উপর উঠে দাঁড়াতে হল।

পা ঠুক।

পা ঠুকলাম দু-একবার। খুব মজবুত হয়েছে।

অর্জুনকাকার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উনুন এসে গেল। অর্জুনকাকা তোরঙ্গটাও আমাকে উপহার দিলেন। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সিন্দুকে পুরলেন। আরও নানারকম জিনিস কিনে ভরতে লাগলেন সিন্দুকে। গোটা দুই তালা কিনলেন ভাল দেখে।

ক্রমশ যাবার দিন ঘনিয়ে এল। অর্জুনকাকা প্রথমে যাবেন প্রয়াগ, মাঘ মাসটা সেখানে কাটাবেন, তারপর থাকবেন কাশীতে এসে।

অর্জুনকাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম। একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলে না। দু'জন লাগল।

ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গড়িয়ে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। সিন্দুকটা এত বেশী বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেশ নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুনকাকা উঠতে পারলেন না; ট্রেন ছেড়ে গেল।

...অর্জুনকাকার দিকে চেয়ে দেখলাম—তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটিকুটিল, ঘনঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।

স্মৃতি

হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। যে ঘরটিতে আমাকে থাকতে দিয়াছে, সেটিও সুন্দর। দক্ষিণ দিক খোলা, পাখাও আছে। খাওয়া নিন্দনীয় নয়। যে কয়দিন কলিকাতায় থাকিব, এখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে। কাহারও বাসায় উঠিয়া সসঙ্কোচে থাকার চেয়ে অনেক ভাল। ভালই হইয়াছে। হোটেলের চাকর আসিয়া বিছানা করিয়া দিয়া গেল। বেশ চাকরটি। ছিমছাম। পরিষ্কার ফতুয়া গায়ে, মাথায় ঈষৎ টেরি। চোখ মুখ হইতে

বিনীত সম্ভ্রম বিকীর্ণ হইতেছে। বেশ ভাল লাগিল। মন্মথ আমাকে ভাল হোটেলই দেখিয়া দিয়াছে। নালিশ করিবার কিছুই নাই। আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, শুইয়া পড়িলাম। অনেকক্ষণ এ-পাস. ও-পাস করিয়াও ঘুম কিন্তু আসিল না। মুদিত চোখের সম্মুখে বহুদিন আগেকার বিস্মৃতপ্রায় একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

...অনেকদিন আগে একবার একটি ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেদিনকার সেই ছবিটি বার বার মনে পড়িতেছে। ভদ্রলোক ষ্টেশনমাস্টার ছিলেন। স্থানটি গঙ্গার ধারে। ষ্টেশন খুব বড় নয়, কিন্তু সেখান হইতে প্রচুর মাছ চালান হইত। মাছের ব্যবসায় উপলক্ষেই সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার জেলেদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় মাছের কারবার খোলার ইচ্ছা ছিল। ব্যবসায় সম্পর্কিত কাজ শেষ করিয়া পরের ট্রেনে ফিরিয়া আসিবার কথা, কিন্তু কাজ শেষ হইল না, থাকিতে হইল। কোথায় থাকা যায়—চিন্তা করিতেছিলাম। জেলেদের বাড়িতে থাকিবার প্রবৃত্তি হইল না। পল্লীগ্রাম—হোটেল, ডাকবাংলা, ধর্মশালা কিছুই নাই। একজন বলিল, মাস্টারমশায়ের ওখানে যান না, সেখানে তো অবারিত দ্বার। গেলাম। একটু কুণ্ঠার সহিতই গেলাম। মাস্টারমশায়ের সহিত সকালে স্টেশনে আলাপ হইয়াছিল,—মাছ চালান দিবার রেট, সুবিধা, অসুবিধা প্রভৃতি জানিতে তাঁহার আপিসে গিয়াছিলাম। পুষ্টকান্তি সদা-হাস্যমুখ ভদ্রলোক। মাথায় ঈষৎ টাক, প্রশান্ত প্রদীপ্ত এক জোড়া চোখ, পুরুষোচিত এক জোড়া গোঁফ। তখন গ্রীষ্মকাল, আপিসেও খালি গায়ে ছিলেন। এক বুক চুল, তাহার উপর ধবধবে সাদা উপবীতগুচ্ছ। টেবিলের উপর একটি টকটকে লাল গামছা পাট করা আছে, প্রয়োজনের সময় তাহা দিয়াই হাতমুখ মুছিতেছেন। বাড়িতেও দেখিলাম, সেই একই বেশ। আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

আসুন, আসুন, আজকের ট্রেনে যাওয়া হল না বুঝি? বসুন। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হল—ওই জেলে বেটাদের ওখানে তো সুবিধে হওয়ার কথা নয়, তার চেয়ে নিমু হালুয়াই ঢের ভাল। কিছু যদি না করে থাকেন, আমার এখানেই হোক না না-হয়—

একটু ইতস্তত করিয়া শুরু করিতেছিলাম, ব্যবস্থা যা হয় একটা হয়ে যাবেই। আপনার এখানে আবার এত রাত্রে—

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া মাস্টারমশাই বলিয়া উঠিলেন, আরে রাত আর কত হয়েছে, এই তো সবে আটটা। আমার এখানেই হোক। ব'সে আসি ভেতরে।—আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন, গিন্নীকে কেবল একটু খবর দেওয়া যে, আর চারটি চাল বেশি করে নাও। রাবণের চুলো তো আছেই দিন-রাত। রেলের কয়লা, পয়সা তো লাগে না—হা-হা-হা—। চতুর্দিক কম্পিত করিয়া মাস্টারমশাই হাসিয়া উঠিলেন।

এইবার আপনার পরিচয়টা নেওয়া যাক ভাল ক'রে। চা খাবেন?

না থাক্।

খানই না এক কাপ, এক কাপ চা খেলে আর কি হয়? কোথা দেশ আপনার?

হুগলী জেলায়।

বাঃ আমারও যে হুগলী।

একটু পরেই চা আসিল। তন্ন তন্ন করিয়া মাস্টারমশাই আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। এমন কি আমার শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর খবর যতটা আমার জানা ছিল, তাহা তাঁহাকে বলিতে হইল। হাঁটু দোলাইয়া দোলাইয়া 'বেশ, বেশ' বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি সব শুনিতে লাগিলেন। মনে হইল, যেন কোন মনোজ্ঞ কাহিনী শুনিতেছেন. পরে জানিয়াছিলাম, ইহাই তাঁহার স্বভাব। তুচ্ছ উচ্চ যাহাই হোক, মানব মাত্রেই তাঁহার প্রিয়। বহু মানুষের সঙ্গ, বহু মানুষের কাহিনী, বহু মানুষের সুখ-দুঃখ লইয়াই তাঁহার জীবন। তাঁহার নিজের সংসারটি খুব ছোট; একটি মাত্র পুত্র, বিদেশে বোর্ডিঙে থাকিয়া পড়ে। বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া আর কেহই নাই; কিন্তু প্রতিদিন প্রায় কুড়ি বাইশ জন লোক খায়। টালি-ক্লার্কবাবুর বউ বাপের বাড়ি গিয়াছেন, তিনি মাস্টারমশাইয়ের বাসায় খান। নবাগত টিকিট কালেক্টারটির এখনও বিবাহ হয় নাই, একাই এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে মাস্টারমশাই আর রান্নার হাঙ্গামা করিতে দেন নাই। গঙ্গার ধারে বায়ুপরিবর্তনমানসে মাস্টারমশাইয়ের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় কয়েকজন আসিয়াছেন, তাঁহারা নিত্য অতিথি। আমার মত অনাহূত লোকও প্রায়ই থাকেন দুই-একজন। চাকরির আশায় গ্রামের একটি ছেলেও আসিয়াছে! স্থানীয় বাঙালীরা মিলিয়া ছোটোখাটো থিয়েটার পার্টি করিয়াছেন, তাহাতে যিনি বাঁশী বাজান, তিনি

এখানে খান। নানা লোকের নানা পরিচয়, সকলেরই আশ্রয় এখানে। মাস্টার-মশাইয়ের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, গুটিগুটি সকলে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বংশীবাদক ভদ্রলোক (স্থানীয় একটি মাড়োয়ারীর আড়তে মাস্টারমশাই তাঁহার চাকরি জুটাইয়া দিয়াছেন) প্রথমেই আসিলেন। ক্রমশ তবলা-হারমোনিয়মও বাহির হইল। মাস্টারমশাইয়ের গানবাজনার শখ আছে, গায়কেরও অভাব নাই দেখিলাম। টালি-ক্লার্ক, ডাক্তারবাবু দারোগাবাবুর শালা, বায়ুপরিবর্তনের জন্য যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যেও জন দুই—বেশ গাহিতে পারেন। দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল! নিধুবাবু, দ্বিজুবাবু, রামপ্রসাদ—কেহই বাদ গেলেন না। সব রকমই হইল। রাত্রি এগারোটার মালগাড়ি 'পাস' করিয়া ছোটবাবু আসিবেন। তখন চাকর আসিয়া খবর দিল—খাবার জায়গা হয়েছে। সকলে উঠিয়া ভিতরে গেলাম। এখনও ছবিটা বেশ স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মাস্টারমশাইয়ের কোয়ার্টারে অপরিসর বারান্দায় আহারের স্থান হইয়াছিল। ছোট বারান্দায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিতে হইল। সকলের ভাগ্যে আসনও জোটে নাই। পাট-করা শতরঞ্চি কম্বল বোরা প্রভৃতি দিয়া মাস্টারগৃহিণী সমস্যার সমাধান করিয়াছেন দেখিলাম। আহারও অতি সাধারণ গোছের—কলাপাতার উপর গরম ভাত, একটু ঘি, আলুভাতে ডালভাতে, একটু সাধারণ একটু ডাল, একটু তরকারি, মাছের ঝোল, একটু অম্বল। অতি সাধারণ ভোজ্য, কিন্তু কি পরিতৃপ্তসহকারে সেদিন খাইয়াছিলাম আজও ভুলিতে পারি নাই। আহারাদির পর কোথায় শোওয়া যায় তাহাও একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টারমশাইয়ের কোয়ার্টারে স্থানাভাব। আমি ওয়েটিং-রুমে রাতটা কাটাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেই মাস্টারমশাই বলিয়া উঠিলেন, খবরদার, খবরদার, ছারপোকায় খেয়ে ফেলবে, অমন কাজটি করবেন না! দেখুন না, এইখানেই হয়ে যাচ্ছে একরকম করে। গোটা দুই বেঞ্চি আছে—তাই জুড়েই করে দিচ্ছি, দেখুন না। বাইরের বারান্দায় দুইখানি বেঞ্চি জুড়িয়া মাস্টারমশাই নিজে দাঁড়াইয়া আমার বিছানা করাইয়া দিলেন। স্থানে অস্থানে পেরেক ঠুকিয়া একটা হাওড়ার হাটের শতছিন্ন মশারিও টাঙানো হইল।

সেদিন আহার শয্যা কিছুই ভাল ছিল না, কিন্তু এক ঘুমে রাত কাটিয়া

গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন হইতেই মাস্টারমশাই আমার আপনলোক হইয়া গিয়াছিলেন।

মাস্টারমশাইয়ের সম্বন্ধে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একবার মনে আছে, শীতকালে গিয়াছিলাম। ট্রেনটা খুব ভোরে পৌঁছিত। ট্রেন হইতে নামিয়া দেখি, অভূতপূর্ব ব্যাপার। স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চায়ের একটা স্টল-গোছের হইয়াছে। অনেকেই চা পান করিতেছেন পুলকিত চিত্তে আমি আগাইয়া গেলাম। শীতকালের ভোরে এখানে-চা পাইব আশাই করি নাই। চমৎকার চা। চা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, দাম কত?

দাম লাগবে না বাবু।

দাম লাগবে না! সে কি?

মাস্টারবাবু মোসাফিরদের রোজ মাংনিতে পেলান—এই অদ্ভুত আধাবাংলা আধাহিন্দীতে যে লোকটা জবাব দিল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সে স্টেশনের কুলী একজন। অবাক হইয়া গেলাম। সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে মাস্টারমশাই বিনা পয়সায় চা খাওয়াইতেছেন। মাস্টারমশাইয়ের সহিত একটু পরে দেখা হইল।

চায়ের সদাব্রত খুলেছেন, ব্যাপারটা কি?

দরাজ গলায় মাস্টারমশাই হাসিয়া উঠিলেন।

আমার সে সামর্থ্য কি আছে ভাই? একজন টী-মার্চেন্ট এক 'কেস' চা এমনই দিয়েছিল। ভাবলাম, একা খাই কেন, পাঁচজনে মিলে খাওয়া যাক। গণেশ মাড়োয়ারীকে বলাতে চিনিও পাঠিয়ে দিলে কিছু। ঘরের গায়ের দুধ— দুটো গোরুতে সের আষ্টেক দিচ্ছে আজকাল, আর রেলের কয়লা, রাবণের চুলো দিনরাত জ্বলছে। জংশন থেকে একটা বড় কেৎলি আর কিছু কাপ-সসার আনিয়ে নিয়েছি। ঝকসু-র ভোরে ডিউটি—তাকে বললাম, তুইও খা পাঁচজনকেও খাওয়া। বাস্, মিটে গেল—

আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

মাস্টারমশায়ের উপর জোর-জবরদস্তি করিতেও কাহারও বাধিত না। লাইনের সকলের তিনি ছিলেন 'দাদা'। আর একবারের আর একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। শীতকালে প্রচুর মাছ চালান হইত, প্রত্যেক জেলেই মাস্টারমশাইকে মৎস্য উপঢৌকন দিত। মাস্টারমশাই নিজের জন্য কিছু রাখিয়া

বাকিটা বিতরণ করিতেন। ডাক্তারবাবু, দারোগো, পোস্টমাস্টার প্রভৃতিকে তো দিতেনই, বেশি হইলে পরের স্টেশনের বাবুদেরও পাঠাইয়া দিতেন। একবার মাছ বেশি হয় নাই। চালান কম। পরের স্টেশনে পাঠাইবার মত প্রচুর মাছ একদিনও জোটে নাই। হঠাৎ একদিন মাস্টারমশাইয়ের নামে একটা প্রকাণ্ড পার্সেল আসিয়া হাজির হইল। প্রকাণ্ড একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। আমি তখন সেখানে উপস্থিত। বাক্সটা খুলিতেই দুইটা বিড়াল লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল। বাক্সে একখানা চিঠি ছিল। পরের স্টেশনের বাবুরা লিখিতেছেন—দাদা, বিড়াল দুইটাকে পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা অন্তত আপনার পাতের কাঁটা চিবাইয়া বাঁচুক।

দেখেছ, দেখেছ, ছোঁড়াগুলোর কাণ্ড দেখেছ!

মাস্টারমশাইয়ের চক্ষু দুইটি হইতে হাসি উপচাইয়া পড়িতেছিল। তখনই বাজার হইতে কিছু মাছ কিনিয়া পরের ট্রেনে পাঠাইয়া দিলেন।

এমনই কত ঘটনা।

কলিকাতায় নিজের কাজেই আসিয়াছিলাম। হাওড়া স্টেশন হইতে সোজা হয়তো বড়বাজারের সেই হোটেলটাতেই উঠিতাম। হাওড়া স্টেশনেই পূর্বপরিচিত একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তাহার মুখে শুনিলাম, মন্মথ বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, ভাল চাকরি পাইয়াছে, একটা ঠিকানাও আমাকে দিল। অনেকদিন মন্মথকে দেখি নাই, একবার দেখিতে ইচ্ছা হইল। হাওড়া হইতে সোজা বাসাতেই গেলাম। বাড়িটি বেশ সুন্দর। আমি বারান্দায় উঠিতেই একটি বালক-ভৃত্য আগাইয়া আসিল।

—কি চান আপনি—?

মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই। বল—

বালকটা আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটি শ্লেট পেনসিল আনিয়া বলিল, আপনার নাম আর কেন দেখা করতে এসেছেন তা এতে লিখে দিন।

লিখিয়া দিলাম। বালক-ভৃত্য ড্রয়িংরুম খুলিয়া দিয়া বলিল, আপনি বসুন এখানে।

বসলাম। সোফা-সেটিতে সাজানো ড্রইংরুমটি বেশ সুন্দর। সুরুচির পরিচয় দিতেছে। প্রায় মিনিট দশেক পরে মন্মথ বাহির হইল। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে চিনিতে পারিতাম না। ঢিলা পায়জামা পরা, বাটারফ্লাই

গোঁফ। আশা করিয়াছিলাম, প্রণাম করিবে; কিন্তু করিল না। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তাহার মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ও, আপনি এসেছেন!

অনেকদিন দেখিনি। ভাবলাম—

বেশ করেছেন, উঠেছেন কোথায়?

কোথাও উঠিনি এখনও। হাওড়া স্টেশনে বেচুলালের সঙ্গে দেখা, সে-ই তোমার খবর আর ঠিকানা দিলে। সোজা এখানেই চলে এলাম।

মন্মথ হাত-ঘড়িটা একবার দেখিল। তাহার পর বলিল, আমার বাসায় আজ মোটেই জায়গা নেই। একে ছোট বাসা, তার উপর আমার শালী ভায়রাভাই সবাই এসেছে। চলুন, আপনার থাকবার জায়গা একটা ঠিক করে ফেলা যাক্ আগে। বেশি রাত হয়ে গেলে হোটেলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। যা লোকের ভিড় আজকাল কোলকাতায়!

অতিশয় যুক্তিযুক্ত এ উক্তিতে রাগ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু আমার কেবল মনে হইতেছে, তাহার সোফা-সেটি সরাইয়া ঐ ড্রয়িংরুমে আমার শুইবার একটু স্থান কি করিয়া দিতে পারিত না?

আপনারা হয়তো বলিবেন, এমন অসঙ্গত প্রত্যাশ আপনি করেন কেন। করিতাম না, যদি এই মন্মথ সেই মাস্টারমশায়ের ছেলে না হইত।

অবর্তমান

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে করে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য করেন নি, তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো ব্যাপারটা ঠিক কী জাতীয়। ধু ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের ঝোপ, একধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু করে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহল-গাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি,

খেয়াঘাট থেকে কত দূরেই বা চলে এসেছি তার খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের নাগালের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার। ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে-ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চরে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম তখন হতাশ হয়ে পড়তে হল আমাকে। কোথায় পাখি? ধু ধু করছে বালির চড়া—আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার ডাকটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলাম চখা আছে কোথাও কাছে পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি, হাঁা, ঠিক চখাই বটে—কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম দম্পতির একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ করে গেছেন। এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়! দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আরও খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বেশ খানিকটা দূরে আমি আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটা বাগিয়ে বসতে যাব আর অমনি কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হলে চলবে না, চখা শিকার করতে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে

এগুতে লাগলাম, কিন্তু উল্টো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চলে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ওধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছুদূর ঘুরতে হল—প্রায় মাইল খানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ করে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব আর অমনি—

কাঁআঁ—

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধরে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোখ চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম আমি ভেবেছিলাম একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়ল না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় বসে রইল। মনে হল অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয়, কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল, যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল-আবডাল নেই—চতুর্দিকে ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল—ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপ ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধঘণ্টারও ওপর সময় লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালির ঢিপির উপর, মুশকিল হল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতন বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল না, বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল কিনা তার কাছে তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোখ আরো চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখিটা ওপারের চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজন দু-পারে। চুপ করে বসে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল আকাশে বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়ি নি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ-সত্তা অধিকার করে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে বসে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হল কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হল আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোন সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টিমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি, কিন্তু তাকে ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তপ্রসারিত অনিশ্চয়তা, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষারপর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম তা হলে আর কি হল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকালই এড়িয়ে গেছে আমাকে! সেদিন অত চেষ্টা করেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে!

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল ; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর লোকের নির্জন-রোদনের অবাঙ্ময় বেদনা মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে ? সিংহ, হাতী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হল।

কাঁঅঁ—কাঁঅঁা—কাঁঅঁা—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপর চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণতঃ রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁঅঁা—কাঁঅঁা—

আরও খানিকটা নেমে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার করে দিলাম।

কাঁঅঁা—কাঁঅঁা—কাঁঅঁা—কাঁঅঁা—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে এবারও তাই হল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনও কিছু পাই নি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ করে বসেছিলাম।

চতুর্দিকে ধু ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা বন্দুক সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখনই বা নদীতে নামলেন, কিছুই দেখতে পাই নি !

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কে ?"

লোকটি এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল ; ফিরে আমার দিকে চেয়ে

রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন—"আমি এখানেই থাকি! আপনি আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন!"

পরিচয় দিলাম।

"ও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।"

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূরে গিয়ে দেখি একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছোট্ট কুটিরটি যেন ছবির মতন—সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ—চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ—অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখী বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্চি-গোছের কী একটা পাততে লাগলেন।

"বসুন।"

বসে দেখলাম শতরঞ্চি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও একপ্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম, তিনিও চুপ করে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা কইতে হল।

"সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।"

"সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?"

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হল—চোখ দুটো জ্বলছে মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

"একটা গল্প শুনুন তাহলে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন?"

"না।"

"শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল—দুজনেই জমিদার—একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।

"সুর-খোর?"

"হ্যাঁ···ওরকম সুর-পাগল লোক ও অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত

ওস্তাদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গানবাজনা শিখেছিলুম। বাংলাদেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে—গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিগ্যেস করি তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়—কিন্তু তা না করে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিগ্যেস করলুম—রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন? তিনি বলে দিলেন সুদ-খোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেমে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি স্টেশনে যখন নামলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে নেমে আর একজনকে জিগ্যেস করলাম। সুদ-খোর রামপ্রতাপ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিগ্যেস করলুম সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে সোজা চলে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি—চারিদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ—আর কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হল যেন শেষ নেই।

"কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হল—সাদা ধবধব করছে, মনে হল যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরি। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষন। তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বার দুপাশে দেখি দুজন বিরাটকায় দারোয়ান বসে আছে—দুইজনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে বসে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উত্তরই দিলে না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলে না। ভিতরে ঢুকে দেখি—বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে; প্রকাণ্ড কাছারি বাড়িতে বসে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুণছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে বসে আছে—সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি! সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে করে এদিক-ওদিক ঘুরে

বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হল না কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে। আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছে রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু—হঠাৎ দেখতে পেলাম কিছুদূরে ছোট একটা বাগান রয়েছে—বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধব্‌ধবে সাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। গড়গড়ায় কুণ্ডলী-পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চকমক করছে। বাগানে ছোট একটা গেট, গেটের দুধারে উর্দি-চাপরাশ-পরা দুজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন করে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দুজন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিল না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

"তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন শুধু। আস্তে আস্তে বললাম—হুজুরকে গান শোনাব বলে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

"তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারি কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে যে সে আলাপ চলেছে তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, এক ছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন?" কুটিরের ভিতরে ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন এক ছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখি নি কখনও।

"তারপর?"

"আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি রাজবাড়ি, কাছারি, চৌতরা, লোকজন—কোথাও কিছু নেই—ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি।"

"একা? কি রকম?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হল মারা গেছেন। বেঁচে আছে

সেই সুদ-খোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথই সবাই আমাকে বলে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বখশিশ দিয়ে গেলেন।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই। হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গান শুনবেন?"

"যদি আপনার অসুবিধে না হয়"--

"অসুবিধে আবার কি? সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনে বাস করছি—"

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার করে বললেন—"বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।"

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রী আলাপ আমি কখনও শুনি নি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারি নি, কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা-ও জানি না, ঘুম ভাঙল যখন, তখন দেখি আমি সেই ধু ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চরে বেড়াচ্ছে মরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলোয় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তারপর?"

"তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—"

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠীয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার

জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিকে দেখিলাম,—কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাশিকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি কোথাকার লোক। চাপরাশি উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চান না—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

হিসাব

দুই আর দুই যোগ করে যতক্ষণ চার হয় ততক্ষণ কোনো গোল থাকে না। কিন্তু যদি কোনো কারণে তা না হয় তাহলেই আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। পদ্মির ব্যাপারে তেমনি বিভ্রান্ত হয়ে আছি।

ভালো নাম পদ্মাবতী, ডাক নাম পদ্মি।

অত্যন্ত গরীবের মেয়ে। উপযুক্ত সহৃদয় আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যে তার 'ভার' নেয়। গরীবের মেয়ে হলেই বাধ্য হয়ে গৃহকর্মনিপুণা হতে হয়। তা না হলে বাসন-মাজা, কাপড়-কাচা, রান্না করা, উঠোন ঝাঁড়-দেওয়া, ঘর-নিকানো, গোয়াল-পরিষ্কার-করা কে করবে। পদ্মি নিজের ঘরের কাজ তো সব করতই, পাড়াপড়শীর ফরমাশও শুনত। কারো বড়ি দিয়ে দিচ্ছে, কারো সেলাই করে দিচ্ছে, কারো ছেলে আগলাচ্ছে। মামাদের অবস্থা একটু ভালো। কিন্তু তাঁরাও এমন লক্ষ্মী মেয়ের 'ভার' নিতে চান না। পাত্র কোথায়? তা ছাড়া চারদিকেই লকলক করছে আগুন—ঘৃত-কুম্ভের ভার নেবে কে?

দুই আর দুই যোগ করে ঠিক চার হয়ে যাচ্ছিল, আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম।

পদ্মির নামে একটা কলঙ্ক রটল, পাড়ায় দু-একটা ছোঁড়া তাকে ইশারাও করল। —চলছিল। হিসেবে ভুল হয় নি।

আমরা জানতাম পদ্মির বিয়ে হবে না শেষ পর্যন্ত—সম্ভাব্য পরিণতি-গুলোকে স্পষ্টরূপে আর ভাববার চেষ্টা করলাম না। তবুও সেগুলো বিভ্রান্ত

করে নি আমাদের, কারণ সেগুলো সব দুই আর দুইয়ে চারের পর্যায়ের হিসেবের মধ্যেই।

হঠাৎ একদিন কিন্তু আচমকা এমন একটা কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

গ্রামেরই ছেলে রামচরণ ছুটিতে একদিন গ্রামে ফিরে এল। রামচরণ নামটা যেমন ঘষা-পয়সার মতো, লোকটা তেমন নয়। বেশ জাঁদরেল লোক। রাজসরকারে হাজারখানেক না হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায়। ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া চলে না। প্রত্যেক ছেলের জন্য একজন করে আয়া আছে। চার ছেলে, চার মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হবার পর এই রামচরণ একদিন দেশে ফিরে এল এবং শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—ওই পদ্দিকে বিয়ে করে বসল।

আমরা চমকে গেলাম বটে কিন্তু অঙ্ক কষে দেখলাম হিসেবে ঠিক মিলেছে। পদ্মাবতী রূপসী ছিল। অবিশ্বাসী মন অবশ্য বাজে তর্ক তুলেছিল দু-একটা। পদ্মার চেয়ে বেশী রূপসী আর-একটি মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল তার, নিখুঁত সুন্দরী সে, বংশও ঢের ভালো, ধরেও ছিল তারা খুব—তবু রামচরণ পদ্মাকেই পছন্দ করলে কেন? পছন্দ-অপছন্দর নিগূঢ় হেতুটা কি? মনের এসব বাজে কৌতূহলকে অবশ্য প্রশ্রয় দিই নি। পছন্দ হয়েছে বিয়ে করেছে—দুই আর দুইয়ের চার-আবার 'কেন' কি!

পদ্দিকে বিয়ে করাতে রামচরণ দেব-পদ-বাচ্য হয়ে উঠল প্রায়। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। পদ্দি খুব খুশী। এক-গা গয়না, দামী কাপড়, জামা, মাথায় চওড়া সিঁদুর, একমুখ হাসি, তার আলাদা রূপই খুলে গেল একটা।

যাবার দিনে স্টেশনে গেলাম সবাই। রিজার্ভ ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি—ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে। রামচরণ উঠে বসল। ছেলে-মেয়েরা পাশের কামরায় ছিল। পদ্দি উঠেই এক কাণ্ড করে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঃ' বলে চীৎকার করে উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল—ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোড় করে বলতে লাগল,—আমার কোনো দোষ নেই, আমাকে জোর করে বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলি নি—কিছু কোরো না, তোমার পায়ে পড়ি···।

সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল সে।

ভূত ?

আজকাল ভূত বিশ্বাস করে না কি কেউ ?

বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা পদ্দির অবচেতন মন বিশ্লেষণ করে যখন দুই আর দুইয়ে চার করবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন আর-এক কাণ্ড ঘটল।

ছোট্ট একটা মাদুলি প'রে পদ্দি সেরে গেল হঠাৎ।

মহামানব কেনারাম ও ক

কেনারামকে বিধুভূষণ বারণ করেছিল; বলেছিল, তোমার বাড়ির বারান্দায় রোজ 'ক' এসে বসছে কেন। ওকে বেশী আসকারা দিও না। ওরা সাংঘাতিক জাত!

সকলেই জানে কেনারাম উদার-হৃদয় লোক। একটা উঁচুদরের হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বলল—তুমি জাত তুলে কথা কও কেন? আমাদের জাতের মধ্যে কত সাংঘাতিক লোক আছে তা জান? বিধুভূষণ হাত জোড় করে বলেছিল, ভাই তুমি মহাপুরুষ তা জানি। কিন্তু 'ক' কেও জানি, তাই বন্ধু হিসাবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি নতুন বিয়ে করেছ, বউটিও সুন্দরী! একথা শুনে কেনারামের নাকটা কুঁচকে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণের মতো লোক যে এতদূর অশ্লীল হতে পারে তা তার কল্পনাতীত ছিল, তাই চট করে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নাকটাই যা প্রকাশ করবার করে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণ চলে গেল মুচকি হেসে।

দিন পনেরো পরে বিধুভূষণের নজরে পড়ল 'ক' কেনারামের বারান্দা থেকে বৈঠকখানা ঢুকেছে। কেনারামের দামী সোফায় বসে ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাই করছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে বিশ্রম্ভালাপ। বিধুভূষণের মনে হল—এই রে, সেরেছে। বিধুভূষণও ঢুকে পড়ল বৈঠকখানায়। ঢুকে দেখল, 'ক' পান চিবুচ্ছে চবর চবর করে, আর বলছে—আপনার বউ যে এমন সুন্দর পান সাজতে পারে তা কে জানত! অপূর্ব, অদ্ভুত। এ যেন পান নয়, গজল।

বিধুভূষণ আবার মনে মনে বলল—এই রে সেরেছে।

কেনারাম বিধুভূষণকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু বিধু আপনাকে ভয় করে। ওর মনের গঠন এমন বিশ্রী যে সন্দেহ কিছুতে ঘুচতে চায় না ওর প্রাণ থেকে।

বিধুভূষণ হেসে বললে—আমি মহাপুরুষও নই, পাথরও নই। আমি রক্তমাংসের সাধারণ মানুষ। তাই ভয়ও করি, সন্দেহ্ও ঘুচতে চায় না। রাগ দুঃখ সবই আছে আমার।

'ক' দুলে দুলে হেসে হেসে বলতে লাগলে—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। মনে প্রেম জাগান, প্রেম জাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ হেঁ ··প্রেমই আসল চিজ। এ শুনে বিগলিত কেনারাম কুণ্ডুর মুখভাব মাখন-মাখানো পাঁউরুটির মতো হয়ে গেল। বিধুভূষণ আর একবার মনে মনে ভাবল—এই রে, সেরেছে!

দিন দশেক পরে কেনারামের সঙ্গে আবার দেখা হল বিধুভূষণের। রাস্তার মোড়ে কেনারামের হাতে একটি খাসির রাং।

কেনারাম। এই যে বিধুভূষণ। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে খেত। আমার বউ কোর্মা রাঁধবে, আর 'ক' করবে "সামী" কাবাব।

বিধুভূষণ। কি রকম? হঠাৎ এ-সব কেন?

কেনারাম। ভাই বিধু, 'ক' যে কত ভালো, তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সে আমার স্ত্রীকে একটা দামী শাল উপহার দিয়েছে, আমি মানা করলাম, তবু শুনল না। তুমি যদি আজ এস, তাহলে দেখবে কি রকম দামী শাল আর কি চমৎকার তার কাজ। সে বললে, এটা আমার প্রেমের উপহার, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি বাধা দিতে পারলাম না।

বিধুভূষণ। দেখ কেনারাম, তুমি একজন মহামানব, তা আগে জানতাম, কিন্তু তুমি যে নপুংসক, এটা আমার জানা ছিল না। ক একজন নারী-ধর্ষণকারী গুণ্ডা, এ-কথা কি তোমার জানা নেই? থানায় দারোগা সাহেবের কাছে গেলেই সব জানতে পারবে। তিনি প্রমাণ পেলে ওকে গ্রেপ্তার করতেন, কিন্তু পুরো প্রমাণ পান নি। কিন্তু তাঁর ঘোর সন্দেহ—

কেনারাম। দেখ বিধু, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাই একবার নারীধর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাই বলে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করতে পারি নি। কখনও পারব না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট আছে, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো দিকটা দেখ—

বিধুভূষণ তুমি দেখ, আমি চললাম।

কেনারাম। রাত্রে তুমি খেতে আসবে কি ?

বিধুভূষণ। না।

আরও মাসখানেক পরে। কেনারাম বাড়ি ছিল না। হঠাৎ সে বাড়ি ফিরে দেখে 'ক' এসেছে। 'ক'-য়ের ছড়িটি বৈঠকখানা ঘরের কোণে ঠেসান রয়েছে, কিন্তু 'ক' নেই। কেনারাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। 'ক' তার শয়নকক্ষে ব'সে তার স্ত্রীর থুতনি ধরে আদর করছে। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করত, জুতোপেটা করত, লাঠালাঠি করত। কিন্তু কেনারাম মহামানব। এ-সব কিছুই না করে সে আবেগগদগদ-কণ্ঠে প্রতিবাদ করল শুধু।

বলল, ভাই ক, তোমার এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। পুঁটিবালা আমার বিবাহিতা পত্নী, গায়ে এভাবে হাত দেওয়া বেআইনী। এ-কাজ তুমি আর কোরো না। ভেবে দেখ, এটা কি সঙ্গত ?

এর উত্তরে ক যা বলল, তাতে হকচকিয়ে যেতে হল মহামানবকে।

ক বলল, বন্ধু কেনারাম, কয়েকটা ভুল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে পুঁটিবালাকে তুমি বিয়ে করেছ, তা মানি। কিন্তু ওই নজিরেই যে তুমি পুঁটিবালাকে চিরকাল দখল করে থাকবে, এটা আমি মানব না। আধুনিক সভ্যসমাজের মহামানবেরা কেউ এ-কথা মানবে না। তুমিও একজন মহামানব, তোমাকে এ-কথাটা চিন্তা করে দেখতে অনুরোধ করি। এসব ব্যাপারে পুঁটিবালার মতই তোমাকে মানতে হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ এটা !

এই বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে ক বেরিয়ে গেল। পুঁটিবালা পিছন ফিরে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু। বারম্বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল না।

অন্য কেউ হলে চুলের ঝুঁটি ধরে চাবকাত তাকে। কিন্তু কেনারাম মহামানব। ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। তাই রইল সে।

আরও মাস দুই পরে। সেদিনও কেনারাম বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে দেখল ক এসেছে। বস্তুত ক রোজই আসত। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে আসা বন্ধ করেনি। লাঠিটা যথারীতি বৈঠকখানার কোণে ঠেসান আছে। সেদিন কিন্তু কেনারাম বাড়িতে ঢুকে যা দেখল, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তে হল

তাকে। সে দেখল ক শুধু যে তার শয়নকক্ষে রয়েছে তাই নয়, বিছানায় উঠে বসেছে এবং সে আর পুঁটি যে অবস্থায় রয়েছে, তা অবর্ণনীয়।

কেনারাম বলল ভাই ক, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাকে আপনজন বলে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলাম, এই কি তার প্রতিদান?

কেনারামের মনে হল 'ক' এ-কথা শুনে যেন মরমে মরে গেল। তার মনে হল, তার অন্তরে অনুশোচনার মেঘ দেখা দিয়েছে। যা আপাতদৃষ্টিতে হাসি বলে মনে হচ্ছে, তা হাসি নয়, লজ্জা।

এই উপলব্ধি হওয়ামাত্র তার রাগ জল হয়ে গেল। মহামানবসুলভ আনন্দে সে যে লোকে গিয়ে হাজির হল, তা ভূগোলে নেই।

পরদিন পুঁটিবালা অন্তর্ধান করলে।

'ক'-কেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনা বিধুভূষণের মুখে একদিন শুনেছিলাম।

বিধুভূষণ বলল, কেনারাম তার সর্বস্ব বিক্রি করে চৌমাথার কাছে একটুকরো জমি কিনেছে। সে জমির উপর একটি উঁচু মর্মরবেদী বানাবে, আর সেই মর্মরবেদীতে উঠে সে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তারস্বরে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে যে বাণীটি ঘোষণা করবে, তার সারমর্ম হচ্ছে—'অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুণ্ডা, কিন্তু আমি এ-কথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, সূর্যের স্পট আছে। গোলাপে কণ্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে, সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে। লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে' বলে বলুক। 'লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।' এই এখন ঠিক করেছে কেনারাম। মহামানবদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

অনেকদিন পরে কেনারামের একটি ডায়েরী পেয়েছিলাম। একটি অদ্ভুত খবর ছিল তাতে। ডায়েরীতে কেনারাম লিখেছে—আমি মহামানব। কিন্তু হায় আমাকে কেউ পৌছে না। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আমি যে মহামানব, তা আমি প্রমাণ ক'রেই ছাড়ব। দেখি' লোকে আমাকে পৌছে কি না।

কেনারাম এখনও পাগলাগারদের বাইরেই আছে।

দূর্ব্বা

দশ বছর আগে আমি যখন তাদের পল্লীতে গিয়েছিলাম তখন তাদের দুর্দশা দেখে শিউরে উঠতে হয়েছিল আমাকে। জাতে চামার ওরা। গঙ্গার ধারে ছোট ছোট কুঁড়েঘর বেঁধে থাকত তখন। কইলু চামারের বিরাট গুষ্টি। ভাই, ভাইবৌ, ভাগ্নে, মৌসি, শাশুড়ি—তা ছাড়া নিজের চারটে ছেলে তিনটে মেয়ে। ভাই, ভাইবৌয়ের ছেলেও অনেক। নাম শুনলাম একগাদা—সীতিয়া, সোনিয়া, গীতিয়া, কারু, কালেশ্বরী, ঝুমা, খুচুরবা, খৈনি, মৈনি, টুনটুন, কইলু, হরিয়া, তেতরা আরও কত। কইলুর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তার হিসেবে আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির। মানুষ তো গিজগিজ করছেই, তার উপর মুরগি আর ছাগলও কম নয়। নোংরা চারদিকে। মাছি ভন্ ভন্ করছে। উঠোনে ছেলেমেয়েদের বিষ্ঠা। ছেলেমেয়েগুলোর মাথায় তৈলবিহীন রুক্ষ চুল, চোখে পিচুটি, গা-ময় খোস। প্রকাণ্ড কলসীর মতো পেট দেখে মনে হয় প্রত্যেকটার পেটে কৃমিভরা। বারান্দার একধারে কইলুর বউ 'গুলত্‌থি' (ক্ষুদ সিদ্ধ) ফ্যান আর নুন দিয়ে মেখে খাওয়াচ্ছিল ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে। তার হাতে মাছি বসছে বার বার। মাঝে মাঝে হাত নেড়ে সেগুলো তাড়িয়ে দিচ্ছে বটে, কিন্তু মাছি সম্বন্ধে সে তত চিন্তিত নয়। সে বেশী চিন্তিত ওই এক থালা গুলত্‌থিতে অতগুলো ছেলেমেয়ের পেট ভরবে না এই ভেবে। অপেক্ষাকৃত বড় একটা মেয়ে—মিলিয়া—উঠোনের দেওয়ালে গোবর ঠুকে ঘুঁটে দিচ্ছিল। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে গোবর কুড়িয়ে এনেছে। সে একবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে 'গুলত্‌থি'র থালার দিকে চেয়ে দেখল। সে জানে 'মৌসি' তাকে 'গুলত্‌থি' দেবে না। একটু আগে সে এক ডেলা ছাতু খেয়েছে। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে কাঠ ফাটছে। ঠোঁট ফাঁক করে একদল কাক এসে বসেছে দেওয়ালের উপরে, উঠোনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নোংরাগুলোর লোভে। ভজুয়া—কইলুর এক ভাগ্নে বলল উঠোনের যে দিকটায় ঘরের একটা চাল ভেঙে পড়েছে সেখানে নাকি 'গহুমনা' সাপ বেরিয়েছিল কাল। কইলু ঘরের মধ্যে একটা ছেঁড়া ময়লা কাঁথার উপর শুয়েছিল। চারদিকে, বিষ্ঠা আর বমি। কইলুর চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গেছে, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। কইলুর মা আর দিদিমা তার কাছে বসে আছেন। কইলুরই বয়স পঞ্চাশের উপর। তার মা দিদিমা তবু

কিন্তু এখনও বেশ শক্ত সমর্থ। কইলুর বড় মেয়ে রাজিয়া কলে জল আনতে গিয়েছিল। সে এক বালতি জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেয়েটি যুবতী। কিছুদিন আগে বিধবা হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে যে মুষড়ে পড়েছে তা মনে হয় না। রঙীন কাপড় পরে আছে, গয়নাও গায়ে আছে দু'এক-খানা। কিন্তু সবচেয়ে যা প্রবলভাবে আছে তা তার যৌবন। সর্বাঙ্গে উপচে পড়ছে যেন। গুজব থানার কনেষ্টেবল তেজ সিং নাকি তার প্রণয়ী। ওই কনেষ্টেবলই আমাকে ডেকে এনেছিলেন এখানে। আমি সম্প্রতি এখানে সরকারী হাসপাতালে বদলি হয়ে এসেছি, সেজন্য থানার লোকেদের সঙ্গে স্বভাবতই একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আমার। কনেষ্টেবল তেজ সিং আমাকে বলেছিল এরা আমাকে 'ফি' দেবে। কিন্তু এদের অবস্থা দেখে 'ফি'-য়ের কথা আর ভাবতে পাচ্ছি না। আমার সবচেয়ে বড ভাবনা হয়েছে এখন—এ অবস্থায় কি করে কইলুর চিকিৎসা করি। ঝুঁকে তার নাড়ীটা দেখতে গেলাম, পট করে প্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। তবু দেখলুম নাড়ীটা। নাড়ী পাওয়া গেল না।

"কইলু—"

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, "জি হুজুর—"

"কৈসা হ্যায়—"

"আচ্ছা হ্যায় হুজুর। পেটকা গর্দা সব নিকল গিয়া"।

বুঝলাম স্যালাইন দিলে এ বাঁচবে। বাইরে কনেষ্টেবলটি দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম—"একে পানি চড়াতে হবে। এখানে হবে না। হাসপাতালে নিয়ে চল। কি করে নিয়ে যাবে বল তো—"

"ডুলির বন্দোবস্ত করছি এখুনি। একটা দড়ির খাটিয়ায় ডুলি বানিয়ে ফেলব! হে রে—ভিকুয়া"—

ভিকুয়া নামক একটি বলিষ্ঠ যুবক পাশের একটা কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"একটা খাটিয়া দেকে ডুলি বানা করকে কইলুকো হাসপাতাল লে চল তুরন্ত।"

"জি হুজুর"—

পুলিশের আদেশ অমান্য করবার সাহস এদের নেই।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। চারদিক খাঁ খাঁ করছে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

কনেষ্টেবল আমাকে আমার ফি দিতে এল। নিজের পকেট থেকেই দিচ্ছে মনে হল। প্রেমের অসাধ্যসাধন করবার ক্ষমতা আছে। বললাম, "না, আমাকে ফি দিতে হবে না। তুমি বরং কিছু ফিনাইল কিনে ওদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার করিয়ে দাও। আর একটা মেথর ডেকে"—

"সব হয়ে যাবে হুজুর।"

আমার মোটরটি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, তাতে গিয়ে চড়লুম। যেতে যেতে মনে হল কি জঘন্য দরিদ্র জীবন যাপন করে এরা। খেতে পায় না, রোগে ভোগে, শিক্ষা নেই, মাথা গোঁজবার জায়গা পর্যন্ত নেই। জীবন-যুদ্ধে এরা কি টিকবে? মনে হল জন্ম-নিয়ন্ত্রণই এ সমস্যার সমাধান। শিক্ষাও চাই।

দুই

দশ বছর পরে সিভিল সার্জন হয়ে আবার সেই ভাগলপুরেই এলাম। দশ বছর আগে যারা পরিচিত ছিল তারা আর কেউ নেই। সব নতুন মুখ। হঠাৎ একদিন এক পুরাতন লোক এসে সেলাম করে দাঁড়াল। সেই পুলিশ কনেষ্টেবলটি। তার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে। সে এখন হাবিলদার। এস-পি সাহেবের সুনজর আছে। হয়তো ছোট দারোগাও হয়ে যাবে কিছুদিন পরে। এই সংবাদটি দিয়ে সে বললে—"ফের একবার হুজুরকে তকলিফ' করতে হবে। সেই কইলু চামার পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছে। সে খাপরা ছাইবার জন্য একজনদের চালে উঠেছিল। চালের 'বাত্তি' (বাঁখারি) একদম পচে গিয়েছিল। হড়হড়িয়ে সেখান থেকে পড়ে গেছে বেচারা। আপনিই হুজুর বাঁচিয়েছিলেন একদিন ওকে—"

তখন বর্ষাকাল। বৃষ্টি পড়ছিল। বললাম,

"বৃষ্টিটা থামুক, তারপর গিয়ে দেখে আসব।"

"আমি কি তাহলে অপেক্ষা করব?

"অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমি তো বাড়ি চিনি—"

"আচ্ছা, তাহলে ওদের বাড়িতে গিয়েই অপেক্ষা করছি।"

হাবিলদার চলে গেল।

গেলাম আমি একটু পরে। গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। দশ বছর আগে গ্রীষ্মকালে যে জায়গাটা মরুভূমির মতো মনে হয়েছিল বর্ষাকালে তার চেহারা বদলে গেছে চারিদিকে সবুজ দূর্বাদলে ছেয়ে গেছে। কইলুকে দেখে অবাক

হয়ে গেলাম। তার চেহারা বিশেষ বদলায়নি দশ বছরে। তার মা দিদিমাও বেঁচে আছে দিব্যি। কইলুকে পরীক্ষা করে দেখলাম। হাড়টাড় ভাঙেনি। গরম চূণে-হলুদ লাগিয়ে কয়েকদিন শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে। আমি এসেছি খবর পেয়ে বাড়িশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। যাদের খুব ছোট দেখেছিলাম—সেই সীতিয়া, সোনিয়া, গীতিয়া, কাক্রু, কালেশ্বরী, ঝুমা, খুদুরবা, সেই খৈনি, মৈনি, টুনটুন, হরিয়া, তেতরা—সবাই এখন বড় হয়েছে, সতেজ বন্ত চারার মতো সকলেরই চোখেমুখে লাবণ্য, দু'একজনের দেহে যৌবনের আভাসও দেখা দিয়েছে। কইলুর বড় মেয়ে রাজিয়া আবার চুমানা করেছে, তার তিনচারটি ছেলে-মেয়ে। দশ বছর আগে সাত-আট বছরের যে মিলিয়াকে ঘুঁটে ঠুকতে দেখেছিলাম সে এখন যুবতী, তারও সারা দেহে যৌবনের জোয়ার এসেছে। মনে হল হাবিলদার সাহেব এখন এরই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। দশ বছর আগে মনে হয়েছিল এরা জীবন-যুদ্ধে হেরে যাবে। কিন্তু দেখছি হারেনি। জিতেছে। আমিই হেরে গেছি। আমি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতায় বিশ্বাসী হয়ে একটি ছেলে, একটি মেয়ে হবার পর আমার স্ত্রীর টিউব কাটিয়ে ফেলেছিলাম। ছেলেটি পাইলট হয়েছিল। প্লেনক্র্যাস (plane crash) হওয়াতে মারা গেছে। মেয়েটির টি-বি হয়েছে। স্যানাটোরিয়ামে আছে সে। আমার মোটর আছে, মোটা মাইনে আছে। নানারকম ফার্ণিচার আছে। গিন্নীর অনেক অলঙ্কার আছে, আমার সম্মান প্রতিপত্তি আছে কিছু। কিন্তু সুখ নেই। এদের ওসব নেই, কিন্তু মনে হল নানা দুর্দশা সত্ত্বেও এরা আমার চেয়ে বেশী সুখ। ওরা জিতেছে, আমি হেরে গেছি। মরশুমি ফুলরা দূর্বার কাছে হেরেই যায়। এর কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটল যাতে বুঝলাম সত্যিই আমরা হেরে যাচ্ছি।

এখানে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন হল। একটি শিক্ষিত বাঙালী যুবক কমিশনার হবেন বলে চেষ্টা করেছিলেন নানারকম। কিন্তু তিনি ওই কইলুর কাছেই হেরে গেলেন। কইলুও ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল আর তার জাতভাইরা সংখ্যায় এত বেশী যে বাঙালী বাবুকে সে অনেক ভোটে হারিয়ে দিলে।

আমার মনে হল শৌখিন মরশুমি ফুলের গাছ দূর্বাদের কখনও হারাতে পারবে না।

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিল এবার লাউড্ স্পীকার আনানো হয় নাই। ঝুমরির মায়ের কণ্ঠেই এবার লাউড্ স্পীকার বাজিতেছে। ঝুমরির মা তাহার বাঁকা কোমর সোজা করিয়া গলার শির ফুলাইয়া কাংস্যকণ্ঠে যেভাবে তাহার ভাসুর-পো শিবলালের উদ্দেশে গালি বর্ষণ করিতেছে তাহাতেই যথেষ্ট গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে। সে গোলমালে অবশ্য গানের লেশমাত্র নাই, কিন্তু গান যে একেবারে নাই তাহা নহে, মৃত্যুঞ্জয় জানে গানও আছে। সে গান ঝুমরির বুকের ভিতর বাজিতেছে। আর কেহ না শুনুক মৃত্যুঞ্জয় শুনিতে পাইতেছে সেটা। সে গানের গমক ঝুমরির চোখেমুখে ভাবেভঙ্গীতে বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে।

ঝুমরির জ্যাঠতুতো দাদা 'চুমানা'য় আপত্তি করিয়াছিল। সে বলিতেছিল যে, যদিও কাহার সমাজে বিধবারা 'চুমানা' নামে একটা প্রহসন করিয়া দ্বিতীয় একটা পুরুষের সঙ্গে বাস করে, কিন্তু সেটা কি উচিত না শোভন? বাধ্য না হইলে কাহারও চুমানা করা উচিত নয়। শিবলালের মুখে একথা শুনিয়া মৃত্যুঞ্জয় কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছিল; ঝুমরির মা শিবলালকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তবে তুই বউ মরিতে না মরিতে 'চুমানা' করিতে গেলি কেন?

শিবলাল বলিল, সে কখনই চুমানা করিত না যদি ঝুমরির মা কিম্বা ঝুমরি তাহার সংসারের ভার লইত। কিন্তু সে দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিল না। সে একা কি পাঁচটা ছেলেমেয়ে লইয়া সামলাইতে পারে? বাধ্য হইয়া সে চুমানা করিয়াছে।

এই সব যুক্তি মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ভালো লাগিতেছিল। কিন্তু যুক্তি শেষ পর্যন্ত টিকিল না। দেখা গেল ঝুমরি 'চুমানা' করিবেই এবং রামটহলকেই করিবে। তাহার মতে রামটহলের মতো যুবক বিরল। ঝুমরির দুটি মেয়ে আছে—সুখিয়া এবং দুখিয়া। দুজনেই খুব ছোট। রামটহল বলিয়াছে তাহার দুই মেয়ের ভারই সে 'গছিয়া' লইবে। মেয়েরা বড় হইলে তাহাদের স্কুলে পড়াইবে, তাহার পর ধুমধাম করিয়া বিবাহ দিবে। রামটহলকে খুব পছন্দ তাহার। খুব ভালো। বয়সও অল্প। ঝুমরির চেয়ে বোধহয় ছোটই। জব্বলপুরে পাকা ঘরদুয়ার আছে। চোখে মুখে কেমন একটা দুষ্টু দুষ্টু ভাব। চমৎকার!

শিবলাল আর একটা 'হক্‌' কথাও বলিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় আশা করিয়াছিল একথা শুনিয়া হয়তো ঝুমরির মা অন্তত একটু ভাবিবে।

শিবলাল বলিয়াছিল—"যদি চুমানা করতেই হয় তাহলে নিজের জাতের চেনা-শোনা লোকের সঙ্গে করাই উচিত। নয়া-বাজারের দুখন, ভিখনপুরের লখিয়া আমাদের জাত, লোকও ভাল। অবস্থাও খারাপ নয় তাদের। দুখন বিড়ি পাকায়, লখিয়া রিক্‌শা টানে। এদের বউও অনেকদিন আগেই মরেছে, এরা দুজনেই 'চুমানা' করতে চায়। ঝুমরিকে পেলে তারা লুফে নেবে।"

এ কথাটা অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়ের ভালো লাগে নাই। ঝুমরিকে কেহ লুফিয়া লইতেছে এ দৃশ্যটা মোটেই মনোরম হয় নাই তাহার। তবে এসব কথা শুনিয়া ঝুমুরির মা যদি মত বদলায় এই আশায় ছিল সে।

মত কিন্তু বদলাইল না। ঝুমুরির মা বলিল—"ঝুমুরি যাকে পছন্দ করেছে তাকেই 'চুমানা' করুক। তুমি নিজেই তো অনেক দেখে শুনে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলে। তখন অনেক কিছু বলেছিলে তুমি। আমরাও তোমার কথায় বিশ্বাস করে ঝুমরির বিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল, একটা ন্যাংটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি তার। তার নিজের ঘরদুয়ার কিছু ছিল না। ভাইয়ের আশ্রয়ে থাকত সে রোজগার করত না এক পয়সা, তার ওপর ছিল থাইসিস রুগী। আমাদের ডাক্তারবাবু তাকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল। তাই বেঁচেছিল কিছুদিন। না বাঁচলেই ভালো হত, বেঁচে ছিল বলেই পর পর দুটো মেয়ে হল। লাভ হল কি তাতে! তুমি আর বিয়েতে কথা বলতে এসো না। ও নিজে পছন্দ করে যাকে চুমানা করছে তাকেই করুক।"

মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মর্মান্তিক কথাগুলি শুনিল। তাহার পর সুখিয়া দুখিয়ার কাছে গিয়া দাঁড়াইল খানিকক্ষণ।

ঝুমরির মা বলিল, "আমাদের সমাজে 'চুমানা' কে না করছে? আমিই তো আমার বড় ব্যাটার 'চুমানা' করিয়েছি। ঝুমরির কিই বা বয়স। এখনও চব্বিশ বছর পার হয়নি। তুমি আর বাগড়া দিতে এসো না।"

শিবলাল তবু ছাড়ে নাই। ঝুমরিকে আলাদা ডাকিয়া বলিয়াছিল—"তুই জব্বলপুরের ওই অচেনা ছোঁড়াটার সঙ্গে জুটেছিস কেন? ওকে কে চেনে? ও যে আমাদের জাত তারই বা ঠিক কি? যদি 'চুমানা' করতেই চাস আমি চেনা-শোনা ভাল ছেলে দেখে দিচ্ছি।"

ঝুমরি ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছিল তাহা মৃত্যুঞ্জয়ের কানে মধু বর্ষণ করে নাই।

ঝুমরি বলিয়াছিল—"আমি স্বেচ্ছায় কূয়ায় ঝাঁপ দিচ্ছি তোমাদের তাতে কি ? আমার ভৌজি (বৌদি) যখন মেরে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল তখন তোমরা কেউ আমাকে বাঁচাতে আসনি। আমি বাবুদের বাড়িতে 'নোকরি' করে অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন তোমরাই আমার নামে ফুসফুস্ গুজগুজ করে নানারকম বলতে। দু'তিনটে বদমাস গুণ্ডা সত্যিই রোজ আমার পিছু পিছু ঘুরতো, কিন্তু কই তোমরা তো কেউ এসে তাদের আটকাওনি! আমি নিজে রোজকার করেই খেয়েছি, তোমরা কেউ কোনোদিন ডেকে আমাকে একমুঠো খেতেও দাওনি। এখন আমি একজনকে পছন্দ করে 'চুমানা' করতে যাচ্ছি আর তুমি ফফরদালালি করতে এসেছ। লজ্জা করে না তোমার ? তুমিই তো আমার সর্বনাশ করেছ, কি লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলে তা কি তোমার মনে নেই—"

ঝুমরির চোখ দিয়া যেন আগুনের হলকা বাহির হইতে লাগিল। নির্বাক নিরুপায় মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া দেখিল সব। বুঝিল ঝুমরিকে আর রোখা যাইবে না। সে রামটহলকেই চুমানা করিবে। সহসা মৃত্যুঞ্জয়ের চোখে পড়িল ঝুমরির ছোট মেয়েটা ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। সুখিয়াও ম্লানমুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছে একধারে। মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা হইল দুখিয়াকে কোলে তুলিয়া লয়। কিন্তু পারিল না।

যেদিন চুমানা হইবে সেদিনও মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির পাশে পাশে ঘুরিতেছিল। নীরবেই চুমানার আয়োজন দেখিতেছিল সে। এমন সময় দেখা গেল বাহিরে একটা অচেনা লোক আসিয়াছে। সে বলিল জব্বলপুর হইতে রামটহলের বাবা তাহাকে পাঠাইয়াছে। তাহার বাবা খবর পাঠাইয়াছে যে বেবা (বিধবা) মেয়ের সহিত রামটহলের 'চুমানা' সে হইতে দিবে না। একটি কুমারী মেয়ের সহিত রামটহলের বিবাহ দিবে। শিবলাল নিকটে দাঁড়াইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় বুঝিল শিবলাল শেষ চেষ্টা করিতেছে। শিবলালের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। কিন্তু শেষ চেষ্টাও বিফল হইল। ঝুমরির মা সিংহিনীর মতো আগাইয়া আসিয়া গালাগালির তুবড়ি ছুটাইতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হইল লাউড স্পীকারের অভাব পূর্ণ হইল এতক্ষণে!

পাড়ার সবাই আগাইয়া আসিয়া বলিল, এখন সব আয়োজন হইয়া গিয়াছে। এখন চুমানা বন্ধ হইবে না। রামটহল সেই লোকটিকে বলিল, তোমাকে আমি চিনি না। যাই হোক, তুমি বাবুজিকে গিয়া বল, আমি এখানেই চুমানা করিব। কুমারী মেয়ে আমার চাই না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। শিবলালের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

মৃত্যুঞ্জয় লক্ষ্য করিতে লাগিল যদিও লাউড স্পীকার বাজিতেছে না কিন্তু অন্যান্য আয়োজন কিছু কম হয় নাই। রামটহল ঝুমরির জন্য অনেক জিনিস আনিয়াছে। দামী শাড়ী, দামী জামা, গহনাও অনেক। রূপার গহনাই বেশী, একটা সোনার টিকলিও আছে। ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার আনিয়াছে। খাজা, টিকরি, বোঁদে, সে-ও ভাজা, মণ্ডা, লুচি অনেক।

হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয় দেখিতে পাইল দুখিয়া, দুখিয়ার মুখেও হাসি ফুটিয়াছে। রামটহল তাহাদের জন্যও রঙীন জামা কিনিয়া আনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নীরবে সব দেখিতে লাগিল। একবারও তাহার নাম কেহ উচ্চারণ করিল না। একবারও না।

অবশেষে সিন্দুর দান হইয়া গেল ! সীমন্তে সিন্দুর পরিয়া এবং তাহার উপর সোনার টিকলি ঝুলাইয়া ঝুমরিকে অপরূপ দেখাইতেছিল। সত্যই অপরূপ।

মৃত্যুঞ্জয় নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি তিনটার সময় দুইটা রিকশায় চড়িয়া বর বধূ তাহাদের নূতন বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। মৃত্যুঞ্জয়ও তাহাদের রিকশার পিছু পিছু চলিল।

মৃত্যুঞ্জয় ঝুমরির প্রথম পক্ষের স্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্বে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

শেষের ছবি

প্রথম যৌবনে তাহার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বন্ধুত্ব হইবার পর মনে হইয়াছিল এমন একটা জিনিস পাইলাম যাহা সহজে পাওয়া যায় না। রাত্রি জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় বেশ ভাল নম্বর পাইয়াছিলাম। সেই নম্বরই আমাকে ঠেলিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের কূলে তুলিয়া দিয়াছিল। কূলে দেখিলাম বাঁশী হাতে শ্যাম দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। শ্যাম যে রাধার উদ্দেশ্যে বাঁশী বাজাইতেছে সে বৃন্দাবনবাসিনী রাধা নহে, সে বিদেশিনী। কখনও ফরাসী দেশে থাকে, কখনও বা রাশিয়ায়। সাহিত্যের কুঞ্জবনে শ্যামচাঁদ সেই অশরীরিণী নায়িকার মাঝে মাঝে দেখা পাইত এবং বাঁশী বাজাইত। সেই নায়িকা মুগ্ধ হইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। একজোড়া বাঁয়া-তবলা জোগাড় করিয়া তাহার সহিত মাতিয়া গেলাম সুর সাধনায়। কিছুদিন পরে আরও আরও জমিয়া গেল, আসরে সুরা দেবীও আসিয়া যোগ দিলেন।

সকলে আমাদের বলিত মাণিকজোড়। এক সঙ্গে শোয়া-বসা, এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, এক চায়ের দোকানে আড্ডা মারা, এক সঙ্গে কন্টিনেন্টাল উপন্যাস পড়া, এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখা। হায়, প্রগতির পথে পিতারা চিরকাল কণ্টক স্বরূপ। আমার পিতা একেবারে পর্বতের মতো পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পাইলাম, অবিলম্বে চলিয়া এস। গেলাম। পিতা গাল মন্দ করিলেন না, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে আর কলিকাতায় পড়িতে হইবে না, এখানকার কলেজেই ভরতি হইয়া যাও। পিতা অনমনীয় চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া বহরমপুর কলেজেই ভরতি হইয়া গেলাম। এজন্য এখন এই বৃদ্ধবয়সে স্বর্গীয় পিতার চরণে বারম্বার প্রণতি জানাই। এখন আমি মুনসেফ, আশা আছে, রিটায়ার করিবার পূর্বে সাবজজ হইতে পারিব। শ্যামের সহিত বাঁশী বাজাইলে এসব হইত না।

শ্যামকে কিন্তু একেবারে বর্জন করিতে পারি নাই। চিঠি লেখালেখি চলিত। তাহার প্রথম চিঠিটার অংশ বিশেষ পড়িয়া এখন ভারি মজা লাগিতেছে।

"তোমরা ভাল ছেলে। ভালত্বের বাঁধা সড়কে চলিয়া একদিন তোমরা

একটা নির্দিষ্ট নাম-করা সরাই-খানায় পৌঁছাইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা বাঁধা সড়কের ধার ধারি না, যে পথে কেহই চলে নাই আমরা সেই পথের পথিক। আমাদের পথের বর্ণনা কবি নজরুল ইসলাম দিয়াছেন—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'। কিন্তু এ কবিতায় কবি কল্পনা করিয়াছেন সঙ্গে আরও যাত্রী আছে। কিন্তু আমি যে পথে চলিয়াছি, সে পথে কেহ নাই, আমি একা এমন কি সুনামও আমার সঙ্গী নহে। সবাই বলে আমি বখাটে ছেলে। সামাজিক অভিধানে সম্ভবত উহাই আমার সংজ্ঞা। কিন্তু আমার একমাত্র সান্ত্বনা শেলী কীটস্‌, গ্যয়ঠেও একদিন আমার দলের লোক ছিলেন। সমাজের কাছে তাঁহারা ভালো ছেলের সার্টিফিকেট পান নাই। কিন্তু আমি একটা অভাব বোধ করিতেছি। মেয়েরা সাধারণত পুরুষের প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে, তাহাকে অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত করিতে উৎসাহ দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম মেয়ে কোথায়? সবাই যে ছাঁচে-ঢালা পুতুল—হয়-খেঁদি-নেড়ি-বগী-বিন্দীর ছাঁচে ঢালা, না হয় তথাকথিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজের ছাঁচে ঢালা। স্বকীয়তার দীপ্তি কাহারও মধ্যে দেখি না। মেরি ক্লগলে, বা হ্যারিয়েট লটির মতো মেয়ে আমাদের ভদ্রসমাজে কই? সবাই মুখস্থ করা নীতিকথা বলে; প্রাণের কথা কাহারও মুখে বড় একটা শুনি নাই। সোনিয়ার মতো মেয়ে এদেশের মাটিতে কল্পনাতীত। শেরীর দাম সম্প্রতি প্রায় আকাশচুম্বী হইয়াছে। তুমি সিঁড়ি ছিলে, অনেক আকাশচুম্বী বস্তুই আহরণ করিতে পারিতাম। এখন সাধারণ ব্যাণ্ডি জোটানই দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। ধ্যান্যেশ্বরীর সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছি, যদি তাহার প্রেমে পড়িতে পারি। একজন বহুদর্শীর মুখে শুনিলাম, ধ্যান্যেশ্বরী শুধু যে সস্তা তাহাই নন, শরীরের পক্ষে উপকারীও। তিনি অবশ্য গাঁজাকেই সর্বোচ্চ সম্মানের আসন দিলেন, কিন্তু ভাই গাঁজা খাইতে পারিব না…"।

দ্বিতীয় আর একটি পত্রে দেখিতেছি:

ভাই শিবেন, শুনিলাম তুমি ভাল করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। জানি এইবার তোমাকে লাইন ধরিতে হইবে। এই লাইন ধরিয়া যে টার্মিনাসে পৌঁছিবে তাহার একটা বাঁধাধরা ছবি তোমার জানা আছে। আমি যে পথে চলিয়াছি তাহারও একটি নাম সবাই জানে। সে নামটি 'অজানা'। আমি সম্প্রতি একটি খবরের কাগজে প্রুফরিডারের চাকরি পাইয়াছি। বেতন যৎ-সামান্য, সিগারেটের খরচটা কোনক্রমে উঠিয়া যায়। আমার বাকি খরচ যে

চালায়, তাহার নামটা আর নাই বলিলাম, তাহার নাম আর পরিচয় শুনিলে, তোমার হয়তো শারীরিক ও মানসিক বিক্ষোভ হইবে। প্লীহা চমকাইয়া যাইবে, নাসিকাও কুঞ্চিত হইয়া কুৎসিত রূপ ধারণ করিবে। সুতরাং নামটা আর করিব না। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ মেয়েটি মানবী রূপে দেবী। সমাজ বা সংসার তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই। তবু সে সদা হাস্যমুখী। তবু তাহার গানের ঝঙ্কারে স্বর্গীয় সুর। যদি কোনদিন এ অঞ্চলে আস আলাপ করাইয়া দিব। আমার বাবাও আর একটি আশ্চর্য লোক। এখনও আমাকে টাকা পাঠাইয়া যাইতেছেন। তাঁহার বোধহয় এখনও আশা আছে, আমি বি. এ. পাশ করিয়া তাঁহার আপিসে একদিন ঢুকিব। আমি যে অন্যত্র চাকুরি লইয়াছি সে কথা তাঁহাকে এখনও জানাই নাই। জানাইলে হয়তো তিনি টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়া দিবেন। এ বাজারে মাসে পঞ্চাশ টাকা তুচ্ছ করিবার মতো নয়। তবে এখন যে বন্দরে আমার নৌকা লাগিয়াছে তাহাতে মনে হয় আপাতত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। সোনা আমাকে একসেট ভালো কবিতার বই কিনিয়া দিয়াছে। ওই দেখ. নামটা শেষে বলিয়াই ফেলিলাম। কথাটা যেন চাউর করিও না। আলাপ হইলে দেখিবে, যে সব বড় প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা তোমাদের বাণীমন্দির অলংকৃত করিতেছেন সোনা তাহাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু সে সমাজের চক্ষে পতিতা ছাড়া আর কিছু নয়। স্যাফোর কথা নিশ্চয় শুনিয়াছ, আমার মনে হয় সোনা স্যাফোরই সম-গোত্রীয়া।

আর একটি চিঠিতে দেখিতেছি—

"ভাই বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। বাবা এক জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। মেয়ে সুলক্ষণা এবং সদ্বংশীয়া। এ দুটি গুণ ছাড়া আর কোনো গুণ নেই। দেখতে কুৎসিৎ, লেখাপড়ায় 'ক' অক্ষর গোমাংস। অত্যন্ত রোগা। আমি আপত্তি করেছিলাম। বাবা সেকেলে গোঁড়া লোক। আমাকে জানিয়েছেন—তুমি যদি বিয়ে না কর, তাহলে তোমার ভায়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব আর আমার বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব তোমাকে। আমি ওদের কথা দিয়েছি। আমার কথার নড়চড় হবে না। ফেরত ডাকেই তোমার উত্তর চাই। আমি যে কি করে এই গোঁয়ারগোবিন্দ বাপের ছেলে হলুম তা ভেবে পাই না। মত দিয়েছি, মানে দিতে হয়েছে। তুই কি আমার বিয়েতে আসবি?"

আমার যাওয়া হয় নাই। সামনেই পরীক্ষা ছিল। সেদিন পুরাতন চিঠি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে শ্যামের আরও চিঠি পাইলাম। একটা চিঠি এইরূপ—

"ভাই সোনাকে নিয়ে বিপদে পড়েছি। বাবা কলকাতায় একটা বাসা ভাড়া করে পিসিমা আর আমার বউকে এখানে পাঠিয়েছেন। সোনা বলছে তুমি আর আমার এখানে থেকো না। তুমি নির্মলার কাছে গিয়েই থাক। তোমার যদি টাকার দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও। সোনাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারছি না। সে আমাকে কিছুতেই তার কাছে থাকতে দেবে না। আমি যে সোনার বাসাতে থাকি এবং সোনাই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন সব—একথা বাবা টের পেয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। তা না হলে এখানে বাসা ভাড়া করতে যাবেন কেন? সোনার সঙ্গে রফা হয়েছে একটা শেষকালে। তাকে বলেছি নির্মলার কাছে মাঝে মাঝে যাব। ইতিমধ্যে একদিন গিয়েছিলাম রাত্রি দুটো নাগাদ, মত্ত অবস্থায়। গলিতে ঢুকে দেখলাম আমাদের বাড়ির জানলার আবছা অন্ধকারে একটি রোগা মেয়ে গরাদে ধরে পথের দিকে চেয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে ছুটে নেমে এসে কপাট খুলে দিলে। আমি কোনও খবর দিয়ে যাইনি। হঠাৎ মনে হল রোজই দাঁড়িয়ে থাকে না কি! জিগ্যেস করাতে চুপ করে রইল।"

শ্যামের আর কোনো চিঠি পাইলাম না। সোনার এক নামজাদা ধনী বাবু ছিলেন। তিনি সোনাকে লইয়া ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সোনার অনুরোধে শ্যামও তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে গিয়াছিল। প্রায় তিন-চার বৎসর তাহার কোনো খবর পাই নাই। হঠাৎ একদিন আমার আর এক বন্ধুর নিকট খবর পাইলাম শ্যাম খুব অসুস্থ। সে কলকাতায় সোনার বাসাতেই আছে। একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতায় অন্য একটা কার্যোপলক্ষে যাইতে হইয়াছিল, ভাবিলাম শ্যামকেও দেখিয়া যাই, অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই। তাহার বাসায় যখন পৌঁছিলাম তখন সোনা বাড়িতে ছিল না। খবরটা শুনিয়া আরাম বোধ করিলাম। দেখিলাম শ্যাম একাই বিছানায় শুইয়া একটা বড় ছবির অ্যালবাম দেখিতেছে।

"তুই একাই রয়েছিস?"

"হ্যাঁ, সোনা ডাক্তারের কাছে গেছে।"

"শুনলাম তোর খুব অসুখ। কি হয়েছে?"

"যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা। রাজকীয় জীবন-যাপন করেছি তো—"

তাহার কোটরগত চক্ষু, খাঁড়ার মতো নাক, চোপসানো গালকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহার সেই হাসিটি ফুটিয়া উঠিল।

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হয়ে অবশেষে এইখানে এসে পৌঁছেছি। যবনিকা পড়বার আর দেরি নেই।"

খক খক করিয়া কাশিতে লাগিল।

"জীবনটা যে দ্রুত চট্ করে শেষ হয়ে যাবে তা ভাবিনি। শেষ হয়ে যাওয়াই নিয়ম অবশ্য"—আবার কাশিতে লাগিল।

বলিলাম, "ওসব কথা থাক। ইয়োরোপে গিয়েছিলে শুনলাম, কি কি দেখলি সেখানে—"

"দেখলাম দুরন্ত জীবন-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। আর দেখলাম ওদেশের আর্ট গ্যালারিগুলো। প্রতিভাবান শিল্পীদের অমর সৃষ্টি সব। অনেক ছবি, অনেক মর্মর মূর্তি। আর দেখলাম সোনাকে। ওরকম মেয়ে হয় না, ও আমার জন্যে যা করেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন ভুল করেছি। রূপ, লেখা-পড়া, শিল্প, নাচ-গান, সাহিত্য এই সব নিয়েই তো জীবন কাটল—কিন্তু তবু মনে হচ্ছে—"

চুপ করিয়া শূন্যের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর হাসিয়া বলিল—"ছবি তো অনেক রকম দেখলাম। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটি ছবিই কেবল চোখের উপর ভাসছে, আর বাকী সব মুছে গেছে—"

"কি ছবি সেটা?"

"একটা রোগা মেয়ে অন্ধকার রাত্রে জানলার গরাদে ধরে রাস্তার দিকে আকুল নয়নে চেয়ে আছে। এ ছবিটা সব ছবিকে আড়াল করে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, মনে হচ্ছে ওইটেই শেষ পর্যন্ত থাকবে।"

বুঝিলাম আমি আসাতে শ্যাম একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। বেশীক্ষণ ছিলাম না, চলিয়া আসিলাম।

পরদিনই শুনিলাম শ্যামের মৃত্যু হইয়াছে।

চুনোপুঁটি

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি দেশে ফিরিতেছে। দেশে মানে, মোহনপুর গ্রাম এই মোহনপুর হইতে পুঁটিকে একদা পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সে চুরি কিংবা খুন করে নাই, বস্তুত পিনাল কোডের কোনও ধারাই তাহার গ্রামত্যাগের হেতু ছিল না। অপরাধ—সে কালো। তদুপরি পিতৃহীন এবং দরিদ্র। শতাধিক লোক তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে বধূরূপে নির্বাচন করিবার প্রেরণা পায় নাই। পুঁটির বিধবা মা একজনের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়াছিলেন, তবু তাহার মন গলে নাই। শরৎবাবুর 'অরক্ষণীয়া' গল্পেরই পুনরাবৃত্তি চলিতেছিল। এক্ষেত্রেও একজন বড়লোকের ছেলে ছিল। গ্রামেরই একজন ধনী মহাজনের পুত্র, ধীরেশ। পালটি ঘর বলিয়া পুঁটির মা সসঙ্কোচে একদিন তাহার নিকট কথাটা পড়িয়াছিলেন। ধীরেশ তাহার প্রিয় বন্ধু কদমের সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল, পুঁটির বিধবা মা পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিলেন। সুযোগ দেখিয়া পুঁটির মা কথাটা তাহার কাছে পাড়েন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ধীরেশ যদি আশ্বাস দেয় তাহা হইলে তাহার বাবাব পায়ে গিয়া আছড়াইয়া পড়িবেন। কথাটা শুনিয়া ধীরেশ কয়েক মুহূর্ত ভ্রূযুগল উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোকরা বি. এস-সি. পর্যন্ত পড়িয়াছিল।

হঠাৎ প্রশ্ন করিল—"নেপচুনের নাম শুনেছেন ?"

"নেপচুন ? না। নেপালের নাম শুনেছি। ও হ্যাঁ, আমাদের ফুলুর খোঁড়া ছেলের নাম নেংচু রেখেছিল, তার কথাই বলছ কি. ওরা তো এখানে নেই—"

কদম বলিল—"ও কথা ছেড়ে দিন মাসীমা। ধীরুর বীয়ে ঠিক হয়ে গেছে এক জায়গায়—"

"ও তা তো জানতুম না বাবা! আমার পুঁটির জন্যে একটি পাত্র দেখে দাও না বাবা তোমরা—"

"চেষ্টা করব!"

পুঁটির মা চলিয়া গেলে কদম জিজ্ঞাসা করিল।

"হঠাৎ নেপচুনের কথা ওঁকে জিগ্যেস করলে কেন ?"

"বামন হয়ে চাঁদে হাত কথাটা প্রচলিত আছে। কিন্তু বামন হয়ে নেপচুনে হাত দিতে চাইছেন উনি। সেই কথাটাই ওঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম—"

"কল্পনা বটে তোমার—"

কদম মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিয়া রহিল। ধীরেশ বলিল, "মেয়েটার রং যদি আর একটু ফরসা হ'ত তাহলেও ভেবে দেখতাম। মুখ চোখ গড়ন ভালই, কি বলিস—"

কদম বাম চক্ষুটি কুঞ্চিত করিয়া মনোভাব প্রকাশ করিল।

ইহার পর হইতে পুঁটির বাড়ির চারিদিকে গ্রামের যুবকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। কেহ 'সিটি' দিত, কেহ বাঁশী বাজাইত, কেহ কেহবা জটলা করিত।

পুঁটির মা অবশেষে পুঁটিকে লইয়া গভীর রাত্রিতে একদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও বলিয়া গেলেন না, কোথায় যাইতেছেন।

পাঁচ বৎসর পরে পুঁটি তাহাদের জ্ঞাতিপুত্র চঞ্চলকুমারকে জানাইয়াছে যে, তাহার স্বামীর সহিত মোহনপুরে আসিতেছে। চঞ্চলকুমার যেন তাহার বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইয়া রাখে। ইহার জন্য সে দুইশত টাকা টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইয়াও দিয়াছে।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নির্দিষ্ট দিনে পুঁটি ও তাহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুঁটির সাজসজ্জা রাণীর মতো। সঙ্গে তিনজন চাকর, দুইজন ঝি। পুঁটির স্বামী অনিন্দ্যকান্তি, ঠিক যেন রাজপুত্র! চোখ ধাঁধিয়া গেল সকলের। পুঁটি বলিল, "বছর খানেক আগে মা মারা গিয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পর গ্রামের লোকদের ভাল করে খাওয়াতে। সেই জন্যেই বিশেষ করে এসেছি আমরা—"

বিরাট আয়োজন করিয়া বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিল সে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা, আপামরচণ্ডাল, ইতর ভদ্র কেহই বাদ গেল না। গরীব-দুঃখীদের কাপড় দিল, পয়সা দিল। গ্রামের স্কুলে, মন্দিরে মোটা টাকা চাঁদা দিল। ধীরেশ এবং কদমেরও তাক লাগিয়া গেল। গরীব-দুঃখীরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

গ্রামের পাড়াপড়শীরা যাহারা পূর্বে পুঁটির রূপ লইয়া কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ করিত, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া শতমুখে পুঁটির রূপের এবং ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লজ্জাবোধ করিল না। পুঁটির স্বামীকে লইয়া গ্রামের ছোকরারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, যেমন ধনী, তেমনি দিলদরিয়া মেজাজ। চাহিতে না চাহিতে গ্রামের ফুটবল ক্লাবে, শখের থিয়েটারে, হরিসভায় ঝনাৎ ঝনাৎ করিয়া চাঁদা দিল। সকলের সহিত একদিন থিয়েটারও করিল। গানের কি গলা!

দুই সপ্তাহ মোহনপুরকে মাতাইয়া অবশেষে বিদায় লইল তাহারা।

বর্ধমান স্টেশন।

পুঁটি বলিল, "চুনো-দা এইখানেই নামবে?"

"হ্যাঁ! টাকাটা দিয়ে দাও—"

"দিচ্ছি। দুশো টাকাই নেবে?"

"বাঃ, তাই তো কথা হয়েছিল—"

"বেশ নাও"—

টাকাটা বাহির করিয়া দিল। তাহার পর বলিল, "কেমন যেন স্বপ্নের মতো পনেরোটা দিন কেটে গেল! আহা, যদি সত্য হত—"

"স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়? চললুম, আবার স্টুডিওতে দেখা হবে—"

চুনো-দা—ওরফে চুনীলাল নামিয়া গেল।

চুনীলাল এবং পুঁটি উভয়েই অভিনেতা অভিনেত্রী। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পুঁটি চুনীলালসহ গ্রামে গিয়া স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করিয়া আসিল।

ট্রেন চলিতেছে। প্রথম শ্রেণীর কামরার খোলা জানলার সামনে দিগন্তের দিকে চাহিয়া পুঁটি একা বসিয়া আছে। মাথার চুল উড়িতেছে, শাড়িটা এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই, নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে সে।

অনেক টাকা রোজগার করিয়াছে সে। বাড়ি গাড়ি সব হইয়াছে। অনেক শাড়ি, অনেক জামা, অনেক গহনা কিনিয়াছে, অনেক লোক তার পিছু পিছু ঘোরে। কিন্তু—

সহসা তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

দুধের দাম

ট্রেন আসিয়াছিল। কয়েকটি সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতী স্টেশনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই আশে পাশে জনকয়েক বাঙালী ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহ বা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়। সকলে অবশ্য যুবতীদিগকে লইয়া প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ব্যস্ত ছিল না। যাঁহার হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া বুড়ি পড়িয়া গেলেন, তিনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, কাছেই ছিলেন। তিনি বুড়িকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।

"পথ দেখে চলতে পার না? আর-একটু হলে আমার স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে যেত যে!"

বুড়ীর ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল। তবু তিনি খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া প্ল্যাটফর্মময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে। অসম্ভব। ট্রেন বেশীক্ষণ থামিবেও না। হুড়মুড় করিয়া শেষে তিনি একটা সেকেলে ইণ্টার ক্লাসে উঠিয়া পড়িলেন। যথারীতি সকলেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। বর্তমানে অবশ্য ইণ্টার ক্লাসের নাম বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস হইয়াছে।

একজন বাঙালী ভদ্রলোক ইচ্ছা করিলে একটু সরিয়া বসিয়া জায়গা করিয়া দিতে পারিতেন, তিনি জিনিসপত্র সমেত বেশ একটু ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি সরিয়া বসিলেন না উপদেশ দিলেন।

"উঠলে ত, এখন বসবে কোথায় বাছা!"

"আমি নিচে তোমাদের পায়ের কাছে বসব বাবা। দুটো স্টেশন, মাত্র, তারপরই নেবে যাব। বেশীক্ষণ অসুবিধা করব না তোমাদের।"

বুড়ী তাঁহার পায়ের কাছেই তাঁহার জুতাজোড়া সরাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অসুবিধা তেমন কিছু হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আয়তনের মানুষ গুটিসুটি হইয়া বসিয়া ছিলেন। একটু পরেই কিন্তু তিনি অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। যে পায়ে স্ট্র্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ

ব্যথা করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলেন, পা ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাবনা হইল নামিবেন কী করিয়া। আর দুই স্টেশন পরেই শুধু নামিতে হইবে না, আর-একটা ট্রেনে উঠিতেও হইবে। অথচ পা নাড়িতে পারিতেছেন না, দাঁড়ানই যাইবে না যে। ট্রেনের কামরায় অনেক বাঙালী রহিয়াছেন, অনেকে তাঁহার পুত্রের বয়সী, অনেকে পৌত্রের। কিন্তু ইঁহারা যে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে তাহা তিনি আশা করিতে পারিলেন না। তবু হয়তো ইঁহাদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইবে। উপায় কি!

বৃদ্ধা যে-স্টেশনে নামিবেন, সে-স্টেশন এইটু পরেই আসিয়া পড়িল। প্যাসেঞ্জাররা হুড়-মুড় করিয়া সবাই নামিতে লাগিলেন, বুড়ীর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিলেন না।

"আমাকে একটু নাবিয়ে দাও না বাবা, উঠে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আমি।"

বুড়ীর এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু অধিকাংশই ভান করিলেন যেন কিছু শুনিতে পান নাই।

একজন বলিলেন, "ভিখারী মাগীর অস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে ত উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—"

তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভিখারিণী নন, তাঁহার টিকিটও ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট ছিল।

আর একজন বিজ্ঞ মন্তব্য করিলেন, "এই সব হেল্পলেস বুড়ীকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!

সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন। গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ীর কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।

বৃদ্ধা তখন দুই হাতে ভর দিয়া ঘঁ্যাসটাইয়া দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু নামিতে সাহস পাইতেছিলেন না।

"এই বুড়ী, হটো দরোয়াজাসে—"

এক মারোয়াড়ী যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পিছনে এক বলিষ্ঠকায় কুলী। তাহার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল। কুলীর পিছনে চপ্পল-পায়ে নীল-চশমা-পরা লম্বা গোছের এক

ছোকরা। সে ভঙ্গীভরে বলিল, "দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!"

"পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।"

"ও দেখি যদি একটা স্ট্রেচার আনতে পারি!"

ছোকরা ভিড়ে অন্তর্ধান করিল আর ফিরিল না।

যে-বলিষ্ঠ কুলীটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"মাইজি, কিরপা করকে থোড়া হাট্‌কে বৈঠিয়ে। আনে-যানেকা রাস্তা পর্‌ কাহে বৈঠ্‌ গ্যয়ে?"

বৃদ্ধা হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

"আমি নামতে পাচ্ছি না, বাবা, পায়ে চোট্‌ লেগেছে—"

"আপ কাঁহা জায়েগা—?"

"গয়া—"

"চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।"

বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলীটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল। সোজা লইয়া গেল ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে।

"আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।"

বৃদ্ধা ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই উপবেশন করিলেন।

যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে-দুইটিতেই সাহেবী পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন। একজন পড়িতেছিলেন খবরের কাগজ, আর-একজন একখানি ইংরেজী বই। বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ আলোচনাটা পূর্বেই হইতেছিল। পুনরায় আরম্ভ হইল।

"শিভ্যলরি আমাদের দেশেরও ছিল। নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা, একথা আমাদের মনুতেই লেখা আছে মশাই।"

যিনি নারী-মূর্তি-সম্বলিত ইংরেজী মাসিক পড়িতেছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ এ খবর জানিতেন না। উঠিয়া বসিলেন।

"বলেন কি ! এ-কথা জানলে ব্যাটাকে ছাড়তুম না কি ! মনুর যুগেও যে আমাদের দেশে শিভ্যল্‌রি ছিল, আমরা যে বর্বর ছিলুম না, এ-কথা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতুম বাছাধনকে—"

বৃদ্ধা অনুভব করিলেন ইতিপূর্বে কোন সাহেবের সঙ্গে বোধহয় লোকটির তর্ক হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবতঃ এই সাহেবী পোশাক-পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গ-সুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধা মনে মনে বলিলেন, "তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যালরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।"

বৃদ্ধার বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ দখল ছিল। সেকালের বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন।

"আরে, এ আবার কোত্থেকে জুটল এসে এখানে ?"

"কোনো ভিকিরী-টিকিরী বোধ হয়।"

প্রথম ভদ্রলোক আন্দাজ করিলেন।

"সত্যি, ভিখিরীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখিরীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখফুটে চাইতেও পারে না।"

দেখা গেল ভদ্রলোকটি একটি পয়সা বাহির করিয়া বুড়ীর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন বৃদ্ধা।

"পয়সাটা তুলে নাও, পয়সাটা তোমাকেই দিলাম।"

বৃদ্ধা তবু কোনো কথা বলিলেন না।

দাতা ভদ্রলোকের সন্দেহ হইল বোধহয় বুড়ী বাঙালী নয়। তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাস করিয়াছেন।

"পয়সা উঠা লেও। তুহমী কো দিয়া।"

তখন বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন, 'আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদের মত একজন প্যাসেঞ্জার।"

"এখানে কেন। এটা যে আপার ক্লাস ওয়েটিং রুম।"

"আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।"

পরমুহূর্তে সেই বলিষ্ঠ কুলীটি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল।

"চলিয়ে মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।"

তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মতো বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

গয়া প্যাসেঞ্জারে একটু ভিড় ছিল। কিন্তু কুলীটি বলিষ্ঠ। শক্তির জয় সর্বত্র। সে ধমক-ধামক দিয়া বুড়ীকে একটা বেঞ্চের কোণে স্থান করিয়া দিতে সমর্থ হইল।

বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

এই প্রসঙ্গে কুলীর সহিত হিন্দীতে যে কথাবার্তা হইল তাহার সারমর্ম এই :

"আমার মজুরি আট আনা। দু টাকা দিচ্ছেন কেন?"

"তুমি আমার জন্যে এত করলে বাবা, তাই বেশী দিলুম।"

"না মাইজি, আমাকে মাপ করবেন। আমি ধর্ম বিক্রি করি না।"

"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

বৃদ্ধার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

কুলী ক্ষণকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া নামিয়া গেল।

রাজাধিরাজ

সেদিন পর্যন্ত জানিতাম, আমিই রাজা, কিন্তু অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছিল। রাজাধিরাজের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম।

...শ্রাবণের নিবিড় সন্ধ্যা সেদিন। সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। রিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ভেক-কণ্ঠের উন্মত্ত কোলাহলের পটভূমিকায় ঝিল্লীকুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শক্ষ্ম স্বরের জাল বুনিয়া চলিয়াছে। আমার ঘরের বাহিরে জানলার ঠিক নীচেই যে কালো হাঁড়িটা অবজ্ঞাত অবস্থায় এতদিন পড়িয়াছিল, সহসা সে একটা নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, জলপূর্ণ হইয়া আমার ভিজা চালটার সহিত কথোপকথন জমাইয়া তুলিয়াছে।

টপ্ টপ্ টপ্ টপ্…অবিশ্রান্ত আলাপ চলিতেছে।

সহসা সমস্ত মনটা খুশি হইয়া উঠিল। বর্ষা-সন্ধ্যাটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইবে। উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি—গাঁজা, আফিং, চরস এমন কি এক বোতল মদ পর্যন্ত হাতের কাছে মজুদ। নেশার রাজা আমি, সব রকম নেশাই জীবনে করিয়াছি, কিন্তু এমন রাজকীয় যোগাযোগ ইতিপূর্বে আর ঘটে নাই।

কিন্তু একটু চিন্তায় পড়িলাম। সবগুলো তো একসঙ্গে চালাইতে পারা যাইবে না। চালানো উচিতও নয়। কোন্‌টা আগে শুরু করি? অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়াও যখন কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলাম না তখন স্টোভ জ্বালিতে বসিয়া গেলাম। চা পান করিয়া তাহার পর যাহা হয় ঠিক করা যাইবে। বেশ কড়া করিয়া এক কাপ চা পান করিলাম। মস্তিষ্ক ঈষৎ চাঙ্গা হইল বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। কোন্‌টা আগে শুরু করি? ঠাণ্ডার দিনে অবশ্য মদটা জমিবে ভাল, কিন্তু গাঁজাই বা কম কিসে! সহসা কমলাকান্তের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—ভাই, অহিফেনকে অবহেলা করিও না। পরমুহূর্তেই চরসের মধুর গন্ধ মনকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। এমন শ্রাবণ-সভায় কাহাকে সভাপতির আসনে বসাই? দোদুল্যমান চিত্তে বসিয়া আছি, এমন সময় দ্বারে কে যেন সন্তর্পণে করাঘাত করিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। প্রবেশ করিল একটি শীর্ণকান্তি ব্যক্তি। পূর্বে কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। প্রবেশ করিয়া ব্যক্তিটি যাহা বলিল তাহাতে কিন্তু পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

"প্রথমেই একটা কথা বলে নিই আপনাকে। আমি একটু নেশা করে থাকি। এই বর্ষায় আজ রাত্রে আর বাড়ী ফিরতে পারছি না। এখানেই একটু নেশা করে রাতটা কাটিয়ে যাব ভাবছি। দয়া করে একটু জায়গা দেবেন কি?"

দোসর পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম।

সোচ্ছ্বাসে বলিলাম, "নিশ্চয়। শুধু জায়গা কেন, নেশাও দেব আসুন, বসুন।"

লোকটি বসিল এবং আড়চোখে একবার আমার দিকে চাহিল। মনে হইল, তাহার অধরে একটা অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া গেল যেন।

সম্রাট যেমন দরিদ্র প্রজাকে প্রশ্ন করে—কি চাই তোমার—অনেকটা সেইরূপভাবেই আমিও তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, "কি নেশা করবেন আপনি—"

"কি আছে আপনার, সেইটা আগে শুনি"—খুব মৃদুকণ্ঠে বলিল।

"গাঁজা চলবে ?"

"দিন এক ছিলিম।"

লোকটির কণ্ঠস্বর খুবই মৃদু।

দিলাম। স্বহস্তে সাজিয়া ছিলিমটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলাম। হাজার হোক অতিথি। উবু হইয়া বসিয়া সে এমন একটি টান দিল যে, ছিলিমটি ফাটিয়া গেল। তাহার পর যথারীতি দম বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ এবং আস্তে আস্তে ধোঁয়াটি ছাড়িতে লাগিল। সবটুকু ধোঁয়া নিঃশেষে বাহির করিয়া দিয়া আমার দিকে চাহিল এবং মৃদুকণ্ঠে বলিল—"এ কিছু হল না, দিন আর এক ছিলিম।"

আমার দ্বিতীয় ছিলিম ছিল না, সুতরাং অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

"গাঁজা আর আছে ?"

"আছে।"

"আনুন।"

যতটুকু ছিল বাহির করিয়া দিলাম। চিবাইয়া খাইয়া ফেলিল।

"আর কি আছে আপনার ?"

"চরস আছে।"

"দিন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত চরসটা ফুঁকিয়া দিল

তাহার পর হাসিয়া বলিল, "এতেও কিছু হল না, আছে আর কিছু ?"

"আফিং আছে ?"

"দিন দেখি।"

কৌটাটি হাতে লইয়া সমস্তটা মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া লজেঞ্জের মতো চুষিয়া চুষিয়া খাইতে লাগিল। বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম।

"জলীয় আছে নাকি কিছু ?"

"মদ আছে।"

"আনুন দেখি জমে কি না।"

মন্ত্রমুগ্ধবৎ উঠিলাম এবং মদের বোতলটা আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া

নিমেষে সবটা শেষ করিয়া ফেলিল। তাহার পর খানিকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিলাম, এইবার বোধহয় কাৎ হইবে। হইল না। পর-মুহূর্তেই মাথা তুলিয়া দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাড়িয়া বলিল, "কিৎসু হল না! আর কিছু কি আছে আপনার ?"

"আর তো কিছু নেই।"

"নেই ? আমার কাছে আছে কিছু। সেইটে বার করি তাহলে!"

ট্যাঁক হইতে একটি ছোট কৌটা বাহির করিল।

কৌটাটি খুলিতেই কৌটার ভিতর হইতে ছোট একটি সাপ টপ করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। লিকলিকে ছোট সরু সাপ। সে কৌটাটি একবার দক্ষিণ নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর সেটি বাম নাসারন্ধ্রের নিকট লইয়া গেল, আবার সাপ ছোবল মারিল। তাহার পর কৌটাটি বন্ধ করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল—' এইবার জমেছে মনে হচ্ছে। শুচ্ছি!"

শুইয়া পড়িল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া করজোড়ে বসিয়া রহিলাম। বাহিরে কেলে হাঁড়িটা বলিতে লাগিল—টপ্ টপ্ টপ্ টপ্...

দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা

৮-৭-৫০

আপনারা কখনও দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়াছেন কি না জানি না। হয়তো করেন নাই, হয়তো করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ প্রত্যহ অনুভব করি তেমনভাবে আর কেহ করে কিনা। আমি প্রত্যহ তিনখানি সংবাদপত্র আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচলিত হই, বিগলিত হই, বিহ্বল হই। ইচ্ছা করে চীৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু কাঁদিতে পারি না। মনে হয় আমার অশ্রুর উৎস বোধ হয় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু না, সেদিন চোখে কাঁকর পড়িয়াছিল, অনেক জল তো বাহির হইল! তাহা হইলে বোধহয় দেশের দুর্দশার কথা ভাবিবামাত্র অশ্রু জমাট হইয়া যায়,

ঝরিয়া পড়িতে পারে না। হয়তো আমার মর্মলোক উত্তর-মেরু হইয়া গিয়াছে কে জানে…।

খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে সত্যই অন্যমনস্ক হইয়া যাই। আজ সহসা লক্ষ্য করিলাম চা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, চা-য়ে একটি মাছি পড়িয়া ছটফট করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা উপমা জাগিল। মনে হইল স্বাধীনতা-কাপে পড়িয়া দেশও ওইরূপ হাবুডুবু খাইতেছে। দেশও মাছি হইয়া গিয়াছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিল।

চাকরকে আর এক কাপ চা আনিতে বলিলাম।

তাহার পর আর এক কাপ।

তাহাতেও শানাইল না, তৃতীয় কাপের ফরমাস দিয়া পায়ের পাতা নাচাইতে নাচাইতে পুনরায় সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা হইল সম্পাদকের পদধূলি চাঁছিয়া আনিয়া সর্বাঙ্গে মাখি। আহা, কি লেখাই লিখিয়াছে। বাসনা জাগে সম্পাদক হইব। কিন্তু হায় পরক্ষণেই মনে হয় বামন হইয়া চাঁদে হাত কি করিয়া দিব? তাহা যে অসম্ভব!

যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম।

মনে হইল দেশ গেল যে, আমি কি করিতেছি!

এক কাপ কফি প্রস্তুত করিতে বলিলাম!

১০-৭-৫০

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যাইতেছিলাম। পথে দেখিলাম একটি বালিকা ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে। মনে হইল নিশ্চয়ই দুঃখিনী, নিশ্চয়ই পাকিস্তান হইতে আসিয়াছে। আমার হৃদয়-গামছাকে কে যেন নিঙড়াইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল কিছু অর্থসাহায্য করি। পয়সা বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিয়াছি এমন সময়ে বিবেক বলিল—পয়সা দিয়া কি তুমি উহার দুঃখ দূর করিতে পার? ভিক্ষা দিলে উহাকে অপমানই করা হইবে। বেচারী যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছে, আর কেন! পয়সা বাহির করা হইল না, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলাম না। গটগট করিয়া সোজা ক্লাবে চলিয়া গেলাম। প্রথমে ভূতনাথের সহিত দেখা হইল। ভূতনাথ বলিল, "কেনারামবাবু, আপনার গা থেকে চমৎকার গন্ধ বের হচ্ছে তো! সেণ্ট মেখেছেন নাকি?"

সত্য কথাই বলিলাম।

"হ্যাঁ, ইভনিং ইন প্যারিস।"

বিশ্বনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

সে বলিল—"আপনার আদ্দির পাঞ্জাবিটিও চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে—"

কম্পিতকণ্ঠে আবেগভরে বলিলাম--"ভাই বিশ্বনাথ, আমাদের দেশেই এককালে ঢাকাই মসলিন হত সে কথা ভুলে যেও না। এ আদ্দি তার কাছে চট। আমি চট পরে বেড়াচ্ছি ভাই। আমার দুঃখ তোমরা বুঝবে না।"

"চলুন এক হাত ব্রীজে বসা যাক"—ভূতনাথ বলিল। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ব্রীজ খেলিলাম। ব্রীজ খেলার ফাঁকে ফাঁকেও দেশের দুর্দশা সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। উদ্বাস্তুদের অসীম দুর্দশা, ঘন ঘন ট্রেন কলিশন, খাদ্য সংকট, কর্তৃপক্ষদের অপটুতা, অসাধুতা প্রভৃতি চিত্তকে এমন উদ্বেলিত করিল যে উপর্যুপরি দুইবার হারিয়া গেলাম।

বাসায় ফিরিয়া মাংসের কোর্মা-সহযোগে লুচি আহার করিতে করিতে বারম্বার মনে হইতে লাগিল আহা, কত লোক যে অনাহারে আছে। খাদ্য মন্ত্রীর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে সব মন্তব্য বাহির হইয়াছে সেগুলি মনে পড়িল। অমন একটা নামজাদা লোকের এই ব্যবহার? ছিঃ ছিঃ! অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে অনেকগুলি লুচি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলাম। নেটের মশারী-আবৃত দুগ্ধফেনিনিভ শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া আরও কাতর হইলাম। মনে পড়িল কতলোক ফুটপাথে শয়ন করিয়া আছে। শিয়ালদহের দৃশ্য মনে পড়িল। তাহারা কি আমার ভাইবোন নয়? চক্ষু সজল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইল না। একটা চাপা কষ্টে যেন দম বন্ধ হইবার মতো হইল! অনেকক্ষণ গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর নজরে পড়িল আমার বালিশের উপর প্রত্যহ যে রোমশ তোয়ালেখানি বিছানো থাকে, তাহা নাই। গৃহিণী সেকেণ্ড শো-য়ে সিনেমায় গিয়াছেন, আমার বালিশের উপর তোয়ালে দেওয়া হইয়াছে কিনা দেখিবার অবসর পান নাই। এই দেশেই কি সীতা-সাবিত্রী ছিল? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন দিয়া যে চাকরটিকে নিযুক্ত করিয়াছি সে-ও আমার বালিশের উপর তোয়ালেটি বিছাইয়া দিবার অবসর পায় নাই। খাদ্যমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ। এ দেশের কি কোনোও দিন উদ্ধার হইবে? মনের কষ্ট মনে চাপিয়া স্বহস্তেই বালিশের উপর রোমশ তোয়ালেটি বিছাইয়া লইলাম।

১২-৭-৫০

সকালে বাগানে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা একটি কালো জিনিস নজরে পড়িল। তুলিয়া দেখিলাম আমসি! আমসি!! একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইল আমাদের দেশের অবস্থাও কি এইরূপ নয়? আমাদের দেশও একদিন আম ছিল আজ আমসি হইয়াছে। মনে হইবামাত্র হৃদয়বাল্‌তি দুঃখবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। একটি সিগারেট ধরাইয়া দেশের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। সেদিন রাস্তায় যে ম্লানমুখী বালিকাটিকে দেখিয়াছিলাম তাহার কথা মনে পড়িল। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই মনে পড়িতে লাগিল। বিব্রত হইয়া খিলি দুই পান এবং একটু জরদা মুখে দিলাম। কাশীর জরদা পূর্বে কত ভালো ছিল, কৌটা খুলিলে কি চমৎকার গন্ধই ছড়াইত, এখন কিছুই নাই। হায় হায়, দেশ কোন্ পথে চলিয়াছে? অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল!

১৪-৭-৫০

প্রতিটি খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে ক্রমাগত দুঃসংবাদ পড়িয়া অস্থির হইয়া পড়িতেছিলাম। মনে হইতেছিল বুঝি পাগল হইয়া যাইব। কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার জন্য অবশেষে তাই সিনেমায় গেলাম। খুব ভীড়। অতি কষ্টে একটি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনতে পারিলাম। প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কিন্তু ভারী আনন্দ হইল। যখনই সিনেমা দেখিতে যাই, তখনই এই ধরণের আনন্দ হয়। একসঙ্গে এতগুলি দেশের লোক আনন্দ লাভের আশায় একত্রিত হইয়াছে ভাবিলেই আমি রোমাঞ্চিত হই। রোমাঞ্চিত কলেবরে গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলাম। আমার বাম পাশের আসনটি দেখিলাম তখনও খালি রহিয়াছে। একটি সিগারেট ধরাইয়া কল্পনা করিতে বসিলাম বাম পাশের আসনটিতে কে বসিবে? নারী না পুরুষ? কোন্ বয়সের? স্বদেশী না বিদেশী? বেশীক্ষণ কিন্তু এ চিন্তা করিবার অবসর মিলিল না, প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হইয়া গেল, চিত্রপটে একের পর এক বিজ্ঞাপনের ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর বড়ই বিষণ্ণ বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল বিদেশী বিজ্ঞাপনের ছবিগুলি কি সুন্দর, দেখিলেই জিনিসটি কিনিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ওই প্যাঁচামুখীকে দেখিবার পর কি আর স্নো কিনিতে ইচ্ছা করিবে?

আমাদেরই যদি স্বদেশী জিনিস কিনিতে অনিচ্ছা জন্মে স্বদেশী ব্যবসায় চলিবে কি করিয়া? স্বদেশী ব্যবসায় যদি না চলে···আর ভাবিতে পারিলাম না। মনে হইল সীমাহীন বেদনা-সমুদ্রে অন্তর ভরিয়া গিয়াছে, তাহার তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়-শোলা দিশাহারা হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ছবির পর ছবি আসিতে লাগিল, আমি বেদনা-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম। তাহার পর আসল ছবি আরম্ভ হইয়া গেল। দশটি যুবতীর নৃত্য-ভেলা আঁকড়াইয়া ধরিয়া গজল শুনিতে শুনিতে বেদনা-সমুদ্র পার হইতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ পরে সান্ত্বনা-সৈকতও দেখা গেল, কিন্তু হায় আবার ঝটিকা আসিল। মনে হইল বাম পার্শ্বের আসনটিতে একটি মহিলা আসিয়া উপবেশন করিলেন। আমি কেনারাম ঘোষ, চিরকালই ভীতু স্বভাবের লোক। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতে সাহস করিলাম না। অন্ধকারও ছিল। দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়ে বসিয়া বোম্বাই-মার্কা নৃত্য দেখিতে লাগিলাম।·· ইন্টারভাল হইল। তখন অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম সেই ম্লানমুখী বালিকাটি বসিয়া আছে—সেদিন যাহাকে পথে দেখিয়াছি। প্রখর বিদ্যুতালোকে দেখিলাম বালিকা নয়, যুবতী। আমার ভয় যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"মাপ করবেন, আপনার বাড়ি কি পাকিস্তানে?" মেয়েটির ম্লান মুখ যেন আরও ম্লান হইয়া গেল। যদিও সে মুচকি হাসিয়া উত্তর দিল, "না, আমার বাড়ী এখানেই" কিন্তু আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না। দেশের দুঃখ অনলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমার দৃষ্টি অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। আমি তাহার বেদনা প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার মুচকি হাসি তাহার বেদনাকে আরও যেন স্পষ্ট করিয়া তুলিল। আমি ইহাও বুঝিলাম যে তাহার বাড়ি পাকিস্তান বলিলে পাছে আমি তাহার প্রতি অনুকম্পাশীল হই তাই সে সত্য গোপন করিতেছে। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কর্তব্যবোধেই আমিও তখন চাতুরী অবলম্বন করিব স্থির করিলাম। বলিলাম, "কিছু মনে করবেন না, আমার একজন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়া পাকিস্তানে ছিল, সে ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনাকে দেখে তার কথা মনে পড়ছে।" মেয়েটি আর একটু মুচকি হাসিল। চানাচুরওয়ালাকে ডাকিয়া দুই ঠোঙা চানাচুর কিনিলাম।

আপনি খাবেন? নিন না। আমার যে আত্মীয়াটির কথা বলছিলাম, সে চানাচুর খেতে খুব ভালবাসত। জানি না সে এখন কোথায়।"

"বেশ দিন।"

মেয়েটি হাত বাড়াইয়া ঠোঙাটি লইল এবং যে ভাবে খাইতে লাগিল তাহাতে আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমার বিস্ময় ক্রমশ কষ্টে রূপান্তরিত হইল। স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম বেচারী অনাহারে আছে! মনে হইল আমি যেন দময়ন্তীকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুনরায় চাতুরীর আশ্রয় লইলাম।

বলিলাম, "আমার সেই আত্মীয়াটি ফিরপোতে খেতে খুব ভালবাসত। আপনার যদি অসুবিধা না হয় চলুন না ফিরপোতে যাই।"

"বেশ, সিনেমার পর যাওয়া যাবে।"

পাছে আমি তাহাকে গরীব এবং অসহায় মনে করিয়া কৃপা-পরবশ হই সেইজন্য বোধহয় খুব সপ্রতিভভাবে কথাগুলি বলিল। কিন্তু আমাকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। দেশের দুর্দশা যে কত গভীরে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে! তিনটি দৈনিকপত্র প্রত্যহ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করত যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আমি লাভ করিয়াছি তাহা যে মর্মভেদী। প্রিন্টেড্ শাড়ি দিয়া সে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করা যাইবে না! খুবই কষ্টভোগ করিতে লাগিলাম। সিনেমা শেষ হইবামাত্র ভাল একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া উভয়ে চড়িয়া বসিলাম এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরপো অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম।

* * * *

দেশদরদী কেনারাম ঘোষের রোজনামচার উপরোক্ত অংশটুকু তাঁহার ত্রিতল বাটির সম্মুখস্থ ডাষ্টবিন হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দেশদরদী কেনারাম পত্নীর সহিত তুমুল কলহ করিয়া যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেদিন তাঁহার পত্নী ত্রিতলের বাতায়ন হইতে যে সকল কাগজপত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছিলেন সেই কাগজপত্রের মধ্যে উপরোক্ত অংশটুকু ছিল। বাকি অংশটুকু বোধহয় আর পাওয়া যাইবে না, বহু অমূল্য জিনিসের সহিত ধাপার মাঠে তাহা বোধহয় মারা গিয়াছে।

পক্ষী-পুরাণ

সুবিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার আনাতোল ফ্রাঁস তাঁহার 'পেঙ্গুইন আইল্যাণ্ড' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, কি করিয়া পেঙ্গুইন পাখিরা মনুষ্যে রূপান্তরিত হইল এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের কি পরিণতি ঘটিল। পাখিকে মানুষে পরিণত করিবার জন্য কোনও দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্য লইতে হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা হইল—পাখিরা মানুষ হোক, অমনই তাহারা মানুষ হইয়া গেল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আনাতোল ফ্রাঁস বোধহয় খবরটি টের পান নাই, পাইলে তাহা নিশ্চয় উক্ত পুস্তকের একটি অধ্যায় বৃদ্ধি করিত।

প্রাচীন আর্যগণ বাংলা দেশের তদানীন্তন অধিবাসীদের পক্ষীজাতি বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সুধী-সমাজে এ কথা সুবিদিত। যে কথাটি সুবিদিত নয়, তাহাই আমি বর্ণনা করিতেছি।

পিতামহ ব্রহ্মা একদা নিভৃতে নীরবে মননশক্তি-সহযোগে দেবী সরস্বতীর সহিত নিরুক্ত আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। সহসা একটা বেসুরা বিকট চীৎকারে আলোচনা বিঘ্নিত হইল। তিনি উঠিয়া আসিয়া একজন দেবদূতকে চীৎকারের কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ করিলেন।

দেবদূত একটু পরে আসিয়া শুদ্ধ ভাষায় খবর দিল, কমলযোনি, বঙ্গদেশবাসী পক্ষীকুল কলরব করিতেছে। তাহাদের নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু তাহারা আমার কথা শুনিল না।

মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো!

পিতামহ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীণাপাণির দিকে তাকাইলেন।

বীণাপাণি হাসিয়া অনুরোধ করিলেন—

ওদের মানুষ করে দিন। মানুষ হলে ওরা সভ্য হবে।

পিতামহ বাংলা দেশের পক্ষীজাতিকে মানুষ করিয়া দিলেন। মনুষ্যীভূত পক্ষীগুলি কিন্তু বিপদে পড়িয়া গেল। পক্ষীরূপে তাহারা মন্দ ছিল না।

এদিক ওদিক হইতে খুঁটিয়া আহার করিত, গাছের ডালে রাত কাটাইত, যৌবনকালে মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী জুটাইয়া প্রণয় করিত, খড় কুটা সংগ্রহ করিয়া নীড় বাঁধিত, ডিম পাড়িত, ডিমে তা দিত, শাবকগুলি বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের প্রতিপালন করিত, তাহার পর তাহাদের পালক গজাইলে তাহারা উড়িয়া চলিয়া যাইত। সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল তাহাদের। মানুষ হইয়া তাহারা বিপদে পড়িয়া গেল। অত সহজে খাবার, বাসা, সঙ্গী, সঙ্গিনী কিছুই পাওয়া যায় না।

এখন যেমন আমরা কথায় কথায় প্রধান মন্ত্রীর কাছে দৌড়াই, তখন মর্ত্যবাসীরা তেমনই সোজা বিধাতার কাছে দৌড়াইতে পারিত। বিধাতাকে খুব বেশি বিরক্ত করার ফলেই বোধ হয় অধুনা আমরা এই সুবিধাটুকু হারাইয়াছি।

বঙ্গদেশ হইতে কান-ছোট সম্প্রদায়ের দলপতি নিখিল-নব-সৃষ্ট-মনুষ্যজাতির প্রতিনিধিরূপে একদা পিতামহের দরবারে গিয়া হাজির হইলেন। নব-সৃষ্ট-মনুষ্য-সমাজও নানাদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কান-ছোট, নাক-লম্বা, চুল-কোঁকড়া, চোখ-কটা, চিরুন-দাঁত, নাদা-পেটা প্রভৃতি নানারূপ শ্রেণীবিভাগ ছিল তাহাদের। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, যে সময় কান-ছোট সম্প্রদায়েরই খুব বাড়-বাড়ন্ত।

কান-ছোট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি পিতামহকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, প্রভো, আমরা মহা অসুবিধায় পড়িয়াছি। পক্ষীরূপে আমরা সুন্দর ছিলাম, মানুষ হইয়া আমাদের কষ্টের অবধি নাই। উপার্জন করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া উপার্জন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। অন্য-প্রদেশবাসীরা শুনিয়াছি ব্যবসায় করে, কিন্তু ধন না থাকিলে ব্যবসায় করা যায় না। আমাদের কিছু ধন দিন।

পিতামহ রেবতী নক্ষত্র-মণ্ডলীতে একটি নব সৌরলোকের পরিকল্পনায় তন্ময় ছিলেন। কল্পনা বাধা পাওয়াতে অষ্ট ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্রকর্ণ খর্বকার ব্যক্তিটির দিকে চাহিলেন। তাহার পর ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই তো ধন দিয়েছি, আবার ঘ্যান ঘ্যান করছ কেন?'

প্রতিনিধিটি সভয়ে শুদ্ধ বাংলা বলিতেছিলেন। পিতামহের মুখে চলতি বাংলা শুনিয়া একটু অবাক হইয়া গেলেন। সাহসও পাইলেন।

বলিলেন, 'কই, আমরা তো কিছুই পাই নি পিতামহ!'

আরে কি আপদ! ধন মানে শক্তি। তোমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর শক্তি দিই নি? যাও চরে খাওগে, বিরক্ত করো না।

শুধু শক্তিতে কিছু হয় না পিতামহ। মনুষ্য-সমাজে ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই। কিছু মূলধন দিন আমাদের।

তা হলে বিশ্বকর্মার কাছে যাও। বিশু ও বিশু!—পিতামহের হাঁকা-হাঁকিতে বিশ্বকর্মা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উঁকি দিলেন।

আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, এ কি চাইছে একে দাও, যত সব আপদ জোটে এসে। মূলধন! বিশ্বকর্মার ইঙ্গিতে প্রতিনিধিটি বিশ্বকর্মার কক্ষে গিয়া উপনীত হইলেন। বিশ্বকর্মা আলতো আলতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনোযোগ-সহকারে তাহার সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শুনিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল! একে ভাঁড়ারে মাল কম, তার উপর পিতামহ আবার একটা নূতন সৌরলোক নিয়ে মেতেছেন. অহরহ নানা রকম ফরমাশ করছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে যেমন করে হোক মাল যোগান দিতে হচ্ছে। দেখি, বাড়তি যদি কিছু থাকে দিচ্ছি আপনাকে। আপনি বসুন একটু।

বিশ্বকর্মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখুন, কিছু রঙ, কিছু বাঁশ, কিছু কাগজ আর খানিকটা আগুন আপনাকে দিতে পারি। এ ছাড়া বাড়তি আর কিছু নেই।

এ-সবে কি আমাদের সমস্যার সমাধান হবে?

আপনারা ব্যবসা করতে চান তো? এর প্রত্যেকটি নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। প্রচুর অর্থোপার্জন করতে পারবেন।

কিছু সোনা বা রূপো—

বাড়তি নেই। পিতামহ যদি বলেন তাহলে দিতে পারি। কিন্তু তিনি যে সৌরলোক সৃষ্টি করছেন, তাতে সব রকম ধাতু অজস্র লাগছে। সোনার হিমালয়, রূপোর বিন্ধ্যাচল হচ্ছে সেখানে। পারদ-সমুদ্র হবে না কি। কোনোও রকম ধাতুই তিনি এখন ভাঁড়ার থেকে বাইরে যেতে দেবেন না; সেদিন স্বয়ং পার্বতীর এক জোড়া দুলের জন্যে স্বয়ং মহাদেব কিছু সোনা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, দিলেন না।

তবু চেয়ে দেখব?

দেখতে পারেন।

আমতো আমতো ভাবে গোঁফে হাত বুলাইতে লাগিলেন। প্রতিনিধিটি ব্রহ্মার ঘরে গিয়া দেখিলেন, চতুরানন নিমীলিত-নয়নে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আর সাহস করিলেন না। বিশ্বকর্মা-প্রদত্ত রঙ, বাঁশ, কাগজ এবং আগুন লইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার পর বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে।

সহসা পিতামহের একদিন খেয়াল হইল, বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, হ্যাঁ হে বিশু, বাংলা দেশ থেকে সেই যে এক ছোকরা মূলধন চাইতে এসেছিল, তাকে কিছু দিয়েছিলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল ভাল জিনিসই দিয়েছিলাম। রঙ, বাঁশ, কাগজ আর আগুন। এর যে-কোনো একটা দিয়েই তারা বিশাল ব্যবসা করতে পারে।

নিশ্চয়ই, এত দিনে বোধ হয় ফেঁপে উঠেছে সব। উঁকি মেরে দেখ তো, কি তাদের অবস্থাটা।

বিশ্বকর্মা স্বর্গের বাতায়ন হইতে ঝুঁকিয়া বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টি ি ক্ষপ করিলেন।

দেখতে পাচ্ছ কিছু ? খুব ধুমধাম বোধ হয় ? অমন চারটে জিনিস নিয়ে গেছে, বড় বড় বাড়ি হাঁকড়েছে নিশ্চয় ?

আজ্ঞে না, বাড়ি টাড়ি তো তেমন দেখছি না।

কি দেখছ তা হলে ? জিনিস চারটে নিয়ে কি করলে তা হলে ওরা ?

ফানুস বানিয়েছে বোধ হয়।

ফানুস ?

রঙ-বেরঙের ফানুসই তো উড়ছে দেখছি।

বল কি !

হীরের টুকরো

অশীতিপর বৃদ্ধ বিমল ডাক্তারের কাছে সেদিন যে রোগীটি আসিয়া হাজির হইলেন তিনিও খুব বৃদ্ধ। যে যুবকটি রোগীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন তিনিই প্রথমে ডাক্তারবাবুর সহিত আলাপ করিলেন।

বলিলেন, "আমার ঠাকুরদাকে একবার দেখতে হবে ডাক্তারবাবু। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি—"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। অনেকদিন থেকেই ওঁর মাথা খারাপ। সম্প্রতি কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে, তাই আপনার কাছে এনেছি।"

"কোথা থেকে আসছেন আপনারা ?"

"কোলকাতা থেকে।"

"কোলকাতা থেকে ? সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, তাঁদের ছেড়ে আপনি পাড়াগাঁয়ে আমার কাছে এসেছেন, আশ্চর্য তো !"

যুবক একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। আসল কারণটা ব্যক্ত করিতে তাঁহার কেমন যেন সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ডাক্তারের গুণের জন্য নয়, 'বিমল' এই নামটার জন্যই যে তিনি ঠাকুরদাকে তাঁহার কাছে লইয়া আসিয়াছেন একথা তিনি বলিতে পারিলেন না। অথচ যে ডাক্তারের নাম 'বিমল' নয় তাহার কাছে ঠাকুরদা কিছুতেই যাইতে চান না। প্রথমেই গিয়া জিজ্ঞাসা করেন 'আপনার নামটি কি'। নাম বিমল না হইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসেন। মানসিক ব্যাধিতে যশস্বী দুই একজন ডাক্তারের সহিত তিনি ষড়যন্ত্রও করিয়াছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের নাম 'বিমল', রোগীর হিতার্থে তাঁহারা মিথ্যা-ভাষণ করিতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কোন ফল হইল না। ঠাকুরদা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াই উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাদের ঔষধ পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। একজন জোর করিয়া একটা ইনজেকসন দিয়াছিলেন, তাহাতে খানিকক্ষণ ঘুম হইয়াছিল, আর কিছু হয় নাই। মুখ দিয়া কোনও ঔষধ ঠাকুরদাকে খাওয়ানো যায় না। তিনি বলেন, 'আমার কোন অসুখ নেই, ওষুধ খাব কেন ? আসল বিমলের সঙ্গে দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' অথচ তিনি সমস্ত রাত ঘুমান না। খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক নাই, অনেক সাধ্যসাধনা করিলে সামান্য কিছু খান। নিজের

মনেই কাঁদেন, হাসেন। সময়ের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছে। সকালকে বলেন সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বলেন সকাল। তারিখ বার কিছুই মনে থাকে না। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন কোনও বিমল ডাক্তারের সহিতই ইহার রোগের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে, তাহার সহিত দেখা হইয়া গেলেই অসুখ সারিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাই কোনও বিমল ডাক্তারের খবর পাইলেই সেখানে ঠাকুরদাকে লইয়া যান। বিমল নাম শুনিলে ঠাকুরদাও আগ্রহ দেখান।

বিস্মিত বিমল বাবু প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আপনার ঠাকুরদা ?"

"বাইরে গাড়িতে বসে আছেন।"

"নিয়ে আসুন তাঁকে। আচ্ছা, দাঁড়ান একটু। আপনার কাছ থেকে ওঁর হিস্ট্রিটা জেনে নি একটু, উনি হয়তো কিছু বলবেন না। আপনি চেয়ারটার ভাল করে বসুন—"

যুবকটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "আমিও বিশেষ কিছু জানি না। ঠাকুরদা বরাবরই বিদেশে বিদেশে ঘুরতেন, আমি বোর্ডিংএ হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতাম।"

"আপনার বাবা কোথায় ?"

"আমি শিশু বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। নিকট-আত্মীয় বিশেষ কেউ নেই। ঠাকুরদার কাছেই আমি সাত বছর পর্যন্ত ছিলাম। তারপর উনি আমাকে বোর্ডিংএ-দিয়ে দেন।"

"বোর্ডিং-এর খরচ আপনার ঠাকুরদাদাই দিতেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ছাড়া আর তো কেউ নেই আমার।"

"কি করতেন উনি, চাকরি ?"

"না, উনি চিত্রকর। ছবি বিক্রির টাকা থেকেই আমাদের সংসার চলত। বছরখানেক থেকে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছবি আঁকেন না আর।"

"এখন কি করে সংসার চলে ?"

"আমি রোজগার করি কিছু।"

"কি করেন ?"

"প্রফেসারি।"

যুবকটির কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া বিমল ডাক্তারের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইল। ছেলেটি বিদ্বান, অথচ বাহিরে তাহার কোনও প্রকাশ নাই।

"আপনার ঠাকুরদার পাগলামিটা কি ধরণের বলুন তো, কি করেন—"

"নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নেই। রাত্রে ঘুমোন না। আপন মনে বিড়বিড় করে কি বলেন সর্বদা—"

"কি বলেন, শুনেছেন কিছু কখনও ?"

"একটি কথাই বারবার বলেন। 'এ ভার আমি আর বইতে পারছি না—এ ভার আমি আর বইতে পারছি না'। বলতে বলতে কখনও কাঁদেন, কখনও হাসেন।"

ডাক্তারবাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

"ওঁর পাগলামিতে আর কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন কি ?"

যুবকটি এইবার একটু মুশকিলে পড়িলেন। সত্য কথাটা বলিলে ডাক্তারবাবু মনে আঘাত পাইবেন কি ? অথচ না বলিলে রোগের সূত্রটা হয়তো তিনি ধরিতে পারিবেন না, অবশ্য উহাই যদি রোগের সূত্র হয়। একটু ইতস্তত করিয়া অবশেষে সব কথা খুলিয়া বলাটাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন।

"করেছি। মনে হয় উনি কোন বিমল ডাক্তারকে খুঁজছেন। ডাক্তারের নাম বিমল না হলে সেখানে যেতেই চান না। আপনার কাছে বিশেষ করে এসেছি সেইজন্যেই—"

"ও। আপনার ঠাকুরদার নামটি কি ?"

"নিরঞ্জন সেন।"

"আপনার নামটি ?"

"বিকাশ।"

"আচ্ছা, আপনার ঠাকুরদাকে নিয়ে আসুন এবার।"

বিকাশবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং একটু পরে বৃদ্ধ শিল্পী নিরঞ্জন সেনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিমলবাবু দেখিলেন নিরঞ্জন সেনের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। একমুখ পাকা গোঁফ-দাড়ি, মস্তক কেশবিরল। যে কয়গাছি চুল আছে তাহাও পাকা, অবিন্যস্ত এবং তৈলহীন। মুখে জরার চিহ্ন। কপালে, চোখের কোণে বলি-রেখা, গালের মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখের দৃষ্টিই কেবল এখনও বেশ তীক্ষ্ণ আছে। অতীতের সাক্ষী কেবল ওই দৃষ্টিটুকু। বিমলবাবু নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভিড়ের মধ্যে দেখিলে যৌবনের বন্ধু নিরঞ্জনকে তিনি চিনিতে পারিতেন না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু অপ্রতিভও হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা ছিল নিরঞ্জন মারা

গিয়াছে। বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রমাণ এতদিনে দেয় নাই। দিবার সুযোগও অবশ্য ছিল না। লখ্‌নৌ হইতে চলিয়া আসিবার সময় বিমল ডাক্তার কোনও ঠিকানা কাহারও কাছে রাখিয়া আসেন নাই। সেই অপ্রীতিকর ঘটনাটা ঘটিবার পর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি লখ্‌নৌ হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার পর অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছেন। পঞ্চাশটি বছর কাটিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে নিরঞ্জন আসিয়া হাজির হইয়াছে কি মনে করিয়া! চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে।

বিমল ডাক্তার নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনও নির্নিমেষে বিমলকে দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি ঘাড় ফিরাইয়া বিকাশকে বলিলেন—"তুমি বাইরে গিয়ে বোসো। এঁর সঙ্গে আমার গোপনীয় কিছু কথা আছে—।"

বিকাশ ইহা প্রত্যাশাই করিতেছিলেন, প্রতিবারই ঠাকুরদা একথা বলেন। তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দুই

আরও কিছুক্ষণ দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া রহিলেন। নিরঞ্জনই কথা কহিলেন প্রথমে।

"বিমল আমাকে চিনতে পারছ?"

"পারবার কথা নয়, কিন্তু পেরেছি। ছিলে কোথায় এতদিন?"

"ছিলাম না কোথায় তাই বরং জিগ্যেস কর। আমি সারাজীবন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। লছমী বেঁচে আছে?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আছে।"

"তার যে ছবিটা এঁকেছিলাম সেটা কি আছে তোমার কাছে?"

"আছে।"

"একবার দেখাও তো—"

"সেটা ভিতরে টাঙানো আছে। ছবিটা দেখতে চাইছ কেন, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না। তোমার চেহারা এত বদলে গেছে যে তোমাকে ঠিক চিনতে পারছি না। ছবিটাই একমাত্র প্রমাণ যে তুমি সেই বিমল। বহু বিমল

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি নিঃসন্দেহ হতে চাই যে তুমি সেই বিমল।"

"বেশ, একটু বোসো তাহলে।"

বিমল ডাক্তার উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ফিরিলেন প্রায় আধ ঘণ্টা পরে। সঙ্গে একটি বালক-ভৃত্য প্রকাণ্ড একখানা ছবি বহন করিয়া আনিল। একটি নর্তকী নাচিতেছে। অপূর্ব ছবি। নিরঞ্জন সেন বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অতীত কীর্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার আর সন্দেহ নেই! ছবিটা নিয়ে যেতে পার।"

বালক-ভৃত্য ছবিটা লইয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন প্রশ্ন করিলেন—"লছমী কি আমার সঙ্গে দেখা করবে? তাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই। কথাটা খুবই মর্মান্তিক, তবু তার জানা উচিত।"

"কি কথা?"

"তার ছেলে আর বেঁচে নেই। তাকে আমি বড় করে তুলেছিলাম, লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তার একটি ছেলেও হয়েছিল, কিন্তু বিধাতার এমনি অভিশাপ লেগে ছেলে বউ দু-জনেই মারা গেল, বেঁচে রইল শুধু শিশুটা। তাকেও আমি মানুষ করে তুলেছি। কিন্তু আমি আর বেশীদিন বাঁচব না, তার জিনিস তার হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমার আর একটা আতঙ্কও হয়েছে, আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে আমি অভিশপ্ত। লছমীকে পাই নি, লছমী নিজেই আমার কাছে থাকতে চায় নি। সে তোমাকে বিয়ে করেছিল তাই বোধ হয় এখনও বেঁচে আছে। আমার কাছে থাকলে মরে যেত। ছেলেটাকেও তোমরা যদি নিয়ে নিতে হয়ত সে বেঁচে থাকত—"

নিরঞ্জন সেন রুদ্ধবাক হয়ে ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া গেলেন। তাঁহার চোখ হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি বিমল ডাক্তারের হাত দুটি চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বিকাশ তোমাদের কাছেই থাকুক। লছমীকে বল তুমি, তুমি বললেই সে রাজী হবে—"

"সেই বিকাশই কি তোমার সঙ্গে এসেছে?"

"হ্যাঁ। খুব ভাল ছেলে, হীরের টুকরো—"

"ও কি সব কথা জানে?"

"না। কিন্তু ওকে আমি বলব সব। তার আগে লছমীর মত চাই, তোমারও মত চাই।"

বিমল ডাক্তার মাথায় হাত বুলাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যেমন চলছে চলুক না! ও সব ঘাঁটিয়ে আরে লাভ কি—"

"না আমি আব পারছি না। যার জিনিস তার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। ওর ঠাকুরদার কাছেই ও বেঁচে থাকবে, আমার কাছে থাকলে বাঁচবে না। আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত—"

নিরঞ্জন সেন চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। বিমল ডাক্তার ভয় পাইয়া গেলেন।

"বেশ, তাই হবে। বিকাশ আমাদের কাছেই থাকবে। কিন্তু লছমীকে এত বড় মর্মান্তিক খবরটা তো চট করে দেওয়া যাবে না, সইয়ে সইয়ে বলতে হবে। সে আমি বলব এখন। যদিও ছেলের সঙ্গে ওর বহুকাল ছাড়াছাড়ি হয়েছে তবু ছেলে তো, তার মৃত্যু সংবাদটা হঠাৎ এভাবে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের আর কোনও সন্তান হয় নি, ও হয়তো আশা করে আছে যে ওর ছেলে একদিন ফিরে আসবে—"

"তুমি বলবে তাকে? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ?"

"দিচ্ছি।"

"কতদিনের মধ্যে বলবে?"

"এই ধব মাসখানেক।"

"মাসখানেক পরে তাহলে আমি বিকাশকে বলতে পারি?"

"বেশ, বোলো।"

নিরঞ্জন সেন সোৎসুক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত বিমল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"লছমীর সঙ্গে একবার দেখা হয় না? সে দেখা করবে কি, একবার বলে দেখ না।"

"বললে হয়তো দেখা করবে। কিন্তু এখন দেখা করাটা উচিত নয়। দেখা হলেই ছেলের কথা উঠবে—"

"তাকে একবার দেখতে খুবই ইচ্ছে করছে ভাই—"

"দূর থেকে দেখতে পার। এই জানলাটা খুলে দিচ্ছি, ভিতরের দিকে বারান্দায় বসে আছে সে। ভালোভাবেই দেখতে পাবে এখান থেকে—"

বিমল ডাক্তার পিছনের দিকের একটি জানলা খুলিয়া দিলেন। নিরঞ্জন দেখিলেন বারান্দায় একটি বৃদ্ধা বসিয়া বই পড়িতেছে। মাথার চুল সাদা, মুখে জরার চিহ্ন, চোখে চশমা।

"ওই লছমী!"

"হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য বদলে গেছে।"

"তুমিও বদলেছ, আমিও বদলেছি।"

নিরঞ্জন সেন নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিন

ঠিক একমাস পরে বিকাশ একদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখিলেন নিরঞ্জন সেন গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। টেবিলের উপর নিম্নলিখিত পত্রটি রহিয়াছে।

ভাই বিকাশ,

আমি চললাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে, এই ব্যর্থ জীবন বহন করিবার আর কোন সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি না। যাবার আগে একটি কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক কবিতা, অনেক উপন্যাস পড়েছ, তাই আশা করছি আমার প্রথম যৌবনের উন্মাদনাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে। ঘটনাটি সত্যিই গল্পের মত। প্রথম যৌবনে লখ্নৌ শহরে আমি লছমী নামে একটি নর্তকীকে ভালোবেসেছিলাম। তার সঙ্গে একঘরে বাস করেছিলাম, তার গর্ভে আমার একটি ছেলেও হয়েছিল। লছমীর সুন্দর ছবিও এঁকেছিলাম একটি। ভেবেছিলাম তাকে বিয়ে করে সুখের সংসার গড়ে তুলব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। তার এক ডাক্তার প্রণয়ী জুটল। শেষে এমন গাঢ় হল যে লছমী অবশেষে আমাকে বলল—আমি তোমার সঙ্গে আর থাকতে চাই না। আমি ঠিক করেছি বিমলবাবুকে বিয়ে করব। বললাম—সে কি, তোমার ছেলে হয়েছে—! লছমী হেসে উত্তর দিলে, তোমার ছেলে তুমি রাখতে পার, আমি কিন্তু বিমলবাবুকেই বিয়ে করব। জিজ্ঞাসা করলাম, বিমলবাবু বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন? তারপর একটু হেসে বললে, পরশুদিন রেজেস্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়েও গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, সত্যিই আমার মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না। তার পরদিনই লছমী কাউকে কিছু

না বলে নিজের ছেলেকে ফেলে রেখে আমাকে ছেড়ে চলে গেল বিমলের সঙ্গে। বিমল ডাক্তার ছোট্ট একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল—'স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তোমার আঁকা লছমীর ছবিটি নিয়ে যাচ্ছি। রাগ কোরো না বন্ধু।' সত্যিই বিমল ডাক্তার আমার বন্ধুই ছিল। তার কাছে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। লছমীর উপর আমার কিন্তু রাগ হল না। মনে হল উর্বশীর জাত, কোথাও কোন কারণেই বাঁধা পড়ে না কখনও। নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে ছেলেটিকেই মানুষ করে তুলতে লাগলাম। সে বড় হল, লেখাপড়া শিখল, তার বিয়ে দিলাম, ছেলেও হল একটি। আবার পড়ল অভিশাপের বজ্র। প্লেগ এপিডেমিকে আমার ছেলে বউ মারা গেল, বেঁচে রইল কেবল তাদের শিশু সন্তানটি, মানে তুমি। তোমাকে আবার মানুষ করে তুলেছি, কি করে তা সম্ভব হয়েছে, কি ভাবে টাকা রোজগার করে তোমার পড়ার খরচ যুগিয়েছি তা তুমি জান না, তা জানবার দরকারও নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখ, ছবি এঁকে তা হয় নি। এদেশে তা হয় না। এখন আমার ভয় পাছে আমার ছোঁয়াচ লেগে তোমার আবার কিছু হয়। আমার জীবন অভিশপ্ত, আমার কাছে কেউ থাকবে না; তাই ঠিক করলাম লছমীকে খুঁজে বার করব। যদি বার করতে পারি তাকে সব কথা বলে তার হাতে তোমাকে সমর্পণ করে সরে পড়ব। এতদিন সব দায়িত্ব আমি একাই বহন করেছি, এবার সেও করুক খানিকটা। এ দাবী করবার অধিকার আমার আছে। তাই বিমল ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। সেদিন তার দেখা পেয়েছি। তাকে সব খুলে বলেছি। সে রাজি হয়েছে। এইবার তুমি তোমার ঠাকুমার কাছে ফিরে যাও। বাস, আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। আমি চললাম! আশীর্বাদ করি জীবনে সুখী হও, যে আদর্শে তোমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করেছি তা যেন তোমার জীবনকে মহিমান্বিত করে। ইতি

তোমার দাদু।

চার

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

হিমালয়ের পথে একটি বৃদ্ধাকে স্কন্ধে লইয়া একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিতেছেন। সম্মুখে চড়াই তাহার পরই একটি চটি। সময় মত চটিতে পৌঁছিতে না পারিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদিও ঈষৎ শ্বাসকষ্ট হইতেছিল তবু সেই বলিষ্ঠ ব্যক্তিটি ক্ষণকালের নিমিত্ত শ্লথগতি হন নাই।

নাতি ঠাকুরমাকে কেদার-বদরী দর্শন করাইতে লইয়া চলিয়াছে। ডানডিতে-লইয়া যাইবার মতো সঙ্গতি নাই, ঠাকুরমারও হাঁটিবার শক্তি নাই, অগত্যা তাই কাঁধে করিয়া লইতে হইয়াছে। যথাসময়ে তাহারা চটিতে পৌঁছিয়া গেল। পরদিন ভোরে উঠিয়া আবার যাত্রা শুরু হইবে। সামনে আর একটা নাকি চড়াই আছে। আহারাদির পর যে যেখানে স্থান পাইল শুইয়া পড়িল। বৃদ্ধা ও তাঁহার নাতিও একবার শয়ন করিলেন।

...গভীর রাত্রি। বাহিরে শন্ শন্ করিয়া হাওয়া বহিতেছে, চটির সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ঘুমান নাই কেবল বৃদ্ধা। তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার নাতিকে ডাকিলেন।

"বিকাশ, ঘুমুচ্ছ না কি ?"

"কি হয়েছে ?"

বিকাশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

"কিছু হয় নি। তোমাকে শুধু একটা কথা বলতে চাই আজ। অনেকদিন থেকেই বলব ভাবছি. উনি বলতে মানা করেছিলেন বলেই এতদিন বলি নি। আজ উনি নেই, তোমার ঠাকুরদাও নেই, আমি কেদার-বদরী দর্শন করতে যাচ্ছি তোমার কাঁধে চড়ে, আমার মন কিন্তু বলছে কথাটা তোমাকে না বললে আমার তীর্থ দর্শনের পুণ্য হবে না।"

"কি কথা ?"

"আমি তোমার ঠাকুমা বলেই তো তুমি এত কষ্ট সহ্য করে আমাকে কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ—"

"নিশ্চয়ই। এটা আমার কর্তব্য।"

"কিন্তু আমি তোমার ঠাকুমা নই।"

"তার মানে ?"

"আমি লছমী নই, আমার নাম দুর্গা। লছমী ওঁর কাছেও বেশীদিন থাকে নি, ছ-মাস পরেই পালিয়েছিল। তারপর উনি আমাকে বিয়ে করেন। তোমার ঠাকুরদা যখন ওঁর কাছে এসেছিলেন তখন সত্যি কথাটা উনি তাঁকে বলেন নি। ভেবেছিলেন মিথ্যা কথা বললে হয়তো উনি সান্ত্বনা পাবেন। হয়তো ওর পাগলামি সেরে যাবে। তারপর ঠাকুমা বলে তুমি যখন আমার কাছে এসে দাঁড়ালে তখন আমার অন্ধকার ঘরে যেন আলো জলে উঠল। তখন প্রাণ ধরে আমি বলতে পারলাম না তুমি আমার কেউ নও। তারপর দেখতে দেখতে

দশটা বছর কেটে গেল। উনিও চলে গেলেন, আমার ছেলে-মেয়ে হয় নি, তুমিই আমার আশ্রয়. নির্ভর, সব। আমাকে কাঁধে করে তুমিই কেদার-বদরী নিয়ে যাচ্ছ। কিন্তু কেবলই আমার মনে হচ্ছে সত্যি কথাটা তোমাকে বলা উচিত। সত্যি কথা শুনে তুমি আমাকে যদি এখানে ফেলে রেখে চলে যাও তা-ও বরং আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু মিথ্যার বোঝা বুকে লুকিয়ে রেখে আমি কেদার-বদরী যেতে পারব না, গেলে পাপ হবে, পুণ্য হবে না।"

বিকাশ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার গোড়ার কথা মনে পড়িল। ঠাকুরমার অতীত জীবনকে ঘিরিয়া যে রূপকথালোক তিনি মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাও চুরমার হইয়া গেল। কিন্তু তিনি একটি কথা বলিলেন না।

"এ কথা শোনার পর আমাকে কাল নিয়ে যাবি তো?"—বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন।

"নিশ্চয়ই তুমিই আমার ঠাকুমা। ঘুমিয়ে পড়, খুব ভোরে উঠতে হবে কাল। সামনে চড়াই আছে—"

পাঁচ

বিকাশের সমস্ত রাত্রি ঘুম হইল না। আলোর আভাস দেখা যাইতেই তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উষার অরুণরাগে পূর্বাকাশ রঞ্জিত। মেঘে মেঘে হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে স্বপ্নলোক মূর্ত হইয়াছে। সহসা বিকাশের মনে হইল ওই তো আমার ঠাকুমা। তিনিও তো উষার মতো চঞ্চলা অবগুন্ঠনা ছিলেন—।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"দাদু, দাদু, বিকাশ, কোথা গেলি দাদু - "

বৃদ্ধা ঘরের ভিতর হইতে আতঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার ভয় হইয়াছিল বিকাশ বুঝি তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

"এই যে ঠাকুমা, যাচ্ছি, এবার ওঠ। বেরুতে হবে এক্ষুনি।"

"একটু পরে দেখা গেল বিকাশ বৃদ্ধাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চড়াই ভাঙিতেছেন। আকাশে উষা নাই, চতুর্দিকে কেবল পাহাড়…।

আলোবাবু

সবাই তাঁকে আলুবাবু বলত, কিন্তু তাঁর আসল নাম আলো। চেহারা অবশ্য নামের উপযুক্ত নয়। গায়ের রং কুচকুচে কালো, মুখটি বেগুন পোড়ার মত, তার উপর কালো গোঁফ-দাড়ি, যুগ্ম ভ্রূ, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। গলায় তুলসীর মালা, সেটিও কালো হয়ে গেছে। পরনের থানখানি অবশ্য ধপধপে সাদা। গায়ের চাদরখানিও সাদা। আলোবাবু জামা গায়ে দিতেন না। জুতোও পরতেন না।

একদিন সকালে আমার বৈঠকখানায় ঢুকে নমস্কার করে কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই দিনই প্রথম দেখলাম তাঁকে।

"কি চাই আপনার ?"

"অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করবেন আমাকে ?"

সাহায্যপ্রার্থী অনেক আসে, অধিকাংশ লোকই টাকা চায়, ভাবলাম ইনিও বোধ হয় সেই দলের। মনে মনে একটু বিরক্ত হলাম, কিন্তু মুখ ফুটে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারলাম না। বরং বললাম, "অসম্ভব না হলে নিশ্চয়ই করব। বলুন, কি করতে হবে—"

তাঁর বাঁ হাতে একটি ছোট থলি ছিল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে তিনি একটি ছোট পাখির ছানা বার করলেন।

"একটা ছোঁড়া এই পাখির ছানাটার পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমি দু' আনা পয়সা দিয়ে বাচ্চাটা নিয়ে নিয়েছি তার কাছ থেকে। মনে হচ্ছে এর পায়ে লেগেছে, পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল কিনা, একটু দেখবেন দয়া করে ? শুনেছি আপনি বড় ডাক্তার।"

দেখলাম পাখির ছানাটাকে। পায়ে সত্যিই লেগেছিল। টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে বেঁধে দিলাম।

"কি করবেন এটাকে নিয়ে, পুষবেন ?"

"না। ভালো হলে ছেড়ে দেব। জীবন্ত কোন জিনিস পোষবার সামর্থ্য নেই আমার। ইচ্ছে করে খুব, কিন্তু পয়সা নেই। সেই জন্যে বিয়েও করি নি।"

কুন্ঠিত দৃষ্টি তুলে একটু হেসে চাইলেন আমার দিকে।

"ও। এর আগে তো দেখি নি আপনাকে, কোথা থাকেন ?"

"অবিনাশ বাবুর বাড়িতে। দিন সাতেক হল এসেছি।"

আর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলেন। অবিনাশ বাবু এখানকার নামজাদা উকিল একজন।

"অবিনাশবাবুদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি ?"

"না, তেমন কিছু নয়। আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাগ্নির বন্ধুর শ্বশুর উনি। আসলে লোক খুব ভালো। তাই দয়া করে থাকতে দিয়েছেন।"

আলোবাবু পাখির ছানাটি নিয়ে চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি যেতে হয়েছিল। সেখানে আলোবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। দেখলাম তিনি একটি দিশি কুকুরের বাচ্চার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই এক মুখ হেসে বললেন, "বিনুবাবুর কুকুর এটি। কুকুর পোষার শখ আছে কিন্তু সেবা করতে জানে না। ছুটো চোখে এতক্ষণ পিঁচুটি ভরতি ছিল, তুলো ভিজিয়ে পরিষ্কার করলুম। আর কুকুরকে সারাক্ষণ বেঁধে রাখলে কি চলে ? ওদের সঙ্গে খেলা করতে হয়—"

কুকুরটার দিকে চেয়ে তার মুখের সামনে টুসকি দিতে লাগলেন। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করতে লাগল কুকুরটা। বিনু অবিনাশের ছেলে, বয়স দশ বছর।

অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল একটু পরে।

বললাম, "আপনার এই আলোবাবু লোকটি তো অদ্ভুত ধরণের মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ অদ্ভুতই। স্নেহের কাঙাল বেচারা। গরীবও খুব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, এক পাখি-পেশেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন আমার আছে।"

"দেখবেন তো, যদি ওর চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কোথাও। সেবা করতে বড় ভালোবাসে, বিশেষত সেবার পাত্র বা পাত্রী যদি অসহায় হয়—"

দিন কতক পরে সিভিল সার্জনের সঙ্গে দেখা হল। এক সঙ্গে কলেজে পড়েছিলুম। কথায় কথায় আলোবাবুর কথা উঠে পড়ল। সিভিল সার্জন

বললে, "এখানকার হাসপাতালে ওকে প্রবেশনার ড্রেসার করে ঢুকিয়ে নিতে পারি। তবে দশ টাকার বেশী এখন পাবে না। পরীক্ষায় পাস করলে তখন মাইনে বাড়বে—"

আলোবাবু হাসপাতালের আউট-ডোরে রোগীদের ঘা ধোয়াতে লাগলেন। মাসখানেক পরেই কিন্তু চাকরিটি গেল তাঁর। একদিন দেখি আমার ল্যাবরেটরিতে শুষ্ক মুখে বসে আছেন।

"কি খবর—"

"আমাকে দূর করে দিলে।"

"কেন ?"

"একটা লোকের পায়ের ঘা কিছুতেই সারছিল না। সে-ই আমাকে একটা ওষুধ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ওই ওষুধটা দাও তাহলে সেরে যাবে। ওটা লাগিয়ে অনেকের নাকি সেরে গেছে। দিলুম ওষুধটা লাগিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চিৎকার শুরু করে দিলে, সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। ডাক্তারবাবু এলেন, তিনি তো চটেই লাল, বললেন, কার হুকুমে তুমি ঘায়ে কার্বলিক এসিড ঢেলে দিয়েছ। আমি আর কি বলব চুপ করে রইলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে দূর করে দিলেন। আমি ওর ভালোর জন্যেই ওষুধটা দিয়েছিলাম আর ওর কথাতেই দিয়েছিলাম—"

আমিও চুপ করে রইলাম, কি আর বলব। সত্যিই অন্যায় কাজ করেছেন।

কিছুক্ষণ বসে থেকে আলোবাবু চলে গেলেন।

কষ্ট হতে লাগল ভদ্রলোকের জন্য, কিন্তু কি করব ভেবে পেলাম না।

দিন কয়েক পরে অবিনাশবাবুর বাড়ি থেকেও বিদায় নিতে হল আলোবাবুকে। শুনলাম অবিনাশবাবুর স্ত্রী দূর করে দিয়েছেন তাঁকে। আলোবাবু যা করেছিলেন তা কোনও মা সহ্য করতে পারেন না। তিনি এক বগলে কুকুর বাচ্চাটা এবং আর এক বগলে অবিনাশবাবুর শিশু-পুত্র নিন্টুকে নিয়ে একবার কুকুরটার মুখে আর সঙ্গে সঙ্গে তিন্টুর মুখে চুমু খাচ্ছিলেন।

অবশেষে আমিই আশ্রয় দিলাম আলোবাবুকে!

একদিন সন্ধ্যের পর এসে দেখলাম তিনি একটা সোলার হ্যাট বাজিয়ে গুনগুন করে গান গাইছেন।

"আপনি গান বাজনা জানেন নাকি—"

কুণ্ঠিতমুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

"এককালে ডুগি-তবলা বাজাতো‌‌ পারতাম। দৈন্যের দায়ে সব বেচে দিতে হয়েছে। এখন হ্যাট বাজাই—"

বলা বাহুল্য, খুব কৌতুক অনুভব করলাম।

"হ্যাট পেলেন কোত্থেকে—"

"অনেক আগে স্যুটও পরতাম। সব গেছে ওই হ্যাটটি আছে কেবল।"

আলোবাবুর আরও পরিচয় পেলাম দিন কয়েক পরে। একদিন দেখি তিনি ছুটতে ছুটতে আসছেন।

"কি হল, ছুটছেন কেন—"

"দশটা বেজে গেছে, আমার ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি এখনও। রামবাবুর গাইটার বাচ্ছা হয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ শুনতে পেলাম তাঁর বৈঠকখানার ঘড়িতে টং টং করে দশটা বেজে গেল। তখুনি ছুটলুম, আমার বড়িতে ঠিক দশটার সময় দম দি। আমাদের যেমন খাবার, ঘড়ির তেমনি দম, বেচারীর খেতে দেরি হয়ে গেল আজকে—"

তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। আলোবাবুর যে ঘড়ি আছে তা জানতাম না। তাঁর পিছু পিছু এসে একটু আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘরে ঢুকেই তিনি নিজেই ভাঙা তোরঙ্গটা খুললেন। তার ভিতর থেকে বার করলেন একটি ছোট টিনের বাক্স। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়ার ছোট পুঁটুলি-মতন কি বার করলেন। ন্যাকড়াটি খুলতেই লালরঙের শালুর পুঁটুলি বেরিয়ে পড়ল। সেটি খুললেন। বেরুল রেশমী ন্যাকড়ার পুঁটুলি, সেটি খুলতেই বের হল খানিকটা তুলো, তারপর ছোট্ট ঘড়িটি। তিন পুরু কাপড়-ঢাকা ঘড়িটিকে আঙুরের মত রাখতেন তিনি সযত্নে। ঘড়িটি বার করে চাপটালি খেয়ে বসলেন, তারপর চোখ বুজে ধীরে ধীরে দম দিতে লাগলেন। মনে হল যেন পুজো করছেন।

অবিনাশ বাবুর কথাটা মনে পড়ল। স্নেহের কাঙাল বেচারা! জীবনে কিন্তু ভালবাসার সুযোগ পাচ্ছে না কোথাও। সব স্নেহ তাই উজাড় করে দিয়েছে বোধহয় ঘড়িটির উপর।

একদিন ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে দেখি আলোবাবু হ্যাট বাজিয়ে তারস্বরে গান গাইছেন। দুটো লাইনই বার বার গাইছেন—

আমায় ওরা সইলো না কেউ

আমার কাছে রইলো না কেউ—

আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অবাক হয়ে। এমন গলা ছেড়ে গান গাইতে শুনি নি কখনও তাঁকে। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থেমে গেলেন তিনি।

"আজ এত জোরে জোরে গান গাইছেন যে।"

"এমনি।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললেন, "আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। ঠিক সময় হয়তো ভাল করে দম দিতে পারবে না—" টপ-টপ করে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

আলোবাবু এখন পাগলা গারদে আছেন।

সমাজের সঙ্গে নিজেকে তিনি খাপ খাওয়াতে পারলেন না কিছুতে।

বিশ্বাস মশাই

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বাঙালী বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, "এতদূর যখন এসেছেন তখন হরিদ্বারটাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমত, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধ রকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পছন্দ করে, কেউ করে না; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ম্লেচ্ছাচার পছন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মত খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে নাছোড। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন—কোন অসুবিধা হয় নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন—"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠল সবাই। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা বন্ধুদের কাছ থেকে ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। হুজুকে-বাঙালী আর কাকে বলে!

দুই

হরিদ্বারে পৌঁছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভাল করে কাটেনি। জানলা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, নকনে শীত। প্যাসেঞ্জার-কুলি ভিজে ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্ল্যাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কি, পিতামহের নাম কি, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না, প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কী করব দিশেহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু ইধর আইয়ে—"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়লেন তাঁর চেহারা দেখে তো চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এরই ভরসায় আমরা এসেছি! এ যে ভিখারী একটা। পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে তাও কেমন যেন খাপছাড়া গোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি ওখানে চারটি ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাত দুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়লেন। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অপরূপ। যে বিনয় ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে পড়েছিল সে চোখের

দৃষ্টি থেকে তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন ?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না—"

"তা বেশ চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু পিছু আমরা সার বেঁধে চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌঁছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণত কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশী চাইতে লাগল। আমার কাছে দশ টাকার নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছানাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারপর যা ঘটল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারি নি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনি নি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখি নি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথা করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশী দেন নি, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরিকে দিতে হবে কিনা।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, "খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী করবেন বলুন—"

"কী ব্যবস্থা আছে এখানে ?"

দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন ? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না ? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হোক তাহলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভাল।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজী হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগ ডাল পাওয়া যাবে ?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র বুটই বেশী চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে মশুরি আনবেন। খাঁড়ি মশুরি হলেই ভাল হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে ?"

"আলু, নেমুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল ?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন ?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয় ?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে "

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বৌদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তাহলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাজল চাই!"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাই নি। বললেন, "দু কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধভাবে যদি—"

"আচ্ছা আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তাহলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, 'এর তো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি—"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিছু হয় নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা তাই কপালটা গরম হয়েছে—

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন।"

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাঁটি মুশুরিই পেয়েছি মা। বেশ ভাল ডাল।"

তাঁর পিছনে দেখলাম পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটা চারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন বেশ দিন—"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, খিচুড়ির রং তো ভালো হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পডলেন।

"হ্যাঁ, সেকথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ওসব এখন বাটবে কে?

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশী হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন, "আমি আলু-ছেঁচকি করব ঊষা, তুই ভাই আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে সেইটে ধরে কোনরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল-বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি, প্রভৃতি স্থানগুলি দেখিয়ে আনলেন।

এসব সেরে বেশ খিদে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়ে নি। ঠিক হল কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাস মশাই আবার গেলেন সে সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়ে আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিন্তু টিপ-টিপ করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশায় বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই আপনি কাপড়টা জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়ে এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু—"

"এনেছেন বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানে পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোন্‌টা আনব বলুন—"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই

পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম আগ্রা হোটেলে—"

ছায়া আমার শালী। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই এতে তো নেই!"

বাক্স, সুটকেশ, তোরঙ্গ সব খোঁজা হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম। আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন। ভাল ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন, কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।'

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোন দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপানারা কি হৃষিকেশ, লছমনঝোলা যাবেন। যদি যান, তাহলে বাসে করেই যাওয়া ভাল। ইনি আমার চেনা বাসওলা। একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই তাহলে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়তো আবার আসতে পার কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ-যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষিকেশ-লছমনঝোলার বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষিকেশ-লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষিকেশের সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলাই ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার ?"

"তা আর না-ই বা শুনলেন। আমি সামান্য লোক --"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয় দেবার মত নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি নি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখিনি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসঙ্কোচে থেমে গেলেন।

"বাংলা দেশের কথা মনে আছে আপনার ?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ, নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষিকেশ-হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভাল লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিত হাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে

আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা বলুন তো—"

"কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারি নি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"আপনি কি করেন এখানে—"

"এই যাত্রীদের, বিশেষ করে বাঙালা যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কী করবার যোগ্যতা আছে বলুন—"

"বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোন যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি—"

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজ হাতে তিনি আমাদের বিছানাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কী মনে হ'ল, মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম—

"বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন।

"এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, একী, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেন!"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

বিনোদ ডাক্তার

বরাবরই ধারণা ছিল বিনোদ ডাক্তার খুব উঁচুদরের লোক। চিকিৎসক হিসাবে এ অঞ্চলে ওঁর জোড়া নেই, তাছাড়া লোক চমৎকার। গরীবের মা-বাপ। বর্ধমানের কাছে এক পাড়াগাঁয়ে ওঁর বাড়ি। বছর চারেক আগে এখানে এসেছিলেন প্র্যাকটিস করতে, এসেই বেশ জমিয়ে ফেলেছেন। শহরের মাঝখানে জমি কিনে বাড়ি করতে শুরু করেছেন। রূপে গুণে সমান। বেশ সুপুরুষ চেহারা। ইয়া লম্বা, ইয়া বুকের ছাতি। মাথার সামনের দিকটা সামান্য একটু টাক আছে অবশ্য, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় নি, বরং গাম্ভীর্য যেন বেড়েছে একটু। আমি যখনই খবর পেলাম যে বিনোদ আমাদের পালটি ঘর তখন থেকেই ওঁর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়াল। বোনটির এখনও বিয়ে দিতে পারি নি। লোকের কাছে বলে বেড়াই বটে কুড়ি, কিন্তু ওর আসল বয়স পঁচিশ। আর বেশি দেরি করলে, চুলে হয়তো পাক ধরে যাবে। কিন্তু বিয়ের বাজারের যা অবস্থা। তাঁর ওপর বোনটি আমার একটু কালো। চোখ মুখের ছাঁদ খারাপ নয়, লেখাপড়াও শিখিয়েছি কিন্তু এ পোড়া-দেশে রূপ আর রূপিয়ার যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না। এক জায়গায় প্রায় লেগে গিয়েছিল, কিন্তু কুষ্ঠি বাদ সাধল। ভৌম-দোষ বেরিয়ে গেল। কিন্তু বিনোদ ডাক্তারকে দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হল। শুনলাম বিয়ে হয় নি, মা-বাবা নেই, কোনও বখেড়াবাজ অভিভাবক নেই। কৌশলে আলাপ প্রসঙ্গে জানতে পারলাম বিনোদের বয়স পঁয়ত্রিশ। বেশ মানাবে।

সুতরাং লক্ষ্য স্থির রেখে আধুনিক যুগের কয়াদা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছিলাম। মেয়েদের সময়ে বিয়ে না দিলে নানা রকম ব্যাধি জোটে শরীরে। বুক ধড়ফড়, মাথা ঘোরা, ফিট। আমার বোন অমিতারও লেগে থাকত একটা না একটা। আমি এতদিন হোমিওপ্যাথী ওষুধই দিতাম, নিজেরই বাক্স ছিল একটা। কিন্তু একদিন মনে হল এই সূত্রে বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে

অমিতার যদি পরিচয়টা করিয়ে দিতে পারি, আর বিনোদ যদি টোপটা গিলে ফেলে তাহলে আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে।

বুক ধড়ফড় করছিল একদিন অমিতার। বিনোদ ডাক্তারকে ডেকে আনলুম। অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালো করে পরীক্ষা করলে সে। তারপর প্রেসক্রপশন লিখে দিলে। ফি দিতে গেলুম, বললে, "আগে ভালো হোক তারপর ফি নেব।" শুনলাম মধ্যবিত্ত বা গরীব বাঙ্গালীদের কাছ থেকে সে ফি নেয় না। ওষুধে ফল হয় খুব। নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালাম একদিন। তার পর থেকে প্রায়ই আসত যেত। ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল ক্রমশ। আমার সঙ্গে তো বটেই, অমিতার সঙ্গেও। তারপর একদিন কপাল ঠুকে বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেললুম। শুনে সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। মনে হল মুখটা যেন বিবর্ণ হয়ে গেল ক্ষণিকের জন্য। তারপর হেসে বলল, না, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন!"

"বাধা আছে।"

বলেই এমন গম্ভীর হয়ে গেল যে আমি আর বলতে সাহস করলাম না যে বাধাটা অতিক্রম্য কি না। এর পর থেকে সে আমাদের বাড়িতে আসাও বন্ধ করে দিল। ভারি বেকুব হয়ে গেলাম। কি করতে কি হয়ে গেল।

তারপর সসঙ্কোচে গেলাম তার বাড়িতে একদিন। উদ্দেশ্য পুনরায় তাকে নিমন্ত্রণ করে ভাব-সাব করা। গিয়ে দেখি একটি অচেনা লোক বসে আছে আর তার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হচ্ছে।

"আপনাকে যেতেই হবে ডাক্তারবাবু।"

"কোলকাতায় কত বড় বড় ডাক্তার আছেন, সেখানে আমার যাবার তো কোনও দরকার নেই।"

"কিন্তু তিনি আপনাকে ছাড়া আর কারুকে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না। মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। জ্বরও হয় রোজ। কিন্তু তিনি অন্য কোন ডাক্তারকে কাছে ঘেঁসতে দেবেন না।"

"এর মানে কি—"

"সে আপনি গেলে হয়তো বুঝতে পারবেন। আমি তো তা জানি না। আমি চাকর মাত্র—"

"আচ্ছা ঠিকানাটা রেখে যান। আজ না পারি কাল যাব।" ভদ্রলোক ঠিকানাটা লিখে দিলেন একখানা কাগজে। আমিও দেখলাম ঠিকানাটা।

দিন সাতেক বিনোদ ডাক্তার আর ফিরলই না।

যখন ফিরল তখন একটি মেয়ে সঙ্গে করে!

শুধু তাই নয়, মেয়েটির সঙ্গে বাস করতে লাগল!

তাজ্জব বনে গেলাম আমি! গেল রুগী দেখতে, ফিরল একটা মেয়ে সঙ্গে করে। তারপর শুনলুম মেয়েটাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটরিয়মে যাচ্ছে। কোথা থেকে ভাগিয়ে নিয়ে এল এই ঘাটের মড়াটাকে? কিন্তু সামনাসামনি একথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। দিন কয়েক পরে নিজেরই একটা কাজে কোলকাতা যেতে হয়েছিল। সেই ঠিকানাটা মনে হল। গেলাম সেখানে। দেখলাম প্রকাণ্ড বাড়ি, গেটে দারোয়ান রয়েছে। ভেতরে খবর পাঠালাম যে বিশেষ প্রয়োজনে একবার দেখা করতে চাই। দারোয়ান আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। দেখলাম দিব্যকান্তি একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। ধপধপে ফরসা রং, চোখ দুটি টকটকে লাল।

"কি চান—"

"আমি বিনোদ ডাক্তারের খবর নিতে এসেছি।"

"কি খবর—"

"আমার বোনের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম কিন্তু—"

"কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি, এই তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"করলে আমি হাতে স্বর্গ পেতাম।"

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।" আমি বসতেই ভদ্রলোক ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে একটা চাকর কিছু জলখাবার আর চা দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের দেখা আর পেলাম না। কিন্তু আসল খবরটা যোগাড় করতে বিলম্ব হল না আমার। চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এবং পাড়াতেই আশেপাশে খোঁজ করলাম। যা শুনলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম। বিনোদ ডাক্তার বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীকে এই ধনীর দুলালটি সম্মোহিত করে ভাগিয়ে এনেছিলেন। দিনকতক পর স্ত্রীটির হল যক্ষ্মা। এত বড় পাপের ফল ফলবে না। এই খবর পেয়ে বিনোদ ডাক্তার এল। এসে নিয়ে গেছে।

তারপর কি হয়েছে পাড়ার লোকেরা জানে না।

ফেরবার সময় একখানা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। তাতে চোখে পড়ল একটি খবর একজন লোক তার বিশ্বাসঘাতিনী অসতী স্ত্রীকে গুলি করে মেরে নিজে গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কতরকম মানুষই যে আছে এই পৃথিবীতে !

যেমন আছে থাক

হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা সাবানের বাক্সে নানারঙের 'রিবন' রয়েছে। পাশেই আর একটা কৌটো, ঢাকনাটা প্ল্যাস্টিকের, তার ভিতর নানারকম পুঁতি। শেলফের উপরেই তিনটে মোটা খাতা, একস্‌নারসাইজ বুক। খুলে দেখলাম প্রত্যেকটি ছবিতে ভরা। একটাতে ওয়াল্ট ডিস্‌নেব আঁকা ট্রু লাইফ অ্যাড্‌ভেন্‌চারস্‌। আর একটাতে প্রজাপতি আর পাখীর রঙীন ছবি। কয়েকটা কুকুরেরও। সুন্দর সুন্দর ছবি সব। তৃতীয়টাতে ডাকটিকিট।...ক্যালেণ্ডার ঝুলছে এ পাশে ওপাশে। একটাতে ক্রন্দনোন্মুখ একটি নাদুসনুদুস ছোট ছেলের ছবি, আরও একটাতে তাজমহলের। বাঁ দিকের শেলফে নিপুণভাবে গোছানো বইয়ের সারি। অধিকাংশই কলেজের বই, কিন্তু 'সঞ্চয়িতা' এবং গীতবিতান'ও আছে। শেলফের পাশেই নীল টেবিলটা আর তার উপরে তার শৌখিন টেবিল ল্যাম্পটা। সেকালে মফস্বলের মিউনিসি-প্যালিটি রাস্তায় যে ধরনের আলো দিত, ল্যাম্পটা দেখতে সেইরকম। দেওয়ালে আরে একটি ল্যাম্প। তার কাগজের শেডে চমৎকার ফুল-কাটা, অনেকটা রঙীন আলপনার মত। বিছানার ধারে ধবধবে শাদা বেড্‌ সুইচটি ঝুলছে। শৌখিন বেডকভার ঢাকা ছোট্ট বিছানাটি পাতাই রয়েছে। এর পাশেই একটা ছোট শেল্‌ফ। তাতে ছোট্ট টাইমপীস্‌টি রয়েছে, বন্ধ হয়ে রয়েছে, দম দেওয়া হয়নি বলে। ঘড়ি ছাড়া টুকিটাকি আরও কত জিনিস। অদ্ভুত আকৃতির বেঁটে সুন্দর একটা আতরের শিশি। তাছাড়া মাথার কাঁটা, চুলের ফিতে, ছোট ছোট ঝিনুক-দিয়ে-তৈরি ফুলের মতো একটা পেপারওয়েট। আর একটা পেপারওয়েট ডিম্বাকৃতি কাঁচের, গাঢ় বাদামী রঙের। আলমারিতে পুতুলের সমারোহ। কেষ্টনগরের লক্ষ্মী-সরস্বতী-মহাদেব। বৈদিক ধাঁচের

দাঁড়ানো সরস্বতীও রয়েছে একটি। তাছাড়া ব্রোঞ্জের মত দেখতে আর একটি কলসীকাঁখে তন্বী তরুণী। শান্তিনিকেতনের পুতুল কৃষক-দম্পতি। স্ত্রীর মাথায় ঝুড়ি, পুরুষের কাঁধে শিশুপুত্র। তার এপাশে একটি বক, আর এক-পাশে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি, তার পিছনে একটা শৌখিন ট্রে। ট্রের মাথার কাছে একটা টিকটিকি, আর একটা আরশোলা। দেখলে জীবন্ত মনে হয়, কিন্তু মাটির। বুদ্ধগয়া, শিব-লিঙ্গ ধূপদানী, ফোটো-ফ্রেম, ভুঁড়ি-বার-করা ন্যাড়ামাথা বিকশিত দন্ত একটা লোক, কাঠের তৈরি ড্রাগন, তারপরই প্যাঁচা একটা। ঠিক তার উপরে তিনটি আহিরিণী গোয়ালিনীর অপূর্ব মৃন্ময় মূর্তি, মাথায় দুধের কেঁড়ে নিয়ে হাত দুলিয়ে চলেছে সদর্পে। ফুলদানীই কত। পাথরের, মাটির, কাঁচের, পিতলের, চীনেমাটির। তার পাশেই রেঙ্গুন থেকে আনা ল্যাকারের জিনিস, ফুলদানী, কৌটো, চায়ের ট্রে। তার ওধারে চীনে-ধাঁচের বুদ্ধমূর্তি। গয়ার পাথরের বুদ্ধমূর্তিও রয়েছে পাশে। তার পাশেই একটা 'কাপ', আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর শ্রীশ্রীমায়ের ফোটোও রয়েছে। তাঁহাদের সামনে রঙীন ছোট ছোট থালায় কন্যাকুমারী থেকে আনা পাথরের চাল, আর নুড়ি রয়েছে নানারকম। নানারঙের ঝিনুক এবং সামুদ্রিক শামুকের খোলাও। কোণে মোড়া রয়েছে কাগজের রঙীন পাখাটি। আরও কত জিনিস—ছোট ছোট কাপ, ছোট ছোট পাখী, মাটির ফল, কাঠের নেপালী ফুলদানী। তার পিছনে গণেশ।···

ভুটান আর জাম্বু—কুকুর দুটো—মুখ শুকিয়ে বসে আছে থাবার উপর মুখ রেখে। কোথা গেল!

সদ্য-বিবাহিত কন্যা সব ফেলে রেখে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এখানকার একটি জিনিসেও আর দরকার নেই তার। নূতন জায়গায় নূতন জিনিস নিয়ে নূতন সংসার পেতেছে।

চারিদিকেই তার স্মৃতিচিহ্ন দেখে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু ওগুলো যেখানে যেমন আছে থাক। দেখে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু এই কষ্টটাই মিষ্টি। এই মাধুর্যের সম্বলই তো একমাত্র সম্বল।

রামু ঠাকুর

মনিহারীঘাটের প্রায় ক্রোশখানেক পশ্চিমে খেয়াঘাট। মনিহারী ঘাট হইতে যে জাহাজ ছাড়ে তাহা একেবারে সক্রিগলির ঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের সক্রিগলি যাওয়া দরকার, কিংবা সক্রিগলিতে ট্রেন ধরিয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন তাঁহারাই সাধারণত জাহাজে যান। সক্রিগলিতে ঘাট-ট্রেন ধরিয়া সাহেবগঞ্জ জংশনে যাওয়া যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র। জাহাজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মনিহারীতে একটি খেয়াঘাট আছে গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ পারের অনেকের জমি গঙ্গার ঠিক ওপারে আছে, তাহারা প্রত্যহ সেখানে কাজ করিতে যায়। অনেকে আবার চর পার হইয়া পায়ে হাঁটিয়া সোজা-পথে সাহেবগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হয় বাজার করিবার জন্য। ইহাতে তাহাদের ভাড়া কম লাগে, সময়েরও সংক্ষেপ হয়। ভোরে বাহির হইলে সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারে। মালপত্র বহিয়া আনিবার জন্য অনেকে সঙ্গে ঘোড়াও লইয়া যায়। সুতরাং জাহাজে যাওয়া অপেক্ষা নৌকায় যাওয়াই অনেকের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। খেয়াঘাটের এপারেও বালির চর, ওপারেও তাই। বালির চরের উপরই পায়ে হাঁটা পথ হইয়া গিয়াছে একটা। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন সে পথ লুপ্ত হইয়া যায়, নূতন পথ সৃষ্ট হয় আবার!

ওপারে খেয়াঘাটে এই পথের ধারেই রামু ঠাকুরের দোকান। তাহার গলায় একগাছা ময়লা পৈতা আছে, সুতরাং মনে হয় সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয়ও দেয় সে। কিন্তু সে বাঙ্গালী, কি বিহারী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটি ভাষাই অনর্গল বলিতে পারে। যখন বাংলা বলে তখন তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন 'ঠেট্' হিন্দীতে, বা 'ছেকাছেনি' ভাষায় সে কথা কহিয়া ওঠে তখন তাহাকে বিহারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা শক্ত। রামু ঠাকুরের ঠিক পরিচয় কেহ জানে না। কাহাকেও নিজের কথা সে বলে নাই, বলিতে চায় না। তাহার একমাত্র পরিচয়, সে 'রামু ঠাকুর'। গঙ্গার ওই ধু ধু চরে নিজের ছোট দোকান-ঘরটিতে সে একা বাস করে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার দুই বার মাত্র দেখা হয়। যখন খেয়া পারাপার করে তখন। অনেক যাত্রী তাহার দোকানে তখন যায়। রামু ঠাকুরের দোকানটি খাবারেরই দোকান। সাধারণ খাবারই রাখে সে।

চিঁড়া, মুড়ি, রামদানার লাড্ডু, ছাতু, গুড়, নুন, লঙ্কা। গুড়ে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে, ঝোলা গুড় আর ঢেলা গুড়।

দইও মাঝে মাঝে রাখে। দিরা হইতে লছমনিয়া গোয়ালিনী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দই দিয়া যায়। ক্রোশ দুই দূরে চরের মধ্যে তাহাদের বাথান আছে। প্রায় শতখানেক মহিষ আছে সেখানে। লছমনিয়ার বাবা শিউগোবিন গোয়ালা সেই বাথানের মালিক। সেখানে যে দই হয় তাহার অধিকাংশই চলিয়া যায় সাহেবগঞ্জের বাজারে। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত হইলে লছমনিয়া তাহা রামু ঠাকুরকে দিয়া যায়। নগদ দাম চায় না, বলে, 'বে'চ কে দিহ'—অর্থাৎ বেচে দাম দিও। লছমনিয়া আসে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো। কবে আসিবে কিছুই ঠিক থাকে না, হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়ে। বড় ভাল লাগে রামু ঠাকুরের। যেদিন সে আসে রামু ঠাকুর অনেক আগে বুঝিতে পারে। দূর চরের দিগন্তে তাহার লাল শাড়িপরা মূর্তিটি দেখা যায়। আরও কাছে যখন আসে তখন দেখা যায় মাথায় ঝুড়িটি। ঝুড়িতে শুধু দুধের কেঁড়ে এবং দইয়ের মালসাই থাকে না, তাহার কাপড়-জামাও থাকে। তেলও থাকে এক শিশি, নারিয়েল তেল, নারিকেলের তেল। বাম হাতে মাথার ঝুড়িটি ধরিয়া ডান হাত দুলাইতে দুলাইতে আসে। আর একটু কাছে আসিলে তাহার হাতের 'মেঠিয়াও' (বালা) দেখা যায়। আসল রূপার, রোদ চলিয়া চকচক করে। মেঠিয়ার ইতিহাস রামু ঠাকুর শুনিয়াছে। তাহার স্বামী বিক্রম তাহাকে লুকাইয়া কিনিয়া দিয়াছিল নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন লুকানো থাকে নাই, থাকা সম্ভবও নয়,—ইহা লইয়া তাহার শাশের (শাশুড়ী) কি রাগ, ভৈসুরের (ভাসুরের) কি বকাবকি। লছমনিয়ার শুধু 'মেঠিয়া'ই নাই, পৈঁছি, হাঁসুলি, নাকছাবি, মলও আছে। এসব সে অবশ্য পাইয়াছিল বিবাহের সময়। যখন আসে তখন বক্-বক্ করিয়া অনেক গল্প করে লছমনিয়া। অধিকাংশ গল্পই শ্বশুরবাড়ির গল্প। তাহার এখনও 'গওনা' দ্বিরাগমন হয় নাই। শ্বশুরবাড়ীর লোক বার বার খবর পাঠাইতেছে, কিন্তু বাবুজি এখন তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে চাহিতেছে না। লছমনিয়ার আশঙ্কা শেষে এই লইয়া একটা মারপিট না হয়। শ্বশুর, ভৈসুর দুইজনেই দাঙ্গাবাজ লোক। ক্ষেতের সীমানা লইয়া গাঙ্গোতাদের সহিত হরদম লাঠিবাজি চলিতেছে। লছমনিয়া প্রথমেই আসিয়া হাঁক দেয়—'চাচা, ল, উতারো'—কাকা, নাও, নামাও এটা। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া দেয়। তাহার

পর শাড়ির আঁচল দিয়া মাথার ঘামটা মুছিয়া ফেলে সে। মুছিয়া বসিয়া পড়ে প্রায় হাঁটু অবধি শাড়িটা তুলিয়া। বেশ বাহারে শাড়ি পরিয়াই প্রতিবার আসে। লাল রংই বেশী পছন্দ, লালের উপর হলুদ রঙের ফুল-কাটা ছাপা শাড়ি। বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, গঙ্গার হাওয়ায় কানের পাশের হাল্কা চুলগুলি উড়িতে থাকে। রামু ঠাকুর তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া মালসা সুদ্ধ দুইটা ওজন করিতে বসে। যাহা ওজন হয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাহা। কিন্তু লছমনিয়া শুনিয়াও শোনে না, গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে। টুকরি হইতে শাড়ি, গামছা জামা এবং তেলের শিশি বাহির করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রামু ঠাকুরের দিকে চাহিয়া হাসে একবার, তারপর দূরের ঝাউ-ঝোপের দিকে চলিয়া যায়। ওখানে স্নানের ঘাট আছে একটা—এবং সবচেয়ে সুবিধা কয়েকটা ঝাউয়ের ঝোপ ঘাটটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। ফেরে প্রায় আধঘণ্টা পরে। কাচা কাপড়-জামা মাথায় করিয়া লইয়া আসে। লছমনিয়া সব জিনিসই মাথায় করিয়া লইতে ভালবাসে। আসিয়াই দোকানের সামনে বসিয়া হুকুম করে—'দ', খানা দ। রামু ঠাকুর চারটি রামদানার লাড্ডু বাহির করিয়া আনে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায়। তাহার পর কাঁসার একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া রাখে। লছমনিয়া কোনও কথা বলে না, নিবিষ্ট চিত্তে খায়। যখন খায় তখন রামু ঠাকুর একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার গালে কানের পাশে ছোট একটি নীল শিরা আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। গৌর বর্ণের পটভূমিকায় সুন্দর দেখায়। ওই নীল শিরাটি লছমনিয়ার মুখের বৈশিষ্ট্য। খুব কম মেয়ের মুখে দেখা যায়। রামদানার লাড্ডু চারটি শেষ করিয়া সে আলগোছে খানিকটা জল খাইয়া ফেলে। তাহার পর খানিকটা জল লইয়া 'কুল্লা' (কুলকুচু) করে। ফের আবার খানিকটা জল আলগোছে খায়। এটাও লছমনিয়ার বৈশিষ্ট্য। জল খাইতে খাইতে মাঝখানে একবার 'কুল্লা' করিয়া লয়। সব শেষ করিয়া লছমনিয়া বলে,—'চলি অব'—এবার চলি। টুকরি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়। সোজা চলিয়া যায়, একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়ও না। যতক্ষণ দেখা যায় রামু ঠাকুর দেখে। ভাবে আবার কবে আসিবে কে জানে! বাথানে দুই বেশী না হইলে তো আর আমাকে মনে পড়িবে না। রামু ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনে লছমনিয়া একটা প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু একমাত্র নয়। অন্য আকর্ষণও আছে কয়েকটি, কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, তাহারা দোকানে খাবারও খায় না। একটি সাপ গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপার হইতে এপারে আসে। মধ্যে মধ্যে এপারের চরেও তাহাকে দেখা যায়, বালির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতেছে। সম্ভবত শিকারের সন্ধানে আসে। দিয়ার চরে ছোট ছোট পাখী অনেক। সাপটা যখন এপারে আসে রামু ঠাকুর কখনও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে নাই। অনুসরণ করিয়াছে কি করে দেখিবার জন্য। কিন্তু একদিনও দেখিতে পায় নাই। সাপ কিছুদূর গিয়াই মরীচিকার মত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় আকর্ষণ প্রকাণ্ড একটা ঘড়িয়াল। চারদিক যখন নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া যায় তখন ঘড়িয়ালটা তাহার নাকের অগ্রভাগটুকু জলের উপর বাহির করিয়া ভাসিতে থাকে। তাহার পর প্রায় তাহার সমস্ত দেহটাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠে জলের উপর। প্রখর রৌদ্রালোকে গঙ্গার তরঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘড়িয়ালের আবির্ভাব ও তিরোভাব রামু ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িলেই রামু ঠাকুর গঙ্গার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ কোনদিন ঘড়িয়ালটার দেখা না পাইলে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার তৃতীয় আকর্ষণ কতকগুলো পাখী। দুই জাতের দুই রকম মাছরাঙা পাখী রোজ আসে। একটার গায়ে অনেক রকম রং—নীলেরই প্রাধান্য বেশী। আর একটা সাদার উপরে কালোর মিহি কাজ। দুইটাই চমৎকার। ঝাউগাছের উপর বসিয়া থাকে গঙ্গার উপর একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া। তাহার পর ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। সাদায়-কালোয় পাখীটা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। মাঝ গঙ্গার উপর শূন্যে মাঝে মাঝে স্থির হইয়া থামিয়া যায়। পাখা দুইটি তখন নাড়িতে থাকে কেবল, তাহার পর সহসা জলে ঝাঁপাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। কখনও মাছ পায় কখনও পায় না। কিন্তু ক্লান্তি নাই। রামু ঠাকুর নিজের দোকানের কাছে গঙ্গার জলে দুই-তিনটা ছোট ছোট ডাল, একটা শুকনো বাঁশ পুঁতিয়া দিয়াছিল, যদি উহারা তাহার উপর আসিয়া বসে। কিন্তু একদিনও বসে নাই। তাহার কাছে কেহ বসিতে চায় না। গাছের ডালগুলো আর বাঁশটাও মা গঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভালোই করিয়াছেন। মাছরাঙারাই যদি না বসিল ও আবর্জনা থাকা না থাকা সমান। মাছরাঙা ছাড়া আর এক রকম পাখী গঙ্গার উপরে উড়ে। সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। এপার-ওপার করে না,

গঙ্গার স্রোত ধরিয়া ওড়ে। একবার এদিকে যায় আবার ওদিকে। মাছরাঙার মতো কোথাও কখনও স্থির হইয়া উঁচু জায়গায় বসে না। বসে দূরে চড়ায় বালির উপর। অনেক সময় দল বাঁধিয়া। রামু ঠাকুর একবার তাহাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কাছাকাছি গেলেই উড়িয়া যায় এবং ক্রমাগত উড়িতে থাকে। সহজ সাবলীল কি সুন্দর ওড়ার ভঙ্গী। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দেখিতেও সুন্দর, সারা দেহটা ঈষৎ ধূসর সাদা মাথার উপরে কালো টুপির মত, ঠোঁট হলদে রঙের। পা দুইটি লাল। ল্যাজটা ফিঙে পাখীর ল্যাজের মত দ্বিধাবিভক্ত। লোকে বলে গাংচিল। কিন্তু চিলের মত দেখিতে নয় তো। এই চরে রামু ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয় আর একদল পাখী। কয়েকটা কাক, শালিক, ফিঙে আর নীলকণ্ঠ। এরা সব ওপার হইতে আসে আর সারাদিন বালির চরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। রামু ঠাকুর কাক আর শালিকগুলোর সহিত ভাব করিয়াছে। মুড়ি ছড়াইয়া দিলে উহারা আসে, কিন্তু ফিঙে আর নীলকণ্ঠ আসে না।

প্রতিদিন দুইবার খেয়া-পারাপার হয়, তখন নির্জন চর খানিকক্ষণের জন্য মুখরিত চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহার পর সব চুপচাপ। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই মুখচেনা আছে কিন্তু প্রায় কাহারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নাই। যাত্রীদের নিকট যে লোকটি পারানি আদায় করে, সেই লোকটিই মাঝি। যাত্রীদের সহিত সে-ও যাতায়াত করে। এপারে তাহার নিজের বাড়ি, ওপারে শ্বশুর বাড়ি। ইহারা কেহ কেহ রামু ঠাকুরের দোকানে খায়। ইহার বেশী আর সম্পর্ক নাই।

খেয়া পর্ব শেষ হইয়া গেলে রামু ঠাকুর কিছুক্ষণ দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর সে যাহা করে তাহা অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয় সে। তাহার পর গঙ্গা হইতে তুলিয়া তুলিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গামাটি মাখে, বিশেষ করিয়া দুই উরুর উপর ঘষিয়া ঘষিয়া মাখে। তাহার পর আসিয়া রোদে বসিয়া থাকে, আর সূর্য প্রণাম করে। গায়ের সমস্ত মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন গঙ্গায় নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। ইহার জন্যই সে নির্জন চরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ একদিন একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। চর ভাঙিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া হাজির হইল তাহার দোকানের সামনে। তাহার কপালে প্রকাণ্ড সিন্দুরবিন্দু, হস্তে ত্রিশূল। রামু ঠাকুর একটু

ভড়কাইয়া গেল। সন্ন্যাসী হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

"ওরে, নৌকা কখন ছাড়বে?"

"সন্ধ্যের পর।"

"সমস্ত দিন এখানে বসে থাকতে হবে?"

"তা ছাড়া উপায় কি—"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে?"

"আছে—"

"তুই তো দেখছি ভক্ত লোক। সন্ন্যাসীকে ভালো করে খাওয়া তাহলে—"

"কি খাবেন বলুন—"

"ভাল করে ময়ান দিয়ে লুচি কর। মুখরোচক করে আলুর দমও কর খানিকটা। তারপর হালুয়া, না হয় গোটাকতক রসগোল্লা দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

"আমি ওসব দিতে পারব না।"

"তাহলে সরু চিঁড়ে, ভাল দই, কিছু কলা আর গোটাকয়েক প্যাড়া দে। ওতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে—"

"তা-ও নেই ঠাকুর। আমর দোকান খুব ছোট।"

"কি আছে তোর দোকানে?"

"কিছু শুকনো মুড়ি আছে। গুড়ও দিতে পারি একটু—"

"নেই গুড়-মুড়ি নেহি খায়েঙ্গে।"

ক্রোধ-ভরে সাধু চলিয়া গেল। চর ভাঙিয়া দূরের ঝাউ-বনের ওপারে অন্তর্ধান করিল। ক্ষুধার্ত এভাবে রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামু ঠাকুর মনে মনে ভয় পাইল একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। সাধু যাহা চাহিতেছে তাহা যে তাহার নিকট নাই। রামুর স্নানাহার হইয়া গিয়াছিল, সাধু না আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইত, কিন্তু সাধু আসাতে ঘুমের আমেজ কাটিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল সে একাকী। ঘড়িয়ালের নাকটা ধীরে ধীরে দেখা গেল। দুইটি গাংচিল স্বচ্ছন্দ লীলায় গঙ্গার উপর উড়িতেছিল, স্রোতের জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিতেছে যেন। ঘড়িয়ালটার কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দুই জনেই একটু উপরে উড়িয়া গেল। রামু ঠাকুরের মনে পড়িল তাহার মেয়েকে। ঝুনু এখন কত বড় হইয়াছে? লছমনিয়ার মতই হইবে। তাহাকে

এখনও মনে রাখিয়াছে কি ? কে জানে ! গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া চরের বালিও উড়িতে শুরু করিল। একটু পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল সে।

"এ-দোকানদার, এ-দোকানদার, উঠো—"

রামু ঠাকুর ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল : সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

"দেখ, খানে দেও—"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"ভুখ লাগনে সে সাধু মুড়ি ভি খায়। দেও"

গঙ্গাজলে ভিজাইয়া ঢেলা গুড়-সহযোগে সাধু প্রচুর মুড়ি খাইল। বস্তুত রামু ঠাকুরের দোকানের যত মুড়ি সব সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—

"তোর উপর খুব প্রসন্ন হুয়া। এক পঞ্চমুখী শংখ তে কো দেঙ্গে। কন্যাকুমারী সে লায়া হ্যায়। দাম লাগে গা পাঁচ রূপেয়া। মগর শ রূপেয়া খরচ করনে সে ভি ইহ নেহি মিলে গা। হুঁ—"

গেরুয়া ঝোলা হইতে সে বাদামী রঙের শাঁখ বাহির করিল একটা। শাঁখটির সর্বাঙ্গে গাঁট-গাঁট ; ইহা ছাড়া শাঁখের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য রামু ঠাকুরের চোখে পড়িল না।

"সাধুবাবা পাঁচ টাকা তো আমি দিতে পারব না। অত টাকা আমার নেই, আমি গরীব মানুষ।"

"কেতনা দে সকেগা—"

"আট আনার বেশী পারব না।"

"আচ্ছা লে লে। তু ভক্ত হ্যায়।" লে লে—"

"এ শাঁখের উপকারিতা কি সাধুবাবা ?"

"ঘর মে রহনে সে মঙ্গল হোগা। বিমারি হোনে সে বিমারি ভি ছুট যায়ে গা—"

"অসুখও সেরে যাবে ?"

"জরুর—"

একটু পরেই খেয়া-ঘাটের মাঝি আসিল অন্যান্য কয়েকটি যাত্রী, কয়েকটি ছাগল এবং দুইটি মালবাহী ঘোড়াও জুটিল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুর

নৌকায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। রামু ঠাকুর একা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার মেঘে তখনও রং লাগিয়া আছে, শুকতারাটা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহা অদ্ভুত। পঞ্চমুখী শাঁখটি সে উরুতের উপর ঘষিতে লাগিল। দুই উরুতেই সাদা সাদা গোল গোল দাগে ভরতি। চিমটি কাটিলে লাগে না। কুষ্ঠ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে আসিতে দিও না। তোমার মেয়েকে কোলে করিও না। এ রোগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সহজে আক্রান্ত হয়। অনেকদিন ঔষধ খাইয়াছিল. কিছু হয় নাই। একজন সাধু উপদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যহ গায়ে গঙ্গামাটি মাখিয়া সূর্য পূজা করিবে, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিবে। নিষ্ঠাভরে যদি করতে পার, সারিয়া যাইবে কুষ্ঠ। দশ বৎসর পূর্বে রামু ঠাকুর বাড়ি হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন চরের খেয়াঘাটে বাসা বাঁধিয়াছে। সাধুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছে।--কিন্তু কই? উপকার হইয়াছে কি?

পঞ্চমুখ শাঁখটা সে উরুতের উপর প্রাণপণে ঘষিতে লাগিল। ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবু ছাড়িল না। ঘষিতেই লাগিল।

নিত্য চৌধুরী

মনিহারীর নিত্য চৌধুরীকে ইদানিং যাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা তাহার কৈশোর মূর্তি কল্পনা করিতে পারিবেন না। নিত্য বেঁটে ছিল. কিন্তু বুড়ো বয়সে তাহার রং যত কালো হইয়া গিয়াছিল তত কালো সে ছেলেবেলায় ছিল না. রোদে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার রং কালো হইয়া যায়। এখন যাঁহারা তাহার মাথায় কদমছাঁট সাদা চুল দেখিয়াছেন তাঁহারা যদি ষাট বৎসর পূর্বে তাহাকে দেখিতেন তাহা হইলে তাহার মাথার অ্যালবার্ট তেড়ি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন। বুড়াবয়সে অনেকে তাহার গলায় তুলসীর মালা দেখিয়াছেন. ইহাও হয়তো অনেকে জানেন যে, সে ঘোরতর বৈষ্ণব ছিল, যে বাড়িতে মাছ-মাংসের সংস্রব আছে সে বাড়িতে সে জলস্পর্শ করিত না। কিন্তু ছেলেবেলায় তাহার গলায় তুলসীর মালা থাকিত না. থাকিত একটি রঙীন কমফর্টার, আর সে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়িতে আসিয়া মুরগীর ডিম খাইয়া যাইত।

নিত্য চৌধুরীর বাবার সহিত আমার বাবার বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সে আলগা ধরণের বন্ধুত্ব। সমাজের সর্বত্র প্রচলিত সেই ধরণের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ের মধ্যে আত্মিক কোন যোগ হয় নাই। হওয়া সম্ভবই ছিল না। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী ডাক্তার এবং নিত্য চৌধুরীর বাবা ছিলেন অত্যাচারী জমিদারের কর্মচারী। শোনা যায় দুষ্ট এক প্রজাকে শাসন করিবার জন্য জমিদারের আদেশে তিনি রাত্রে তাহার গৃহে অগ্নিসংযোগ করেন। বাড়ির লোক কেহ মরে নাই বটে, কিন্তু এক-গোয়াল গরু পুড়িয়া গিয়াছিল। এ ধরণের লোকের সহিত বাবার আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু তাহাদের সহিত আমাদের পারিবারিক একটা সম্প্রীতি ছিল। বাবা যখন প্রথম মনিহারীতে আসেন তখন নিত্য চৌধুরীর বাবাই তাঁহাকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য কৃতজ্ঞতারও একটা বন্ধন ছিল।

নিত্য আমার সঙ্গে পড়িত। পাঠশালার তারাপদ পণ্ডিত তাহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। এ ব্যাপার আজকালও হয়। বড় অফিসার বা মিনিস্টারের ছেলেমেয়েরাও বিদ্যালয়ে আজকাল একটা অনুগ্রহের পরিবেশে চলা-ফেরা করে। নিত্য ক্লাসে শৌখিন কাপড় জামা পরিয়া জামাইয়ের মত বসিয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতেন না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষায় একটা অভিনয় করিতেন মাত্র। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়াই করিতেন, কিন্তু তাহার উত্তরের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। নিত্য প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পাস করিয়া যাইত। নিত্যর মা পণ্ডিত মহাশয়কে নিয়মিতভাবে সিধা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার ধারণা ঘুষ না দিলে কোন-কিছুই এ বাজারে সুসম্পন্ন হয় না। তিনি গ্রামের পোস্ট-মাস্টারকে, ডাক্তারবাবুকে, দারোগাকে প্রত্যককেই কিছু না কিছু উপহার পাঠাইতেন। কাহাকেও দুধ, কাহাকেও দধি, কাহাকেও বা মাছ। গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ছিল, দুইটিতেই তিনি পূজা পাটাইতেন। গ্রামে একটি পূজ্য অশ্বত্থগাছ, একটি পূজ্য নিমগাছ এবং একটি পূজ্য বটগাছ ছিল। প্রত্যেক গাছের তলায় সিঁদুর-মাখানো বিষ্ণুমূর্তি, গনেশমূর্তি শিবমূর্তি প্রভৃতি স্তূপীকৃত হইয়া থাকিত। অনেকেই সেখানে গিয়া গঙ্গাজল ঢালিতেন। নিত্যর মায়েরও ইহা একটি দৈনন্দিন কর্ম ছিল। তিনি নররূপী বা প্রস্তররূপী কোনও ক্ষমতাবান ব্যক্তিকেই অবহেলা করিতেন না।

প্রত্যহ সিধা পাওয়া সত্ত্বেও তারাপদ পণ্ডিত কিন্তু নিত্যর সম্বন্ধে উদাসীন

ছিলেন। মাঝে মাঝে কেবল বলিতেন, তুমি হাতের লেখাটা পাকা কর, আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই চাররকম অঙ্ক ভাল করিয়া শিখিয়া ফেল। ইতিহাস, ভূগোল, আকাশতত্ত্ব, এসব তোমার পড়িবার দরকার নাই। ওসব তোমার কাজে লাগিবে না।

নিত্য একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেন পণ্ডিতমশাই?

তারাপদ পণ্ডিত উত্তর দিয়াছিলেন, তোমার গোঁফের রেখা দেখা গেলেই তুমি জমিদারী সেরেস্তায় ঢুকিবে এবং পাটোয়ারি হইবে। সুতরাং হাতের লেখা এবং যোগ বিয়োগ গুণ ভাগটা পাকা কর। মাথায় যদি ঢোকে শুভঙ্করীটাও চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল, নিত্য চৌধুরী শেষ পর্যন্ত জমিদারি সেরেস্তায় পাটোয়ারির পদেই বাহাল হইয়াছিল। তাহার বেতনের কথা শুনিলে এখন অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিবেন না, অনেকে হয়তো হাসিবেন। নিত্য প্রথমে মাসিক আট আনা বেতনে বাহাল হইয়াছিল। তাহার বাবার বেতন ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু তাহারা যে ঠাটে থাকিত তাহা এখন সহস্রমুদ্রাবেতনভোগীরা কল্পনাও করিতে পারেন না। তাহাদের হাজার বিঘা জমি ছিল। গোয়ালভরা গরু ছিল। বাগানে অনেক মহিষ থাকিত, বাড়িতে বেশ বড় একটি চন্দনা ছিল, ছাগল যে কত ছিল তাহার গণনা কেহ করিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি নিত্য আমার সহপাঠী ছিল। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই নিত্যর সহিত আমার কতটা যে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহা বলা যায় না। ছেলেবেলায় নিত্যই আমার প্রধান সঙ্গী ছিল। পাঠশালার ছুটি হইয়া গেলে তাহার সহিতই নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই আকর্ষণের একটা কারণও এখন বুঝিতে পারি। ছেলেবেলা হইতে নিত্যর খবর সংগ্রহের বাতিক ছিল। সারাজীবন ইহাই তাহার অবসর-বিনোদনের একমাত্র উপায় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সারাজীবন সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানারকম খবর সংগ্রহ করিত। ছেলেবেলায় এই খবরগুলিই আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিত। খবরের টানেই তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

একদিন সে আসিয়া বলিল, "জাহাজঘাটে কয়লা ঠাকুর এসেছেন দেখতে যাবি? চল "

"কয়লা ঠাকুর আবার কি!"

"সে একজন বড় সন্ন্যাসী। খালি কয়লা খেয়ে থাকে। তাই জাহাজঘাটে-ঘাটে ঘোরে। রাত্রে যখন ধ্যান করে তখন টিকিটা খাড়া হয়ে যায় আর তার ডগা থেকে ধোঁয়া বেরোয়। জাহাজের নল থেকে যেমন বেরোয় তেমনি। এতদিন সক্রিগলি ঘাটে ছিল, কাল এখানে এসেছে। যাবি?"

এমন একটা আশ্চর্য সন্ন্যাসীকে দেখিবার লোভ সংবরণ করা শক্ত। গেলাম জাহাজঘাটে। জাহাজঘাট আমাদের বাড়ি হইতে প্রায় দুই মাইল। হাঁটিয়াই গেলাম। জাহাজঘাটে চারিদিকেই কয়লা। একটা কয়লার স্তূপের কাছে ক্ষীণকায় মসীকৃষ্ণ একটি লোককে দেখাইয়া নিত্য বলিল—এই কয়লাবাবা। তাহার মাথায় একটি সরু টিকিও আছে দেখিলাম। আমি সভয়ে আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম, কই, টিকি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না তো। নিত্য বলিল, সব সময় বেরোয় না। রাত বারোটার সময় যখন ধ্যান করেন তখন বেরোয়। তখন টিকিটাও খাড়া হয়ে যায়।

জাহাজঘাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এজন্য মায়ের কাছে বকুনি এবং বাবার কাছে কানমলা খাইলাম। নিত্যর জন্য এরূপ নির্যাতন আমাকে প্রায়ই সহ্য করিতে হইত।

একদিন নিত্য বলিল, "আলোর সাঁপ দেখেছিস?"

নিত্য অকারণে যেখানে সেখানে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া দিত। সাপকে সাঁপ এবং ইতিহাসকে ইতিহাঁস বলিত।

"আলোর সাপ? না, দেখি নি তো!"

"আমি দেখেছি।"

"কোথায়?"

"আমাদের বাগানে রাত একটার সময় গেলে তুইও দেখতে পাবি। আকাশ থেকে সে সাঁপ মাটিতে নামে, তারপর আবার আকাশে চলে যায়। ইয়া মোটা সাঁপ।"

বড়ই বিস্মিত হইলাম।

"কিন্তু আমি তো ভাই অত রাত্রে বাড়ি থেকে যেতে পারব না।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। মা তোকে আজ আমাদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবে। তারপর রাত্রি দশটার সময় ফাগুয়া তোদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিয়ে দেবে যে তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস, সকালে বাড়ি যাবি। আমরা দুজন বাইরে শোব। তারপর ঠিক সময়ে বাগানে চলে যাব।"

তাহাই হইল। গভীর রাত্রে উঠিয়া আমরা আলোর সাপ দেখতে গেলাম। দেখলাম বেশ মোটা সাপ। আকাশের এক প্রান্ত হইতে উঠিয়া সমস্ত আকাশটায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইল, তাহার পর হঠাৎ মিলাইয়া গেল। ষ্টিমারের সার্চলাইট পূর্বে কখনও দেখি নাই। অনেকদিন পরে জানিয়াছি নিত্য যাহা দেখিয়াছিল তাহা ষ্টিমারের সার্চলাইট। তখন রাত্রি একটার সময় একটা বড় ষ্টিমার সার্চলাইট ফেলিয়া দূরের গঙ্গা দিয়া যাইত।

এই ধরনের চমকপ্রদ খবরের টানে নিত্যর সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। অনেকবার সে আমাকে ঠকাইয়াছে। একবার বলিল, কাজিগ্রামে একজনের বাড়িতে ভালো বিলাতী কুকুরের বাচ্ছা হইয়াছে। গেলেই একটা বাচ্ছা পাওয়া যাইবে। গেলাম। গিয়ে দেখিলাম একটা নেড়ী কুত্তির পিছু পিছু একপাল বাচ্ছা ঘুরিতেছে। বাড়ির মালিককে বলিবামাত্র সে সানন্দে গোটা দুই বাচ্ছা আমাকে গছাইয়া দিল। বাড়িতে আসিয়া বাবার নিকট মার খাইলাম। মা বাচ্ছা দুইটাকে অবিলম্বে দূর করিয়া দিলেন।

আর একটা খবরের কথাও মনে পড়িতেছে। নিত্য একদিন আসিয়া বলিল, আমাদের বাড়িতে একদল বেদে এসেছিল। তাহাদের কাছে একটা অদ্ভুত খবর শুনলাম। ছাগলের দু'কানে যদি দুটো চটিজুতো পরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আর নড়ে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কিছুদিন আগে বাবা বেশ ভালো একজোড়া চটি কিনিয়াছিলেন। বাসনা হইল ওই চটি দিয়া একদিন নিত্যর কথার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। পরের রবিবারেই সুযোগ মিলিয়া গেল। বাবা দুপুরে আহারাদির পর ঘুমাইতেছিলেন, তাঁহার চটি দুইটি সহজেই সরাইতে পারিলাম। দুপুর-বেলা আমাদের বাগানে অনেক ছাগল আসিত। গেট বন্ধ করিয়া একটা বলিষ্ঠ খাসি ধরিয়া ফেলাও অসম্ভব হইল না। নিত্য আর আমি দুইজনে মিলিয়াই সহজে তাহা পারিলাম। নিত্য খাসিটাকে ধরিয়া রহিল, আমি তাহার দুই কানে বাবার নূতন চটিজোড়া পরাইয়া দিলাম। খাসির শিং দুইটা বড় থাকাতে সুবিধা হইল। চটি দুইটা পরাইয়া দেওয়া মাত্র খাসিটা কয়েক মুহূর্ত গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে জীবনে আর কখনও বোধ হয় পড়ে নাই। কিন্তু যে মুহূর্তেই সে বুঝিতে পারিল যে আমরা তাহাকে আর ধরিয়া নাই সেই মুহূর্তেই সে ছুট দিল। খাসির ওরকম ছুট আমি অন্তত দেখি নাই। ঘোড়াকে হার মানাইয়া দিল। চটি দুইটি মাথায় লইয়াই

সে ছুটিতেছিল, আমরাও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলাম। নিত্যর খবর যে নিতান্তই ভুয়া তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বাবার চটিজোড়া তো উদ্ধার করিতে হইবে। বনবাদাড় পার হইয়া মাঠামাঠি খাসিটা ছুটিতে লাগিল। আমরাও ছুটিতে লাগিলাম। আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, নিত্যর পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে সে বসিয়া পড়িল।

আমি ছুটিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ ছুটিবার পর ছাগলটার কান হইতে একপাটি চটি পড়িয়া গেল, দ্বিতীয়টি লইয়া সে একটা অড়হর ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একপাটি চটি হাতে করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম। বাবা তখনও ঘুমাইতেছিলেন, ভাগ্য ভাল ছিল, ধরা পড়িলাম না। বাবা উঠিয়া চটিটি খুঁজিলেন, তাহার পর অনুমান করিলেন বোধ হয় কুকুরে লইয়া গিয়াছে।

নিত্যকে তাহার পর দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, সে এরকম একটা বাজে খবর আনিয়া মিছামিছি আমাকে হয়রান করিল কেন।

"বেদেরা আমাকে বললে যে—"

"যে যা বলবে তুই বিশ্বাস করবি?"

"তুমিও তো বিশ্বাস করলে।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যদি এসব খবর না আনতাম তুমি কি আমার কাছে আসতে? আমার সঙ্গে ঘুরতে?"

আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া করুণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে কেউ আসে না ভাই। আমি দেওয়ানজির ছেলে বলে বোধ হয় সবাই আমাকে ঘেন্না করে।"

দেখিলাম তাহার চোখে জল টলটল করিতেছে।

গ্রামের পড়া শেষ করিয়া আমি শহরে চলিয়া যাই। মাঝে মাঝে ছুটিতে বাড়ি আসিতাম। কখনও অন্যত্র যাইতাম। নিত্যর সহিত অনেকদিন দেখা হয় নাই। একবার হঠাৎ দেখা হইয়া গেল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে পড়ি। শুনিলাম নিত্যর বিবাহ হইয়াছে, একটি মেয়েও হইয়াছে। নিত্য প্রায় রোজই আমার কাছে আসিতে লাগিল। দেখিলাম সে এখনও খবর ফেরি করিতেছে, কিন্তু এবার খবরগুলি অন্যরকম। কিছুদিন আগে নিত্য পাটোয়ারির পদে বহাল হইয়াছিল, তাই খবরগুলি প্রায়ই জমিজমা সংক্রান্ত। রামকে হয়তো বলিল, শ্যামের বিষয় এবার নীলামে উঠিবে। অনেক খাজনা

বাকি পড়িয়াছে। শ্যামকে বলিল, রামের উপর মালিকের ভালো ধারণা নাই, আমাকে বলিয়াছেন, গ্রাম হইতে উহাকে দূর করিয়া দাও। দেখিলাম এই ধরনের নানারূপ মিথ্যা খবর চালাচালি করিয়া গ্রামে সে বেশ একটা প্রতিপত্তি জাহির করিয়াছে। আমাকে বলিল, তোমাদের রঘুনাথ দিয়াড়ার জমি সেধু মণ্ডল খানিকটা চাপিয়া লইয়াছে। চল গিয়া দেখিয়া আসি। আমি থাকিতে অবশ্য তোমার জমি কেহ দাবাইয়া লইতে পারিবে না। তবু যদি দেখিতে চাও চল। আমি আর গেলাম না।

ইহার পর নিত্যর সহিত যখন দেখা হইয়াছিল তখন আমি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছি। আসিয়া দেখিলাম নিত্য একেবারে বুড়ো হইয়া গিয়াছে। মাথার চুল সব সাদা, খুব, ছোট করিয়া ছাঁটা। একটিও দাঁত নাই, দুই পাটি বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া দেখাইল। তখনও দেখিলাম তাহার খবর সংগ্রহ করিবার বাতিক ঠিক আছে। কিন্তু এবার দেখিলাম খবরের ফর্দ অন্য রকম। সে মৃত্যু সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে। আমার সহিত দেখা হইতেই বলিল, 'তুমি এতদিন পরে এলে, গ্রামের অনেক লোকের আর দেখা পাবে না। অনেকেই পটল তুলেছে। গনোরি, ভিখন সিং, বিজুবাবু, কালী সিং, রাজু পাটোয়ারি, তুরীটোলার বর্ষতিয়া—সব মরে গেছে। ভাদো মুন্সী ভুগছে। তার ছেলেরা কাটিহার থেকে বড় ডাক্তার ডেকেছিল, তারা বলে গেছে বাঁচবার কোনও আশা নেই। তুমি কি একবার দেখবে, চল না?'

চিকিৎসার জন্য নহে, ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। মৃত্যু-পথযাত্রী ভাদো মুন্সী আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও কথা বলিলেন না। দিন দুই পরে নিত্য আর একটি খবর আনিল। হরিবোল সাহার নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। নিত্যই নাকি তাহার দুই ছেলেকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছে। আমি কি তাহাকে দেখিতে যাইব? আমি আর গেলাম না। শরীরটা সেদিন খুব ভাল ছিল না। নিত্য চলিয়া যাইবার একটু পরেই তাহার ভাই আসিল। নানা কথার পর আমাকে আস্তে বলিল, নিত্যর কথায় আমি যেন যেখানে সেখানে ঘুরিয়া না বেড়াই। উহার উদ্দেশ্য কেবল ফপরদালালি আর বাহাদুরি করা। শুনিলাম নিত্যর ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নাই। তিন ভাই পরস্পরের ঘোর শত্রু। আর একদিন নিত্য আসিয়া বলিল, বেচুবাবু কণ্ট্রাক্টারের এবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি? নিত্য বলিল, গত একমাস হইতে বেচুবাবু শয্যা লইয়াছেন, প্রতিমুহূর্তেই সকলে আশঙ্কা

করিতেছেন এই বুঝি তিনি গেলেন। কিন্তু তিনি যাইতেছেন না। প্রাণবায়ু কিছুতেই বাহির হইতেছে না। নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। পরশুদিন তাঁহার বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, সকলে ভাবিল এই বোধহয় শেষ। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, আমাকে একগ্লাস জল দাও। তাঁহার ছেলেরা পূর্ব হইতেই কাঠ, খাটিয়া প্রভৃতি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বেচুবাবু মরিতেছেন না। অবশেষে কাঁটাক্রোশের প্রবীণ কবিরাজ 'কান্হাই' মিশিরকে ডাকা হইয়াছে। তিনি নাড়ী দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন আজ রাত্রে নিশ্চয় মরিবে। দেখিলাম বেচুবাবুর ছেলেরা উঠানে বসিয়া কাঠ কাটিতেছে। কিন্তু বেচুবাবু এখনও মরেন নাই। তিনি শুইয়া শুইয়া কাঠ কাটার শব্দ শুনিতেছেন।

সেবার আসিয়া যে কয়দিন ছিলাম নিত্যকে এই ধরনের খবর সংগ্রহ করিতে দেখিয়াছিলাম। অনেক দূর দূর গ্রামের মৃত্যুসংবাদও সে সংগ্রহ করিয়া আনিত।

মাত্র কয়েকদিন হইল এবার মনিহারী আসিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম নিত্য আসিবে, কিন্তু আসিল না। হঠাৎ তাহার ভাই আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আপনি এসে গেছেন ভালই হয়েছে দাদা। আপনি আজকের দিনটা কোনরকমে পার্ করে দিন। আজ শনিবার অমাবস্যা, আজ যদি নিত্য মরে সমস্ত পাড়াটা খারাপ হয়ে যাবে।"

"কি হয়েছে নিত্যর ?"

"পক্ষাঘাত হয়েছে, গত পনর দিন বিছানায় পড়ে আছে, আজ খুব বাড়াবাড়ি নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে। আজকের দিনটা ওকে বাঁচিয়ে দিন দাদা—"

এখানে আসিয়া অনেকের সহিতই দেখা হইয়াছিল। কেহই তাহার কথা বলে নাই। যে নিত্য কত লোকের অসুখ লইয়া মাথা ঘামাইত দেখিলাম তাহার জন্য কেহই মাথা ঘামাইতেছে না। তাহার ভাই ঘামাইতেছে, কিন্তু অন্য কারণে।

নিত্যকে দেখিতে গেলাম। সে আমাকে চিনিতে পারিল না। তাহাকে একটি ইনজেকশন দিলাম। যে কারণেই হোক, সে শনিবারটা টিকিয়া গেল। মারা গেল রবিবার সকালে।

শ্মশানে তাহার চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ কানের কাছে কে যেন বলিল—"এসব খবর যদি না আনতাম, তুমি কি আমার কাছে আসতে ?'

বিরজুর মা

মনিহারা গ্রামের বিরজুর মাকে মনিহারী গ্রামবাসীদের এখন মনে আছে কিনা জানি না, কেননা, মানুষের স্মৃতি বড় ক্ষণজীবী। স্বার্থের সম্পর্ক যাহার সহিত যতক্ষণ থাকে, মানুষ তাহাকে ততক্ষণ মনে রাখে। স্বার্থের সম্পর্ক ফুরাইলেই মানুষ ভুলিয়া যায়, ইহাই নিয়ম।

বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে যখন আসিত তখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসরের বেশী নয়। সে ছিল গয়লানী। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়া বেড়াইত। সারা গ্রামে দুধ দিয়া বেড়াইত সে। যখনই আসিত সঙ্গে একটা না একটা ছেলে বা মেয়ে থাকিত। কখনও কালো, কখনও ফর্সা, কখনও বেঁটে, কখনও লম্বা। কারো নাকে সিকনি, কারো চোখে পিঁচুটি, কারো মাথায় তেল নেই, কারো মুখের কোণে ঘা। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। আমার মায়ের স্বভাব ছিল, ছেলে-মেয়েদের অসুখ তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, মা বিরজুর মায়ের ছেলে-মেয়েদের কোনো না কোনো ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

আমাদের বাড়িতেই অনেক দুধ হইত। বাহির হইতে দুধ কিনিবার দরকার ছিল না। তবু বিরজুর মা একপোয়া দুধ আমাদের বাড়িতে দিত। মা বলিতেন, তোর কালোগায়ের দুধ দিয়ে যাস্ একপোয়া করে। মায়ের বোধ হয় আর-একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিরজুর মা আমাদের বাড়িতে ঘুঁটে ঠুকিয়া দিত। তাহার সহিত যে ছেলে বা মেয়ে আসিত তাহারাও ঠুকিত।

বিরজুর মার চেহারা আমার বেশ মনে আছে। সে বেঁটে লোক ছিল। ঘাড়টা ডানদিকে একটু হেলিয়া থাকিত। কালো রং ছিল। একটা চোখে তারার মাঝখানে সাদা সাদা দাগ ছিল একটা। কোনকালে ঘা হয়েছিল হয়তো। বিরজুর মায়ের কিন্তু আর একটা যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা সচরাচর দেখা যায় না। তাহার কণ্ঠস্বর উদারা মুদারা তারা এই তিনটি গ্রামেই সমানভাবে বাজিত। যখন যে গ্রামে ইচ্ছা সে কথা কহিতে পারিত। যখন কাহাকেও সদুপদেশ দিত তখন তাহার কণ্ঠে বাজিত উদারা, সাধারণত কথাবার্তার সময় মুদারা, আর ঝগড়া করিবার সময় তারা। যখন চুপি চুপি বসিয়া মায়ের

কাছে পরনিন্দা করিত তখনও মনে হইত যেন তারায় তাহার কণ্ঠ বাজিতেছে। মনে হইত, একটা ভ্রমর যেন দ্রুতছন্দে গুনগুন করিয়া চলিয়াছে।

বিরজুর মাকে চিরকাল এরকমই দেখিয়াছি। তাহার বয়স কত হইতে পারে তাহা কোনদিন ভাবি নাই। মোটামুটি ধারণা ছিল বিরজুর মা আমার মায়ের বয়সী হইবে। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল যে, আমার সে ধারণা বদলাইয়া গেল। বিরজুর মা একদিন ফিস ফিস করিয়া মায়ের কাছে নালিশ করিল যে, তাহার বড় ব্যাটা হকৃরু কাল তাহাকে মারিয়া তাহার রূপার মেঠিয়া (বালা) দুইটি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক্তারবাবু (আমার বাবা) যেন তাহাকে ডাকিয়া একটু শাসন করিয়া দেন। বাবা হকৃরুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি হকৃরুকে আগে দেখি নাই। তাহার চেহারা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গেলাম। তালগাছের মত লম্বা, কালো আর ষণ্ডা। শালপ্রাংশু মহাভুজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিরজুর মার ছেলে! অবাক হইয়া গেলাম।

বাবা তাহাকে ধমকাইতে লাগিলেন।

"তুমি বিরজুর মাকে মেরে তার মেঠিয়া নিয়ে গেছ কেন?"

হকৃরু প্রথমেই নিজের নাক কান মলিয়া ফেলিল।

"ভগবান জানে হুজুর আমি ওর মেঠিয়া কেড়ে নিই নি। ওই আমাকে বলেছিল গরু কেনবার সময় দেবে। কাল পোখমন সিংয়ের বাচ্ছাটা কিনলাম, ও মেঠিয়া দেবে বলেছিল বলেই দর করেছিলাম, কিন্তু কেনবার সময় যখন চাইতে গেলাম তখন বললে, আমি মেঘুকে দিয়ে দিয়েছি। আমি তখন বাক্স খুলে দেখলাম, দেখি, রয়েছে মেঠিয়া। আমাকে মিছে কথা বলছে। তখন আমি নিয়ে গেলাম। তখন আর না নিয়ে করি কি? পোখমন সিংয়ের সঙ্গে কথা তখন পাকা হয়ে গেছে।"

বিরজুর মা কাছেই চোখে কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল, "ও আজকাল আমাকে মোটেই মানে না। ওর বৌয়ের কথায় চলে, আমার কথা একেবারেই শোনে না।"

বাবা ধমকাইয়া উঠিলেন।

"এ কি কথা! মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া! যাও, এক্ষুণি পায়ে ধরে মাপ চাও।"

হকৃরু বাবার কথা অমান্য করিল না। তাহার লম্বা দেহ নত করিয়া

বিরজুর মায়ের পায়ে হাত দিয়ে গেল। বিরজুর মা বোধ হয় ইহাই চাহিতেছিল। কারণ সে যখন মুখ হইতে কাপড় সরাইল, দেখা গেল তাহার মুখ হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

"হয়েছে হয়েছে, আর পা ধরতে হবে না। বাবু যা বললে তা মনে রেখো।"

মনে হইল তাহার হাসির সঙ্গে যেন গর্বও মিশিয়াছে।

হকৃরু চলিয়া গেল। বিরজুর মা আড়ঘোমটা টানিয়া বাবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মেঠিয়া আমি ওকেই দিতাম। কিন্তু ও আমার কথা শোনে না কেন। দেখলাম, আমাকে লুকিয়ে বউকে একখানা রঙীন শাড়ি কিনে দিয়েছে। এর মানে কি?"

বাবা ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সংক্ষেপে বলিলেন, "না, আর ওসব করবে না।"

বিরজুর মা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। মায়ের কাছে বসিয়া ভোমরার মতো গুনগুন করিতে করিতে হকৃরুর বউয়ের নিন্দা করিতে লাগিল। বউটা নাকি অত্যন্ত পাজি। প্রায়ই লুকাইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যায়। হকৃরু কাজকর্ম ছাড়িয়া তাহার পিছু পিছু ছোটে। আর জিনিসপত্র ভাঙে কত! শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে? মাসে দুই তিনটা করিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া ফেলে। কাপড়ে প্রায়ই খোঁচ দেয়। মাথাটা যেন কাকের বাসা। তেল দেয় না। উহার বাবা নিমু গোয়ালাও নাকি ওই রকম লক্ষ্মীছাড়া ছিল। তাড়ি খাইয়া দিন রাত পড়িয়া থাকিত। বিরজুর মা ওই মেয়ের সঙ্গে হকৃরুর বিবাহ দিতে চাহে নাই। কিন্তু হকৃরু না-ছোড়। মেয়েটার রং ফর্সা কিনা, আর যখন তখন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে।

অনেকদিন পরে কথাটা আমার মনে হইয়াছিল। তখন আমার বয়স একটু বাড়িয়াছে।

বিরজুর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আচ্ছা, সবাই তোমাকে বিরজুর মা বলে, কিন্তু তোমার ছেলে বিরজুকে তো একদিনও দেখি নি। সে কোথা?"

'সে মরে গেছে খোকাবাবু! যে বছর বাঁধে 'হায়জা' (কলেরা) হয়েছিল, সেই বছর আমার বিরজু চলে গেল। কি ভালো ছেলে যে ছিল!"

বিরজুর মায়ের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের উদ্গত অশ্রু মুছিয়া বলিল, "সবই উপর-ওলার মর্জি খোকাবাবু!"

বিরজুর মা বেহারী, তাহার সহিত হিন্দীতেই কথাবার্তা হইত। কিন্তু সে যে আমাদের পর, একথা কখনও মনে হয় নাই। তাহাকে নিজের লোক বলিয়াই জানিতাম। আমার জন্ত সর, চাঁছি, মিঠাই, পেয়ারা, কত কি যে লইয়া আসিত!

মাকে বলিত, 'এও আমার আর এক ব্যাটা—"

পূজার সময় প্রতিবারই আমার জন্ত একটা রঙীন 'কুর্তা' (জামা) কিনিয়া আনিত। আমাকে সেটা নিজে হাতে পরাইয়া ঠাকুর দেখাইয়া আনিত। দেখিতাম, একপাল ছেলে-মেয়ে তাহার পিছু পিছু ঘুরিতেছে। সব বিরজুর মার ছেলে-মেয়ে। মেলায় সে সকলকেই কিছু না কিছু কিনিয়া দিত। আমাকেও কতবার মাটির পুতুল কিনিয়া দিয়াছে। কোন বার গণেশ, কোন বার মহাদেব, কোন বার বা শ্রীকৃষ্ণ।

বিরজুর মার সম্বন্ধে আর একটা স্মৃতিও মনের মধ্যে জাগিয়া আছে।

তখন আমার বয়স বোধ হয় বছর দশেক। কাঁসিয়াতলায় আমাদের কিছু জমি ছিল। রোজই শুনিতাম সেখানে নাকি খুব ভালো মটর হইয়াছে। সাধ হইল, মাঠে বসিয়া গাছ হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া মটরশুঁটি খাইব। জানিতাম, বাবাকে কিংবা মাকে বলিলে তাঁহারা রাজী হইবেন না। তাই এক রবিবার দুপুরে বাবা মা ঘুমাইবার পর একা বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহির তো হইয়া পড়িলাম, কিন্তু কাঁসিয়াতলা কোন্ দিকে? রাস্তা জানা ছিল না। গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিলাম। চারিদিক সবুজে সবুজ। শীতের রোদে চারিদিক ঝলমল করিতেছে। দুপুর বেলা, মাঠে বিশেষ কোনও লোক নাই, অনেক দূরে টঙের উপর একটা পাহারাদার বসিয়া আছে। এমন একটা লোক পাইলাম না, যে আমাকে বলিয়া দেয় কাঁসিয়াতলা যাইবার রাস্তা কোন্‌টা? আলের উপর দিয়া চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা সরু পায়ে-চলা পথ পাইয়া গেলাম। দুইদিকে সবুজ, মাঝখানে একটা সরু ফিতার মত পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম মনে নাই। চলিয়াছি তো চলিয়াছি। খানিকক্ষণ পরে থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। দেখিলাম, প্রকাণ্ড একটা সবুজ বোঝা

আমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বোঝার নীচে পা দুইটাও দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর দেখিলাম, পিছনে পিছনে একটি ছোট ছেলেও আসিতেছে।

আমার কাছাকাছি আসিয়াই বোঝাটা থামিয়া গেল। বোঝার ভিতর হইতে বিরজুর মা কথা কহিয়া উঠিল।

"এ কি খোকাবাবু! তুই এখানে?"

"আমি ফাঁসিয়াতলা যাব। রাস্তা কোন্‌দিকে বলে দে তো।"

"আমি তো ফাঁসিয়াতলা থেকেই আসছি। সেখানে আমারও এক টুকরো জমি আছে। তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন এই রোদে?"

"মটরশুঁটি খাব।"

"তার জন্যে অত দূরে যাবার দরকার কি? আমার বোঝাতেই তো মটরশুঁটি আছে। চল্, ওই গাছতলায় বসবি চল্। এখানে বড় রোদ।"

দূরে একটা বটগাছ ছিল। বিরজুর মা সেইখানে আমাকে লইয়া গেল। গাছের তলায় বোঝাটা ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল। তাহার পর সেই ছেলেটাকে বলিল, "মটরশুঁটি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দে খোকাবাবুকে।"

সেদিন সেই দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠের মাঝখানে বসিয়া বিরজুর মায়ের দেওয়া প্রচুর মটরশুঁটি খাইয়াছিলাম। এ স্মৃতিটি মনে সঞ্চিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে বিরজুর মা বলিল, "আর খেতে হবে না। বেশী খেলে পেট ব্যথা করবে। মাইজি তখন বকবে আমাকে।"

"মাকে তুই যেন বলে দিস্ না।"

"দেব না? আমাকে কি দিবি বল্!"

"আমি আবার কি দেব!"

"একঠো চুম্মা দে!"

হঠাৎ বুড়ি বিরজুর মা আমার গলা জড়াইয়া আমাকে চুম্বন করিল।

"তুই বাড়ি ফিরে যেতে পারবি তো?"

"তোর সঙ্গে যাব।"

"আমি এখন বাড়ি যাব না। আমাকে এখন বাজারে যেতে হবে। এগুলো বেচব না? আচ্ছা দাঁড়া, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

সেই ছোট ছেলেটাকে বলিল, "এই ওদিককার ক্ষেতে রেশমি ঘাস কাটছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।"

ছেলেটা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রেশমি কে?"

"আমার বেটি।"

একটু পরে রেশমি আসিল। ফর্সা লম্বা একটা মেয়ে। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়।

"খোকাবাবুকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আয়।"

"চল—"

রেশমির সহিত বাড়ি ফিরিলাম।

বছর দশেক পরে বিরজুর মার যেদিন মৃত্যু হইল তখন আমাদের কলেজের ছুটি ছিল। আমি বাড়িতেই ছিলাম। দেখিলাম, বিরজুর মার শবের পিছনে গ্রামসুদ্ধ লোক চলিয়াছে। সব বয়সের লোক। একপাল ছেলে-মেয়ে। সকলে আকুলভাবে কাঁদিতেছে।

সেইদিনই সত্যটা জানিতে পারিলাম। বিরজুর মায়ের বিবাহ হয় নাই। সে চিরকুমারী ছিল। বিরজুর বাবার সহিত তাহার বিবাহের সব ঠিক হইয়া শেষে বিবাহ ভাঙিয়া যায়। বিরজুর বাবার অন্যত্র বিবাহ হয়। তাহারই প্রথম সন্তান বিরজু। বিরজুর মা আর বিবাহ করিতে চাহে নাই। বিরজুর বাবা বিরজুকে তাহারই কোলে তুলিয়া দিয়াছিল। তাই তাহার নাম বিরজুর মা। তাহার আসল নামটা সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহার আসল নাম ছিল সোহাগ।

পালানো যায় না

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি যেন রুদ্ধ-শ্বাসে প্রলয়ের প্রতীক্ষা করছে। শাখা-প্রশাখাময় একটা বিদ্যুৎ আকাশকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেবার পরই প্রচণ্ড শব্দ করে বজ্রপাত হল। তারপর আবার সব চুপচাপ। তারপরই সোঁ সোঁ শব্দ করে ঝড় এল। কামান-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল যেন। সোনাটুপি গ্রামের প্রান্তে যে অরণ্যটা আছে তার গাছগুলো হাহাকার করতে লাগল। অরণ্যের পাশেই প্রকাণ্ড প্রান্তর। দুটো শেয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কাক বক উড়তে লাগল বিভ্রান্ত

হয়ে। তারপর বৃষ্টি নামল। বেশ মুষল-ধারে। ঝড়-বৃষ্টি দুটোই সমানে চলতে লাগল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এল ক্রমশ। গাছের ডালপালা ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাঠে। মনে হল মৃত সৈনিকের দল আছড়ে আছড়ে পড়ছে যেন। ঝড়-বৃষ্টি আর অরণ্য মিলে শব্দেরও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল একটা। কখনও মনে হচ্ছিল কেউ যেন অট্টহাস্য করছে, পরক্ষণেই মনে হচ্ছিল কাঁদছে। আর্তনাদের সঙ্গে খিকখিক হাসি, হাসির সঙ্গে হাততালি, হাততালির সঙ্গে ডম্বরু নিনাদ যে পরিবেশ সৃষ্টি করল তা আতঙ্কজনক। এতক্ষণ কোনও মানুষ দেখা যায়নি। কিন্তু এইবার দেখা গেল। বনোয়ারি বেরুল জঙ্গল থেকে। ছুটে বেরুল। যেন পালাচ্ছে। অদ্ভুত তার চেহারা। মুখময় গোঁফ-দাঁড়ি। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। কাঁধে প্রকাণ্ড বোঁচকা। হাতে ব্যাগ। ফুল প্যান্টের উপর লম্বা ঝোলা কোট পরেছে একটা, পায়ে বুট জুতো। মাঠের মধ্যে পড়ে সে ছুটতে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছু ফিরে চাইতে লাগল। তার পিছনে কেউ ছুটছিল না, কিন্তু বনোয়ারির ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, তার যেন আশঙ্কা হচ্ছে কেউ তাড়া করে আসছে তাকে পিছু পিছু। মাঠের অপরপ্রান্তে ঘর ছিল একটা। পোড়ো বাড়ি। বনোয়ারি সেইদিকে দৌড়োতে লাগল।

…পোড়ো-বাড়িটা নীলকুঠি ছিল এককালে। এখন ওটা স্থানীয় জমিদারের সম্পত্তি। জমিদার কলিকাতায় থাকেন সুতরাং বাড়িটা পোড়ো-বাড়িই হয়ে গেছে। কিন্তু সেকালের বাড়ি, রেকতার গাঁথুনি, একেবারে পড়ে যায়নি। দেওয়ালগুলো খাড়া আছে। কপাট-জানালাগুলোও আছে। পশ্চিমদিকের ঘরের কপাট-জানালা চোরে খুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তর-দিকের ঘরটা, দক্ষিণদিকের ঘরটা আর পূর্বদিকের ঘরটা ঠিক আছে। পূর্বদিকের ঘরটাই বড়। 'হলে'র মতো তার সামনে একটা চওড়া বারান্দা। বারান্দার উত্তরে আর দক্ষিণে ঘর।

বনোয়ারি ছুটতে ছুটতে এসে পূর্বদিকের ঘরের সামনে চওড়া বারান্দাতে উঠে হাঁপাতে লাগল। আর একবার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল, তারপর ঢুকে পড়ল পূর্বদিকের বড় ঘরটাতে। ঢুকেই ঘরের কপাট বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝড়-বৃষ্টির তুমুল গর্জন হচ্ছিল, কিন্তু বনোয়ারি তা শুনছিল না, সে শোনবার চেষ্টা করছিল, কারও পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। গত সাত দিন ধরে সে ওই

পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। সোনাটুপির জঙ্গলে ঢোকবার পর আর সে শব্দটা শুনতে পায়নি। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়েই সে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ শুনেছিল। নির্ঘাত শুনেছিল, তার ভুল হয়নি কিন্তু একবার মাত্রই শুনেছিল, আর শোনেনি। সে আশা করবার চেষ্টা করছিল, তবে কি হাড়গিলা তাকে রেহাই দিলে ?

খুট খুট করে শব্দ হল বারান্দায়। চমকে উঠে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইলো বনোয়ারি, তার শরীরের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঝড়-জলের দাপাদাপি, আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ কান পেতে রইল বনোয়ারি ছর্‌ছর্‌ করে জল পড়ছে বারান্দায়, আর কোন শব্দ নেই। ছাগলের ডাকের মতো ওটা কি শোনা যাচ্ছে ? এই ঝড়-বৃষ্টিতে কারো ছাগল মাঠে বেরিয়ে পড়েছে নাকি ! কিন্তু একটা ছাগল তো নয়। অনেক ছাগলের ডাক। তারপর বনোয়ারি বুঝতে পারল ব্যাং ডাকছে ! আরও মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর তার মনে হল সমস্ত রাত তো কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।

ভিতরে ঢুকে সে পিঠের বোঁচকা আর ব্যাগটা নামিয়ে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল কপাটটা আর ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দও হল একটা বাইরে। বনোয়ারি দৌড়ে গিয়ে কপাটটা বন্ধ করে দিলে আবার। আবার কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাড়গিলার চেহারাটা স্পষ্ট ফুটে উঠল তার মনে। ওর আসল নাম দন্‌দন্‌। ভাল নাম ছিল দনুজারি। কিন্তু তার চেহারার জন্য সবাই ওকে হাড়গিলা বলে ডাকত। হাড়গিলার মতোই দেখতে। লম্বা লিকলিকে, কোমরের উপর থেকে মাথা পর্যন্ত এক সরলরেখায় নয়। দুবার বেঁকেছে। কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত একটা বাঁক, হঠাৎ মনে হয় কুঁজো (এই বাঁকটার উপরই ছুরি মেরেছিল বনোয়ারি), আর দ্বিতীয় বাঁকটা ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু এ বাঁকটা উল্টো রকম। লম্বা ঘাড়টা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে আর গলার দিকটা বেরিয়ে পড়েছে সমানের দিকে। মনে হয় কেউ যেন ওর ঘাড়ে লাথি মেরে সামনের দিকে বাঁকিয়ে দিয়েছে গলাটা। গলাটা অসম্ভব লম্বাও। সাঁকিটাও বেশ উঁচু। খাঁড়ার মতো নাকের সঙ্গে সেটা যেন পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে। গায়ের রং ফরসা, ঠিক ফরসা নয়, হলদে। কপাল উঁচু, চোখ দুটো কটা, মনে হয় যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ভুরু নেই। চোখে মুখে কেমন

যেন একটা বকের ভাব। এরকম লোক যে কি করে ঝুমকোর মতো মেয়েটাকে পটাতে পেরেছিল, তা বনোয়ারি বুঝতে পারেনি। হাড়গিলা অবশ্য ঝুমকোর প্রেমে পড়েনি, ঝুমকোর সঙ্গে ভাব করেছিল তার গয়না আর গিনিগুলো হাতাবার জন্যে, কিন্তু ঝুমকো তো পড়েছিল। তা না পড়লে ভিতরের অত খবর কি হাড়গিলা জানতে পারত? সে কোন্ বাক্সে গিনিগুলো রাখত, আলমারির কোন্খানটায় তার গয়নাগুলো আছে সব কি বলত হাড়গিলাকে? ভাল না বাসলে বলত না। হাড়গিলাই বনোয়ারিকে নিয়ে গিয়েছিল ঝুমকোর কাছে। একা তো অতবড় জোয়ান মেয়েকে খুন করা যায় না, একজন সহকারী চাই। আর হাড়গিলা ছোরাছুরি বা গোলাগুলির পক্ষপাতি ছিল না। সে বলত ও সব বড় গোলমেলে জিনিস, ধরা পড়ে যাবার ভয় থাকে। তার চেয়ে টুঁটি টিপে শেষ করে দেওয়াই নিরাপদ। বনোয়ারি জাপটে ধরেছিল ঝুমকোকে আর হাড়গিলা টুঁটি টিপেছিল ··বনোয়ারির চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। বারান্দায় কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে খট্ করে একটা শব্দ হল···ঠিক এমনি শব্দ ঝুমকোর গলা থেকেও বেরিয়েছিল!

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বনোয়ারি। তারপর হঠাৎ তার মনে পড়ল তার পকেটে টর্চ আছে। তার ঝোলার মধ্যে লণ্ঠনও আছে একটা। টর্চটা ভিতরের পকেটে ছিল। খুব বেশী ভেজেনি। জ্বালা গেল। জ্বেলেই নিশ্চিন্ত হল বনোয়ারি। কপাটে খিল ছিটকিনি দুইই আছে। তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিল দুটোই। তারপর ঝোলাটার ভিতর থেকে লণ্ঠন বার করল। আলাদা একটা বোতলে কেরোসিন তেলও ছিল। গত পনেরো দিন থেকে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, কত অজানা জায়গায় রাত কাটাতে হয়েছে, আরও কত রাত কাটাতে হবে তার ঠিক নেই, তাই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি, বিশেষ করে লণ্ঠন আর কেরোসিন তেল, টর্চ দেশলাই আর মোমবাতি সে সংগ্রহ করে রেখেছে। কপাট বন্ধ করে সে লণ্ঠন, তেলের শিশি বার করলে, টর্চের আলো জ্বেলে। দেশলাইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরী হল। নানাবিধ কাপড়-জামার জটিলতায় হারিয়ে গিয়েছিল। সব বার করে ফেললে সে বোঁচকাটা থেকে। অনেক রকম কাপড় জামা ছিল। প্যাণ্ট, হ্যাফ-প্যাণ্ট, ঝোলা-পাজামা, ধুতি, শার্ট, কোট, হাওয়াই-শার্ট হরেক রকমের, রঙীন চশমা দু'তিন জোড়া। বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজে গিয়েছিল। বনোয়ারি ক্রমাগত পোষাক বদলে বদলে বেড়াচ্ছিল। তবে তার ধারণা পুলিশ তো বটেই হাড়গিলার প্রেতাত্মাও পোশাক বদল

করলে বোধহয় তাকে চিনতে পারবে না। যদিও সে বারবার নিজের সঙ্গে তর্ক করছিল যে ভূতটুত সব কুসংস্কার, মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না, কিন্তু তবু সে সাবধানতা অবলম্বন করতে ছাড়েনি। তার্কিক বনোয়ারির পিছনে বসে আর একজন কানে কানে বলছিল—সাবধানের বিনাশ নেই। তুমি একটা শব্দ যখন শুনেছ, তা যাই হোক, সাবধান হও। বনোয়ারি ক্রমাগত পালাচ্ছিল আর পোশাক বদলাচ্ছিল। কখনও সাহেবী পোশাক, কখনও পেশোয়ারী, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মিলিটারি। চোখে কখনও গগলস, কখনও সাদা চশমা, কখনও নীল ভিজে কাপড়-জামার মধ্যে দেশলাইটা পাওয়া গেল অবশেষে। একদম ভিজে গেছে। টর্চের আলোতেই তাড়াতাড়ি লণ্ঠনে তেল ভরে ফেলল সে। টর্চের আলোটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। টর্চটা নিবিয়ে রেখে দিল। একটু আলোর সম্বল রাখা ভাল। দেশলাইটা জ্বলবে কি? বড্ড ভিজে গেছে। তবু সে চেষ্টা করতে ছাড়ল না। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। একটা কাঠিও জ্বলল না। আবার শুরু করল সে। খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্ খচ্, অন্ধকারে শব্দটা অদ্ভুত শোনাতে লাগল, কেউ যেন হাঁচছে। হাঁচছে? না হাসছে? পাগলের মতো কাঠির পর কাঠি ঘষতে লাগল বনোয়ারি। একটাও জ্বলল না। সব কাঠি ফুরিয়ে গেল। টর্চটা জ্বেলে ছড়ানো কাঠিগুলোর দিকে সভয়ে চেয়ে রইল সে। টর্চের আলোটাও বেশ লাল হয়ে গেছে। আর বেশীক্ষণ টিকবে না। আবার নিবিয়ে দিলে টর্চটা।

চতুর্দিক কাঁপিয়ে বজ্র পড়ল একটা। মনে হল এই বাড়িতেই পড়ল। থর থর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। বনোয়ারির মনে হল সমস্ত রাত অন্ধকারে কি করে কাটাব এখানে? আলোটা যদি জ্বালাতে পারতুম! আলো থাকলে কারো পরোয়া করতাম না। হঠাৎ ডান দিকে খিক্ খিক্ খিক্ করে শব্দ হল। তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল বনোয়ারি। ঠিক যেন ব্যঙ্গ করে সে হাসল। যে দিক থেকে হাসিটা এল টর্চটা জ্বেলে সেই দিকে দেখল চেয়ে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এইবার দেখতে পেল একটা খোলা জানলা রয়েছে, ওদিকের দেওয়ালে। এগিয়ে গেল সে-দিকে। টর্চ ফেলে দেখল বাইরের বারান্দায় দু'তিনটে শেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরাই খ্যাক খ্যাক শব্দ করছে সম্ভবত। ফিরে এল আবার। টর্চটা নিবিয়ে দিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর গোঁফ-দাড়িগুলো খুলে ফেললে। জলে ভিজে পরচুলাগুলো থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছিল একটা। তারপর ব্যাগের ভিতর হাত পুরে একটা পাউরুটি বার

করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। খুব খিদে পেয়েছিল। ভাগ্যিস পাঁউরুটিটা সঙ্গে এনেছিল! খেতে খেতে নিজের মনেই নিজের সঙ্গেই কথা শুরু করে দিল! নিজের কণ্ঠস্বরই যেন সঙ্গী হল তার সেই নির্জন অন্ধকার ঘরে। "হাড়গিলে এ তুই কি করলি বল তো? তোর সঙ্গে কথা ছিল তুই আধা-আধি বখরা দিবি আমাকে। ছিল না? কিন্তু মাত্র কুড়িটি টাকা দিয়ে আমাকে তুই বিদেয় করে দিলি কোন্ আক্কেলে? আমি কি কুলী? আমি সাপটে না ধরলে তুই ওর গলা টিপতে পারতিস? আর আমাকেই কলা দেখালি। কেমন মজাটি টের পাইয়ে দিলুম। ছুরির একটা ঘায়ে তো কাৎ হয়ে পড়লি। আমার সঙ্গে চালাকি! গয়না গিনি সব পুঁতে রেখে এসেছি। পুলিশ ঘুণাক্ষরে জানতে পারবে না। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাব আবার।"

বাইরে আবার ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল, তার সঙ্গে সেই খিক্ খিক্ হাসি।

"আঃ, শেয়ালগুলো জ্বালালে তো! হাড়গিলে, তুই ভাবছিস আমি ভূতের ভয়ে কাঁপছি? মোটেই না। তুই শেষ হয়ে গেছিস। তোকে আর ভয় নেই। লণ্ঠনটা জ্বালাতে পারলে কারো পরোয়া করতাম না। অন্ধকারে বসেই গাটা ছমছম করছে—"

টক্ করে একটা শব্দ হল।

মেঝেতে কি যেন পড়ল একটা উপর থেকে।

টর্চটা মুঠোয় চেপে ধরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বনোয়ারি। তারপর জ্বালল টর্চটা। যা দেখল তাতে তার মুখটা 'হাঁ' হয়ে গেল একটু। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়বার মতন হল। মেঝের মাঝখানে একটা দেশলাইয়ের বাক্স পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তুলে নিলে সেটাকে। শুকনো খট্‌খটে নতুন দেশলাই একবাক্স, দু'দিকের কাগজ পর্যন্ত ঠিক আছে। কোত্থেকে এল এটা? কে দিলে? টর্চটা ছাতের উপর ফেলে দেখবার চেষ্টা করল একটু। কিচ্ছু দেখা গেল না। খিক্ খিক্ হাসিটা আবার শোনা গেল বাইরে। আর সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা নিভে গেল। তার ব্যাটারি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনোয়ারি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে তুলে নিলে দেশলাইটা। প্রথম কাঠিটাই জ্বলে উঠল।

...লণ্ঠনটা জ্বেলে বেশ করে গুছিয়ে বসেছিল বনোয়ারি। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধ্বনি, আকাশের গুরু গুরু শব্দ আর ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল। আর তার মধ্যে মাঝে মাঝে সেই ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ শব্দ আর খিক্ খিক্

হাসি। এইটেই শুনেছিল বনোয়ারি একাগ্র হয়ে। শেয়ালগুলো ও রকম করছে? তাই নিশ্চয়। এই বিশ্বাসেই অনড় হয়ে বসেছিল সে। কিন্তু একটু পরেই এই বিশ্বাস আর টিঁকল না। খিক্ খিক্ শব্দটা কানের খুব কাছে শোনা গেল। নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন গালে লাগল। আমার মনে হতে লাগল ঘরের ভিতরই যেন কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"চোপরাও, খবরদার—"

টপ্ করে ব্যাগ থেকে ছোরাটা বার করে চীৎকার করে উঠল বনোয়ারি। শব্দটা থেমে গেল। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত করে বসে রইল সে। অনেকক্ষণ কোন শব্দ হল না। তারপর হঠাৎ সে দেখতে পেল ঘরের কোণে ছায়ামূর্তির মতো কি যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা। ঠিক যেন হাড়গিল্লার ছায়া পড়েছে। বোঁ করে ছোরাটা সেই দিকে ছুঁড়ে দিলে সে। ছায়াটা সট্ করে যেন উপরের দিকে মিলিয়ে গেল, আর ছোরাটা গেঁথে গেল দেওয়ালে। বনোয়ারি উঠে গেল দেওয়াল থেকে ছোরাটা খুলে নেবার জন্যে। কিন্তু পারলে না। ছোরাটা দেওয়ালে এমন গেঁথে বসে গিয়েছিল যে খোলা গেল না। টানাটানি ধ্বস্তা-ধ্বস্তির চরম করল বনোয়ারি, কিন্তু কিছুতেই তুলে নিতে পারলে না ছোরাটা। মনে হল ভিতর থেকে ছোরাটাকে কে যেন শক্ত করে ধরে রেখেছে। ছোরাটা ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল বনোয়ারি। ছোরার বাঁটটা কাঁপতে লাগল, বনোয়ারির মনে হল যেন বলছে—না, না, পারবে না। ছেড়ে দাও। ঠিক এই সময়ে খিক্ খিক্ হাসিটা আমার কানের পাশে শুনতে পেল সে। লাফিয়ে সরে গেল একধারে। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ছোরাটার দিকে। আর একবার চেষ্টা করল, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে টানতে লাগল। টানতে টানতে হঠাৎ হাত ফসকে গেল তার, দড়াম্ করে নিজেই পড়ে গেল মেঝের উপর। ছোরার বাঁটটা দুলে দুলে বলতে লাগল—না, না, না, না। আর সঙ্গে সঙ্গে খিক্ খিক্ হাসি। মেঝে থেকে উঠে কপাট খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল বনোয়ারি বাইরে। দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকে তার কাপড়-চোপড় উড়িয়ে দিলে ঘরের মেঝের চারিদিকে। লণ্ঠনের শিখাটা কাঁপতে লাগল, কিন্তু নিবল না। তার আগেই বনোয়ারি ঘরে এসে ঢুকল প্রকাণ্ড লম্বা একটা গাছের ডাল টানতে টানতে।

"পিটিয়ে লম্বা করে দেবো হারামজাদাকে—" উচ্চকণ্ঠে এই স্বগতোক্তি করে কপাটটা আবার ভাল করে বন্ধ করে দিল সে। তারপর লম্বা ডালটা

রাখল একধারে। কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে বোঁচকায় পুরে ফেলল। তারপর ঘরের মাঝখানে গুম্ হয়ে বসে রইল ভ্রূকুঞ্চিত করে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্রমশ ঘুম পেতে লাগল তার। ঢুলতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল একবার। মনে হল ঘরের আর একটা কোণে ফিস্-ফিস্ করে কথা কইছে যেন কারা। লম্বা ডালটা তুলে তেড়ে গেল সে দিকে। কেউ নেই। তারপর তার মনে হল সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে তার মাথা বেঠিক হয়ে গেছে বোধহয়। তাই ও-সব আজগুবি জিনিস দেখছে আর শুনছে। একটু ঘুমুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত? হুঃ যত সব বাজে কথা। বোঁচকাটা মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝের উপর। চোখ বুঁজে রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু ঘুম এল না। তবু চোখ বুঁজে রইল। তারপর একটা অদ্ভুত ছোট্ট শব্দ হল। চু-চু-চু। বনোয়ারি চোখ খুলে দেখলে ছাতের উপর থেকে কালো মতন কি একটা ঝুলছে। ঝুল না কি? পুরোনো বাড়িতে ঝুল থাকা অসম্ভব নয়। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে দিকে। মনে হতে লাগল ক্রমশ সেটা বড় হচ্ছে। নীচের দিকে লম্বা হচ্ছে। সাপ নয়-তো? বনোয়ারি উঠে সেই লম্বা ডালটা তুলে সেটার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ডালটা খুব লম্বা, নাগাল অনায়াসেই পাওয়া যেত। কিন্তু ওটা ক্রমশ সরে সরে যেতে লাগল। আর ক্রমশ লম্বা হয়ে নামতে লাগল মেঝের দিকে। বনোয়ারি শেষে পাগলের মতো ঘোরাতে লাগল ডালটা। তারপর অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড হল। হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে জাপটে ধরল তাকে। নরম দুটো হাত, ঠিক যেন মেয়েমানুষের হাত, পিঠের উপর স্তনের স্পর্শও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না কিচ্ছু। বনোয়ারির হাতে থেকে ডালটা পড়ে গেল। আর ছাত থেকে সেই কালো বস্তুটা নামতে লাগল ক্রমশ। বনোয়ারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল সে দিকে। দেখতে দেখতে সেটা তার চোখের সামনে নেমে এল। বনোয়ারি দেখলে সেটা ঝুল নয়, সাপও নয়, আঙুল একটা। বিরাট মোটা রোমশ আঙুল, প্রকাণ্ড নখ রয়েছে তাতে। আঙুলটা মেঝের কাছে আসতেই চড়াৎ করে শব্দ হল একটা, মেঝেটা ফেটে গেল। সেই ফাটলের ভিতর থেকে বেরুল হাড়গিলার মুণ্ডটা।

"কে? বনোয়ারি, এস, এস, ভয় পাচ্ছ কেন? ঝুমকো এবার ছেড়ে দাও ওকে। ও আসবে এবার। ঝুমকো আমার গলাটাকে কামড়ে ছ্যাত্-রাখ্যাত্রা করে দিয়েছে একেবারে! দেখতে পাচ্ছ?"

বনোয়ারি দেখতে পেয়েছিল। হাড়গিলার গলার সাঁকিটা নেই তার জায়গায় আছে একটা গর্ত। গর্তের ভিতর দিয়ে মেরুদণ্ডের হাড় দেখা যাচ্ছে।

"ঝুমকো ছেড়ে দাও ওকে। ও এইবার আসবে। বন্ধু এস—" অদৃশ্য হাতের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। অদৃশ্য এবার দৃশ্যও হল। বনোয়ারি ঘাড় ফিরিয়ে এবার দেখতে গেল ঝুমকো দাঁড়িয়ে আছে। তার ঘাড়টা ওদিকে বেঁকে গেছে, জিবটা বেরিয়ে ঝুলছে, মুখময় ফেনা, চুলগুলো এলোমেলো। তারপর বনোয়ারি অনুভব করল হাড়গিলা তার হাত ধরে টানছে আর ঝুমকো ঠেলছে তাকে পিছন থেকে। বনোয়ারি গর্তে ঢুকে পড়ল।

ফেরারি আসামি বনোয়ারির মৃতদেহ সাতদিন পরে পুলিস আবিষ্কার করল ওই ঘরের মধ্যে। মৃতদেহটি ঘরের মেঝেতে একটা ফাটলের মধ্যে আটকে ছিল।

নদী

পীতাম্বর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। একই গ্রামে একই পরিবেশে আমাদের বাল্যকাল কেটেছে। আমাদের গ্রামের ঠিক গা ঘেঁসে বইত তরলা নদী। সেই নদীর ধারে পীতাম্বর আর আমি কত খেলা খেলেছি, সেই নদীর জলে কত সাঁতার কেটেছি, কত নৌকা ভাসিয়েছি। সে নদীর কত ছবি আজও মনে আঁকা আছে। তরলাকে বাদ দিয়ে গ্রামের কথা আমরা কখনও ভাবতে পারিনি। তরলা যেন গ্রামেরই একজন ছিল। তার সর্বাগ্রে কত রূপ, তার মৃদু কলধ্বনিতে কত কথা। তাকে বড় ভালবাসতাম। আমার বড় কষ্ট হত গ্রামের লোকেরা যখন তাতে জঞ্জাল ফেলত। গ্রামের সমস্ত জঞ্জাল জড়ো করে ফেলা হত তরলার জলে। যেন ও নদী নয়, নর্দমা। তরলা কিন্তু হাসিমুখে সে জঞ্জালও বইত। যখন জঞ্জাল ফেলা হত তখন তাকে একটু বিব্রত ও বিপন্ন মনে হত বটে, কিন্তু তার পরদিন দেখতাম তরলা আবার হাসছে।

মায়ের কোলে যেমন চিরকাল থাকা যায় না গ্রামের কোলেও তেমনি। গ্রাম ছেড়ে অবশেষে বাইরে যেতে হয়। পাঠশালার পড়া শেষ হতেই আমাকে আর পীতাম্বরকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল। আমি গেলাম

কোলকাতায় আর পীতাম্বর গেল কুচবিহারে। আমি বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশোনা করতে লাগলাম। পীতাম্বরের মামা কুচবিহারে চাকরি করতেন, সে পড়াশোনা করতে লাগল তাঁর বাড়িতে থেকেই। প্রথম প্রথম কিছুদিন দু'জনের মধ্যে পত্রালাপ চলেছিল, কিন্তু তাও ক্রমশ থেমে গেল। পীতাম্বরের সঙ্গে সেই ছেলেবেলা থেকেই আমার ছাড়াছাড়ি। আমি লেখাপড়া করবার জন্য বিদেশেও গিয়েছিলাম। পীতাম্বর কুচবিহারেই তার পড়া শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিল। বেশী দূর পড়াশোনা করতে পারেনি সে। ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডীও পার হতে পারেনি বেচারী। তাই কর্মজীবনেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি, কারণ বাঙালীর কর্মজীবন মানে, চাকরি। নন্-ম্যাট্রিকের চাকরিজীবন উজ্জ্বল হওয়ার কথা নয়। একটা আপিসে দিনকতক কেরানীগিরি করবার সুযোগ অবশ্য পেয়েছিল। কিন্তু যা মাইনে পেত তাতে তার কুলোত না। শেষে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ধরল সে। বিনা মূলধনে এবং বিনা বিদ্যায় যে ব্যবসা স্বচ্ছন্দে চলে সেই ব্যবসা—পুরোহিতগিরি। ব্রাহ্মণের ছেলে, নিষ্ঠারও ভড়ং ছিল, মিষ্টি কথা বলে গৃহিণীদের মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতাও ছিল—তাই এই বারো-মাসে-তের-পার্বনের দেশে তার রোজগার নিতান্ত মন্দ হত না। বিবাহ করেছিল, কিন্তু ভগবানের দয়ায় ছেলেপিলে বেশী হয়নি। একটি মাত্র সন্তান হয়েছিল—মেয়ে। তার নাম দিয়েছিল আদরিণী।

আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাস করে নানা জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কুচবিহারে যখন এলাম তখন পীতাম্বরের সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে তাকে আমি চিনতে পারিনি। সে যে কুচবিহারে আছে একথাও প্রথম প্রথম আমার মনে পড়েনি। আমার সঙ্গে আমার বিধবা বোন থাকত। সে খুব নিষ্ঠাবতী ছিল। যেখানেই যেতাম তার পূজাবার্বন ব্রত প্রভৃতির জন্য পুরোহিত যোগাড় করতে হত আমাকে। কুচবিহারে এসে পুরোহিতের খোঁজ করতেই পীতাম্বরকে পেলাম। আমরই আপিসের একজন ক্লার্ক তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে এল। সত্যিই তাকে চিনতে পারিনি আমি। যে সুকুমার গৌরবর্ণ বালক আমার সহপাঠী ছিল তার চিহ্নমাত্রও ছিল না পীতু পুরুতের মধ্যে। লম্বা, রোগা, একমুখ কাঁচা-পাকা গোঁফদাড়ি, গায়ে আধময়লা নামাবলী, অনামিকায় অষ্টধাতুর আংটি, শরীরের উপরার্ধ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে, মুখে সশঙ্ক হাসি, চোখে উৎসুক দৃষ্টি, মুখের দু'কোণে সাদা সাদা ঘায়ের মতো দাগ—এই চেহারার সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধুর কিছুমাত্র মিল ছিল না। বাল্যকালে আমরা

পরস্পরকে 'তুই' ব'লে সম্বোধন করতাম। পীতু পুরুত একটু ইতস্তত করে হাত কচলে বললে, "আমাকে চিনতে পারছেন স্যার ?"

আমি একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। এ লোককে যে আগে কখনও দেখেছি তা মনে হল না। বললাম, "না তো। আগে কি কোথাও দেখেছি আপনাকে ?"

"সোনাপুর গাঁয়ে আমি আপনার সঙ্গে রামঠাকুরের পাঠশালায়. একসঙ্গে পড়েছিলাম। আমার নাম পীতাম্বর।"

"আরে—!"

সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

দুই

আদরিণী ক্রমশ আমারই বাড়িতে মেয়ে হয়ে গেল! আমি যৌবনেই বিপত্নীক হয়েছিলাম। বাড়িতে আমার ওই বিধবা বোন ছাড়া দ্বিতীয় কোন স্ত্রীলোক ছিল না। দু'চার দিন আসা-যাওয়া করতে করতে আদরিণী অবশেষে সরলার (আমার বোনের) খুব প্রিয় হয়ে পড়ল। সত্যিই ভালবাসার মতো মেয়ে আদরিণী। অমন নম্র মধুর স্বভাব বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল! অর্থাভাবে পীতাম্বর তাকে কলেজে পড়াতে পারেনি। আমি বলেছিলাম, "আমিই ওর পড়াবার সব ভার নিচ্ছি। ওকে কলেজে ভরতি করে দাও " কিন্তু পীতাম্বর এতে রাজী হল না। মনে হল আমার এ প্রস্তাবে তার আত্মসম্মান যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দরিদ্রের আত্মসম্মান বড় তীক্ষ্ণ। সে ম্লান হেসে বললে, "বেশী পড়িয়ে আর কি হবে ভাই। শেষ পর্যন্ত তো বিয়ে দিতেই হবে। সেই চেষ্টাই দেখছি! ও ছেলেবেলা থেকে মন দিয়ে শিবপুজো করেছে। ওর ভালো বর ·জুটবেই। একটি ভালো পাত্রের সন্ধানও পেয়েছি।"

ভালো পাত্রের বাবা ও পিসেমশাই এলেন আদরিণীকে দেখতে। তাঁদের আসা-যাওয়ার খরচ পীতাম্বরকে বহন করতে হল। যদিও তাঁরা দুজনেই কেরানী-শ্রেণীর লোক কিন্তু তাঁদের হাবভাব কথাবার্তা থেকে মনে হল তাঁরা যেন আমীর-ওমরাহ! সাধ্যাতীত খরচ করে পীতাম্বর তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তাঁরা আদরিণীর আপাদমস্তক নানাভাবে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। তারপর মত প্রকাশ ·করলেন—মেয়ে কালো। আমরা উজ্জ্বল

গৌরবর্ণ পাত্রী খুঁজছি। এ পাত্রী চলবে না। আদরিণীর রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়, সে শ্যামাঙ্গিনী। কিন্তু ওর মতো শ্রীমতী মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না। পীতাম্বর হতাশ হল। কিন্তু আবার পাত্র খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয়বার যে পাত্রটি পাওয়া গেল, তাকে সুপাত্র বলা চলে না। আই. এ. পাস করে বাড়িতে বসে আছে। এরা আদরিণীকে পছন্দ করল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ পণ দাবি করল তা পীতাম্বর দিতে পারল না। পীতাম্বর অতি কষ্টে মেয়ের বিয়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা জমিয়ে রেখেছিল এক ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে। এ পাত্র নগদই চাইল পাঁচ হাজার, তাছাড়া অলংকার, বরাভরণ এবং কুড়িজন বরযাত্রী যাওয়া-আসার ভাড়া। সুতরাং এটাও ফসকে গেল। এর পরও ক্রমাগতই ফসকে যেতে লাগল। অধিকাংশ লোকেরই মেয়ে পছন্দ হল না। অনেকের পণের দাবি পীতাম্বরের পক্ষে সাধ্যাতীত হল। অনেক জায়গায় কুষ্ঠি মিলল না। এই শেষোক্ত পর্যায়ে আমার এক বন্ধু সুধীরের ছেলে পড়ে। আমার সহপাঠী ছিল, একসঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েছিলাম। তার ছেলে দীপঙ্কর সত্যিই ভালো ছেলে। খবর পেলাম এম এ. পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমিই আদরিণীর সঙ্গে দীপঙ্করের সম্বন্ধ করে সুধীরকে চিঠি লিখলাম। আশা ছিল সুধীর আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবে না। সুধীর সোজাসুজি অগ্রাহ্য করেওনি। সে মেয়েও দেখতে চাইলে না। লিখলে, 'তুমি যখন মেয়ে দেখে পছন্দ করেছ আমার বলবার কিছু নেই। কিন্তু দীপঙ্কর আমাদের একমাত্র ছেলে .তাই আমার স্ত্রীর বিশেষ ইচ্ছা যে, পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচার করে যেখানে ভালো মিল হবে সেইখানে ছেলের বিয়ে দেবেন।' আদরিণীর কুষ্ঠি পাঠিয়ে দেওয়া হল। সাত দিন পরে এল, মিল হয়নি। বাঙালীদের চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল, যেখানে সোজা-পথে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয় সেখানে বাঁকা-পথ আবিষ্কার করে চক্ষুলজ্জার মর্যাদা রক্ষা করবার মতো বুদ্ধিও তাদের আছে। যাই হোক, আমি ওখানে যতদিন ছিলাম ততদিন আদরিণীর বিয়ের কোন ব্যবস্থা হয়নি। হবে এ আশাও ছিল না। কারণ যে যোগাযোগের ফলে আমাদের সমাজে মেয়ের বিয়ে হয় সে যোগাযোগ ঘটাবার সামর্থ্য পীতাম্বরের ছিল না।

কিছুদিন পরে আমি ওখান থেকে বদলি হয়ে গেলাম।

আমি বগুড়ায় গিয়ে আমার আর এক বন্ধু দ্বিজেনের চিঠি পেলাম। দ্বিজেন সুধীরেরও বন্ধু। দ্বিজেন লিখেছে, 'সুধীর তার ছেলের জন্যে চারিদিকে

মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। মুখে যদিও খোলাখুলি বলছে না, কিন্তু মনে হয় তার আসল লক্ষ্য টাকা। এক জায়গায় শুনলাম খোলাখুলিই নাকি সে নগদ দশ হাজার টাকা চেয়েছিল। মেয়ের বাবা যখন বললেন অত টাকা আমি দিতে পারব না, বড় জোর হাজার ছয়েক দিতে পারি,—সুধীর কি উত্তর দিলে জান? লিখলে আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী হতাম, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে কুষ্ঠির মিল হয়নি।

এ চিঠি পাওয়ার মাস ছয়েক পরে খবর পেলাম সুধীরের ছেলে দীপঙ্কর আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর কিছু দিন পরে সে আমারই কাছে এ. ডি. এম. হয়ে এল ট্রেনিং নেবার জন্য। খুশী হলাম তাকে দেখে।

এসেই সে তার বউ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। কালো ঢ্যাঁটকো লম্বা একটি মেয়ে। শুনলাম জাতে সোনারবেনে, কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো। দীপঙ্করের সহপাঠিনী ছিল। লভ্‌ম্যারেজ। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করে ভালোই লাগল। কথায় কথায় জানতে পারলাম এ বিয়েতে কুষ্ঠিও মেলানো হয়নি, পণ নিয়ে কচলাকচলি করবার সুযোগও পায়নি সুধীর। আর সব-চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সুধীর দীপঙ্করের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধও ছিন্ন করেনি। এই বউকেই বরণ করে নিয়েছে।

তিন

বদলি হয়ে চলে আসবার পর পীতাম্বরের একটি মাত্র চিঠি পেয়েছিলাম। আদরিণীও একটি চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তারপর হঠাৎ তারা থেমে গেল। আমি চিঠি লিখেও আর তাদের কোন উত্তর পেলাম না। নানারকম কাজে ব্যস্ত থাকতে হত আমাকে, আর তাদের খবর নিতে পারিনি। তারপর সাধারণত যা হয়, ক্রমশ তাদের কথা ভুলেই গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা গেল না।

আমি রিটায়ার করে কলকাতায় বসবাস করছিলাম। সময় কাটাবার জন্যে কাজও নিয়েছিলাম একটা। পাঞ্জাবের একজন বড় চামড়া-ব্যবসায়ী জাফর খাঁ তার ব্যবসায়ের ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন আমাকে। আপিসে একদিন বসে আছি, চাপরাসী এসে খবর দিলে—এক 'আউরৎ' আমার সঙ্গে 'মুলাকাত' করতে চান। আমার কামরায় নিয়ে আসতে বললাম। আপাদমস্তক বোরখা ঢাকা এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন। অবাক হয়ে গেলুম যখন সে বোরখার মুখের কাপড়টা তুলে ফেললে।

"আমাকে চিনতে পারছেন কাকাবাবু?"

সত্যিই আমি চিনতে পারিনি।

"আমি আদরিণী –"

"আদরিণী! তোমার এ বেশ!"

"আমি মুসলমানকে বিয়ে করেছি। আপনাদের সমাজে তো ঠাঁই পেলাম না। এরা আমাকে আদর করে নিয়েছে, আদর করে রেখেছে, আমি সুখে আছি। আমার স্বামী আপনার আপিসেই আপনার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার।

"কাদের সাহেব তোমার স্বামী?

"হ্যাঁ—"

নির্বাক হয়ে রইলাম।

একটি ছেলে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল। সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

"এটি আমার ছেলে। আব্বাস এদিকে আয়। নানা। নানাকে আদাব কর—"

আব্বাস এসে আদাব করল। আমি গাল টিপে একটু আদর করলাম। কি করে আদরিণী মুসলমানকে বিয়ে করল, পীতাম্বরের খবর কি, এসব কথা আর জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না।

চার

অনেকদিন পরে সোনাপুর গিয়েছিলাম একবার। গিয়ে দেখলাম তরলা নদী আর গ্রামের পাশ দিয়ে বইছে না। তার জলে জঞ্জাল ফেলে ফেলে গ্রামের লোকেরা তার খাত প্রায় বুজিয়ে দিয়েছে। নদী কিন্তু মরেনি। সে তার গতি পরিবর্তন করে পাশের গাঁয়ের গা ঘেঁসে বইছে। যে নদী সোনাপুরের শোভা ছিল, যে নদী সোনাপুরকে শস্যশ্যামল করে রাখত, সে নদী এখন রহিমগঞ্জের পাশ দিয়ে বইছে, রহিমগঞ্জের শোভা-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করছে।

বীরেন্দ্রনারায়ণ

শীতের রাত্রি। সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলাম। সদ্য বিবাহিতা পত্নী পাশের ঘরে সেতার সাধিতেছিলেন। কাফির গৎটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ রস-ভঙ্গ হইল। নীচে 'কড়াটা নড়িয়া উঠিল এবং একটু পরে ভৃত্য মণিলাল একটি পত্র হস্তে প্রবেশ করিল।

"নবীপুরের জমিদার বাড়ি থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে—"

লেপ ছাড়িয়া উঠিতে হইল। পত্রটি দেখিলাম স্বয়ং জমিদারবাবুই লিখিয়াছেন।

ডাক্তারবাবু,

আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ। আপনি পত্র পাইবামাত্র চলিয়া আসুন। আপনার জন্য নৌকা পাঠাইলাম। ইতি—

বীরেন্দ্রনারায়ণ

পত্রটার অভব্য ভঙ্গীতে আত্মসম্মান ঈষৎ আহত হইল। আমি উঁহার খাতকও নহি, কর্মচারীও নহি। আমাকে এমন আদেশের ভঙ্গীতে চিঠি লেখার অর্থ কি? একটা 'নমস্কারান্তে নিবেদন' বা 'বিনীত বীরেন্দ্রনারায়ণ' লিখিলে ক্ষতি কি ছিল! লোকটা শুনিয়াছি দুর্দান্ত জমিদার। টাকার জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং দিনকে রাত্রি করিয়া নিজের জমিদারির সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে, বাহিরের লোকেদেরও নিস্তার নাই। সকলকে শাসাইয়া চোখ রাঙ্গাইয়া নিজের মহিমা-পতাকাটাকে সদর্পে সমুচ্চ করিয়া রাখাটাই যেন লোকটার একমাত্র লক্ষ্য। আমি মাত্র মাসখানেক আগে এই গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতে আসিয়াছি। গ্রামটি বীরেন্দ্রনারায়ণেরই জমিদারিভুক্ত, কিন্তু তাহার সহিত চাক্ষুস আলাপ এখনও পর্যন্ত হয় নাই। লোকটার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাতে আলাপ করিবার আগ্রহও মনে জাগে নাই।

চিঠিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। 'আমার ছেলেটি বড় অসুস্থ'—এই কথা কয়টিই আমাকে যাইতে বাধ্য করিল।

রাত্রি বারোটার সময় জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম জমিদারের ম্যানেজার জমদগ্নি মিশ্র আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। লোকটার

দুশমনের মত চেহারা। মুখে চাপ চাপ গোঁফদাড়ি, যে অংশটুকু রোমহীন তাহাতে বসন্তের দাগ। নাকটা যেন ছোট একটি উই ঢিপি। "নমস্কার ডাক্তারবাবু। আসুন, বসুন। পথে আশা করি কোনও কষ্ট হয়নি—"

"এখানে বসে আর কি হবে? চলুন একেবারে রোগীর ঘরে যাই।"

"আমিই রোগী। আপনার ফি-টা আগে নিয়ে নিন।"

তিনি একটা টাকার থলি আমার দিকে আগাইয়া দিলেন।

"পাঁচ শ' টাকা আছে ওতে। যদি আরও চান আরও দেব। আমাকে কিন্তু বাঁচাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি—"

"একটা খুনের মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছি। দাঙ্গা হয়েছিল, একটা লোক মারা গেছে। বিপক্ষ দলেরা আমাকে আসামী করেছে। উকীল পরামর্শ দিয়েছেন যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। তাতে লেখা থাকবে, যে তারিখে ওই খুনটা হয়েছে সেই তারিখে আমি কঠিন রোগে আপনার বাসায় আপনার চিকিৎসাধীন ছিলাম—"

বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

জমদগ্নি আমার মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া চাপদাড়িতে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

"ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে গেছে ডাক্তারবাবু। বাঁচান আমাকে দয়া করে।"

"আমাকে মাপ করবেন। আমি ডাক্তার, মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখা আমার পেশা নয়। এমনভাবে এত রাত্রে আমাকে ডেকে এনে খুবই অন্যায় করেছেন আপনারা। যাক, আমি চললাম। নমস্কার—"

আমি গমনোন্মুখ হইয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় জমদগ্নি বলিলেন, "যাবার আগে একটা কথা শুনে যান, নবীপুরে চোখ রাঙাবার অধিকার মাত্র একটি লোকেরই আছে, তিনি জমিদার বীরেন্দ্রনারায়ণ। তিনি যদি বিরূপ হন তাহলে তাঁর জমিদারিতে আপনি বাস করতে পারবেন না।"

"বেশ, বাস করব না। কালই না পারি দু'একদিনের মধ্যেই আমি অন্যত্র চলে যাব। আপনাদের এই ব্যবহারের পর আমারই আর এখানে থাকবার প্রবৃত্তি হবে না। আচ্ছা চলি—"

"শুনুন আর একটা কথা। পাঁচ-শ'র জায়গায় যদি পাঁচ হাজার টাকা দিই, তাহলেও আপনি এই উপকারটি করবেন না?"

"লক্ষ টাকা দিলেও করব না।"

"বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে বলিলাম, "এখানকার বাস উঠল। জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেল। কাল সন্ধ্যার ট্রেনেই চল কোলকাতায় চলে যাই—"

"কেন হঠাৎ?"

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণীও আমার সহিত একমত হইলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে একটা গরুর গাড়িতে আমার জিনিসপত্র বোঝাই করিতেছি এমন সময় ধাববান অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠ সুদর্শন যুবক আসিয়া আমার বাসায় সামনে অশ্বের গতিরোধ করিলেন। অশ্বের ঘর্মাক্ত কলেবর দেখিয়া বুঝিলাম, বেশ দ্রুতবেগেই তাহাকে আসিতে হইয়াছে।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যুবক সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিলেন।

"নমস্কার। আপনিই ডাক্তারবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি বীরেন্দ্রনারায়ণ। আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। এসব কি—"

গরুর গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

'আমার মালপত্র। আমি আজই চলে যাচ্ছি এখান থেকে—"

"পাগল না কি! আপনাকে কিছুতেই আমি যেতে দেব না। আপনার মতো লোকের সঙ্গ লাভ করা একটা সৌভাগ্য! টাকা খরচ করলে মিথ্যে সার্টিফিকেট অনেক পাওয়া যায়—জমদগ্নি সিভিল সার্জনের কাছ থেকেই সার্টিফিকেট এনেছে, কিন্তু আপনার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি আমি। দুপুর রোদে তাই নিজেই ছুটে এলাম। যাওয়া আপনার হবে না প্লীজ—"

বীরেন্দ্রনারায়ণ হাতজোড় করিলেন।

যাওয়া হইল না।

চম্পা মিশির

"জিৎ গিয়া হুজুর।"

সোৎসাহে রমজানের ছেলে সলিল এসে খবরটা দিল। তারপর সেলাম করে চলে গেল।

মনে পড়ল চম্পা মিশিরকে। এখনও আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি, সোজা হয়ে বসে আছেন টমটমের উপর ঘোড়ার রাশ ধরে, আর যার টমটম সে পিছনের দিকে বসে আছে স-সঙ্কোচে। বেশ লম্বা লোক ছিলেন, কিন্তু চওড়া নয়, সরু লিকলিকে চেহারা। অসুস্থ নয় ওই রকমই গড়ন। গোঁফ-ছিল, দাড়ি ছিল না। গোঁফ সরু, ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যেত না। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় বেমালুম মিশে থাকত। গায়ের রঙ কালো ছিল না। গোধূম বর্ণ। গোঁফও তাই। ছোট ছোট চোখের তারাও কটা ছিল। মেরজাই পরতেন, মাথায় থাকত মৈথিলী পাগড়ি, কাপড় আঁট-সাঁট করে পরা, পায়ে দেশী নাগরা জুতো সবর্ণ মুচির তৈরী, অন্য মুচির জুতো পছন্দ হত না তাঁর। তাঁর এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার অনেক আগেই তাঁকে দেখে-ছিলাম আমি। রোজই দেখতাম। বস্তুতঃ না দেখে উপায় ছিল না। আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি। এতেও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণতঃ যার টমটম সে-ই হাঁকায়, আরোহী পাশে বা পিছনে বসে থাকে। আরোহী চম্পা মিশির কিন্তু নিজে টমটম হাঁকাতেন, যার টমটম সে পাশে বা পিছনে বসে থাকত। এ খবরটাও আমি পরে জেনেছি।

যেদিন উনি আমার দোকানের সামনে টমটম থেকে পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেলেন, সেই দিনই ডাক্তার হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। আঘাত সামান্যই, পায়ের গোছটা একটু ছড়ে গিয়েছিল। পায়ে একটু টিঞ্চার আইয়োডিন লাগিয়ে দিলাম। এর পর চম্পা মিশির যা করলেন তাতে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, ওর পায়ের হাড়ে কিছু লাগে নি। উনি লাফিয়ে নেবে গেলেন আমার ল্যাবরেটরির বারান্দা থেকে, সঙ্গের লোকটাকে হুকুম করলেন, ঘোড়াটাকে ধর ভাল করে, মুখটা শক্ত করে ধরে থাক। সে ধরতেই আগা-পাশ-তলা চাবকালেন ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে

পিছু হটছিল বলেই পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেজন্যে শাস্তি দিলেন তাকে। তখনও আমি বুঝতে পারি নি যে, মিশিরজি টমটমের মালিক নন, আরোহী মাত্র। ঘোড়াটাকে পিটিয়ে মিশিরজি আবার আমার ল্যাবরেটরিতে এসে বসলেন এবং ভাঙলেন কথাটা। মৈথিলীমিশ্রিত হিন্দীতেই কথা বলতেন তিনি। আমি ভাবার্থটা অনুবাদ করে দিচ্ছি। বললেন, এমন বোকা এ দেশের লোক ডাক্তারবাবু, পয়সা দিয়ে ওই ঘোড়া কিনেছে। ও যতটা এগোয়, তার চেয়ে পিছোয় বেশী। এ টমটমে কোন্ সোয়ারি চড়বে বলুন? আমাকেই এখন ঠিক করতে হবে, কদ্দিন লাগবে কে জানে?

পরে আরও অনেক ঘটনা থেকে জেনেছি, বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতেই ওঁর আনন্দ। ইংরেজীতে যাকে বলে রঙ হর্স (wrong horse) তাকে ব্যাক করেও উনি আনন্দ পেয়েছেন জীবনে। ওঁর বাড়ি গঙ্গার ওপারে মফস্বলে, অনেক জমি-জায়গা আছে, খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না। কিন্তু শহরে উনি প্রত্যহ আসতেন ষ্টীমারে পেরিয়ে। বাড়ি থেকে ষ্টীমারঘাটে আসতেও প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হত ওঁকে। কিন্তু তাতে আনন্দই পেতেন উনি, বলতেন, এইভাবে হাঁটার ফলে শরীর বেশ ভাল থাকে। ষ্টীমারঘাটে নেবেই একটা টমটম ভাড়া করতেন সমস্ত দিনের জন্য। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে তাকে যে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশীই দিতেন। আর টলটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হত ততদিন সেই টমটমকেই বাহাল করে রাখতেন। এই সব কারণে মিশিরজিকে আরোহীরূপে পাবার জন্য সব টমটমওলাই ব্যগ্র হত। দু-একজন ঠকাতও। অর্থাৎ টমটমের ঘোড়া খারাপ না হলেও তাঁকে আরোহীরূপে পাবার জন্যে মিথ্যে করে বলত যে, তার ঘোড়া খারাপ। কিন্তু মিশিরজির কাছে এসব চালাকি চলত না, ঘোড়ার রাশ থাকত তাঁর হাতে। একদিন আমার ল্যাবরেটরির সামনে টমটম থামিয়ে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু একটা রুগী নিয়ে এসেছি, দেখুন তো শালার যদি কোনও ব্যবস্থা করতে পারেন, আরে, ইধার আ—

টমটমওলা ছোঁড়াটা মুচকি হেসে নেবে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে এর?

মিশিরজি তার মুখের দিকে চিন্তিত মুখে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, শালা ঝুঠ্‌া ছে অর্থাৎ শালা মিথ্যাবাদী। টমটমের ঘোড়া ভাল

কিন্তু খারাপ বলে চালিয়েছে তাঁর কাছে। হেসে বললাম, এর তো কোনও দাবাই নেই আমার কাছে—

চম্পা মিশির তখন ছোঁড়ার একটা কান টেনে বললেন, তা হলে পুরানা দাবাই দিয়ে দি একটু। অমন তেজী ভাল ঘোড়া, বলে কি না খারাপ—

তারপর তাকে একটা সিকি দিয়ে বললেন, দু আনার ছাতু তুই খা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে না।

সিকিটা নিয়ে সানন্দে বেরিয়ে গেল ছোঁড়া, মিশিরজি আমার দিকে চেয়ে বাঁ চোখটা একটু কুঁচকে গেলেন তার পিছু পিছু।

মিশিরজি শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশির ভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা-না-একটা মকদ্দমা থাকত। তাঁর নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই পক্ষের মকদ্দমাব তদ্বির করতেন উনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। একজন ভাল উকিলের মুখে শুনেছি, মিশিরজি মকদ্দমা বুঝতেনও ভাল। মোটামুটি আইনের জ্ঞান ছিল, তা ছাড়া বিপক্ষকে জেরা করবার এমন সব ঘাঁত-ঘোঁত বলে দিতে পারতেন যে, অনেক বুদ্ধিমান উকিলেরও তাক লেগে যেত। সুতরাং মকদ্দমাতেও মিশিরজিকে স্বপক্ষে টানবার জন্য চেষ্টা করত অনেকে। এ বিষয়ে খুব সুনাম ছিল তাঁর। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ সব করে তাঁর কি লাভ হয়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, সময় কাটে। কিন্তু তিনি কখনও সবলের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। যার কেস কম-জোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিসের বিষ-দৃষ্টিতে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে। উকিলরাও, বিশেষ করে নূতন উকিলরা, খুব সমীহ করত তাঁকে। সাধারণতঃ যে সব উকিলের মক্কেল জুটত না তাঁদেরই নিযুক্ত করতেন তিনি। দরকার হলে কোনও নামজাদা উকিলের পরামর্শ যে না নিতেন তা নয়, কিন্তু মকদ্দমার সম্পূর্ণ ভার থাকত নূতন উকিলটির উপর। পরে যাঁরা নামজাদা উকিল হয়েছিলেন তাঁরাও প্রথম জীবনে মিশিরজির সাহায্য পেয়েছিলেন, সুতরাং সে মহলেও মিশিরজির খুব খাতির ছিল। একবার এক উকিল কমিশন দিতে চেয়েছিলেন, তাঁকে। মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমাকেও অনেক রোগী পাঠিয়েছেন তিনি মফস্বল থেকে। মফস্বলের নিরীহ রোগীদের কাছে আমার সব অত্যুক্তি করতেন যা শুনে আমি লজ্জিত হতাম। আমি নাকি খুন পরীক্ষা করে তড়াক্‌সে (চট করে) সমস্ত রোগ নির্ণয় করে ফেলতে পারি। মাঝে মাঝে অপ্রস্তুতও হতে হত। একবার তাঁর প্রেরিত এক রোগী এসে বলল যে, তার রক্ত পরীক্ষা করে বলে দিতে হবে তার শ্বশুরের রক্তে কোনো দোষ আছে কিনা! বললাম, আমি তা পারব না। কিন্তু লোকটা না-ছোড়। বলল, মিশিরজি যখন বলে দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আপনি পারবেন। ফী যা লাগে আমি দেব, কাজটা করে দিন। বললাম, তোমার শ্বশুরকেই পাঠিয়ে দাও। সে বলল, তিনি থাকলে তো নিয়েই আসতাম। কিন্তু তাঁর নামে সম্প্রতি হুলিয়া বেরিয়েছে বলে তিনি কোথায় যে আত্মগোপন করে আছেন তা কেউ জানে না। বললাম, তা হলে আমি পারব না।

পরদিন চম্পা মিশিরকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হল সে।

চম্পা মিশির এসেই আমাকে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন, খুন লে লিজিয়ে ডাক্‌টার সাহেব।

আমি পুনরায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু চম্পা মিশির হাত তুলে ঈষৎ অধীরভাবে যা বললেন তার ভাবার্থ--আমি এ বিষয়ে পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি রক্তটা তো আগে নিয়ে নিন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভাসারম্যান টেস্টের জন্য নিলাম খানিকটা রক্ত।

মিশিরজি লোকটার দিকে ফিরে বললেন, ফিস্ রাখ্‌খো। লোকটি একটি একশ' টাকার নোট আমার সামনে রাখল। আমি আবার বলতে যাচ্ছিলাম যে, একশ' টাকা এর ফী নয়। মিশিরজি আবার হাত তুলে বারণ করলেন আমাকে। আদেশের ভঙ্গিতে আবার বললেন, উঠা লিয়া যায়। তুলে নিলাম নোটটা।

মিশিরজি তখন সেই লোকটার দিকে ফিরে বললেন, অব তুম্ যাও।

চলে গেল সে।

তখন আমি মিশিরজিকে বললাম, আপনি যা বলছেন তা তো করা অসম্ভব। ওর রক্ত দেখে ওর শ্বশুরের—

মিশিরজি বললেন, আপনি ওরই রক্তে দোষ আছে কি না দেখুন। কিন্তু রিপোর্ট দেবেন পি. সিং—এই নামে। ওর নাম প্রয়াগ সিং, ওর শ্বশুরের নাম প্রাণেশ্বর সিং।

আমি বললাম, এ রকম চাতুরীর অর্থ কি !

মিশিরজি তখন যা বললেন তার ভাবার্থ হচ্ছে, এ লোকটির ছেলে হয়ে হয়ে মরে যাচ্ছে। সিভিল সার্জন বলছেন—হয় এর রক্তে, না হয় এর স্ত্রীর রক্তে, কিংবা উভয়েরই রক্তে সিফিলিসের বিষ আছে। কিন্তু এরা দুজনেই হলফ করে ঘোষণা করেছে যে এদের চরিত্র স্ফটিকের মতো নির্মল। ওর স্ত্রী তো রক্ত পরীক্ষাই করাতে চায় না। যদি কিছু বেরিয়ে পড়ে, ভয়ানক কলঙ্ক রটে যাবে একটা। মানী বংশ ওদের। সব দিক বাঁচাতে হবে। তখন আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা খেলে গেল। পলাতক খুনী শ্বশুরের ঘাড়ে দোষটা চাপালে সব দিক রক্ষে হয়। এ ছোকরার রক্তে দোষ পাবেন আপনি কারণ ও বাইরে সাধু সেজে থাকে, কিন্তু আমি জানি, ও ডুব দিয়ে জল খায়। আপনি রিপোর্ট দেবেন পি সিং—এই নামে।

বললাম, কিন্তু একশো টাকা তো আমার ফী নয়।

তা-ও জানি আমি। এটা ওর জবমানা ঝুট বলেছে বলে।

রক্তে দোষ ছিল। চিকিৎসার পর ছেলেও হয়েছিল ওদের। ছেলের অন্নপ্রাশনে আমি নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। গরদের জোড় দিয়ে প্রণাম করেছিল আমাকে প্রয়াগ সিং।

মিশিরজি সম্বন্ধে নানা ঘটনা মনে পড়ছে।

আর একটা ঘটনা বলি। একবার [illegible] বাড়িতে এসেছিলেন। চা দিতে গেলাম, [illegible]

শর[illegible]

তা[illegible] দিতে পারেন।

শরবৎ যখন এল তখন বললেন, আপনি খাবেন না ?

আমার তো চিনি খাওয়ার উপায় নেই। ডায়াবিটিস আছে --

শরবতটি শেষ করে মুখ মুছে বললেন, ইয়ে বাৎ ? চিনি সে আপকো ঝগড়া হ্যায়, আচ্ছা, বিনা চিনিসেই আপকো শরবৎ পিলাউঙ্গা—

তার পরদিন এক ঝুড়ি বড় বড় লেবু নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, এর নাম হচ্ছে শরবতিয়া লেবু। দুটো লেবুর রস গেলে এক গ্লাস জলে দিয়ে দিন, এক গ্লাস শরবৎ হয়ে যাবে চিনি দিতে হবে না। দেখলাম সত্যিই তাই। অবশ্য এত মিষ্টি লেবুও ডায়াবিটিস রোগীর পক্ষে অচল, কিন্তু সে কথা তাকে

বলি নি। পরে তিনি শরবতিয়া লেবুর গাছও একটা দিয়েছিলেন আমাকে। আমার হাতার এক ধারে এখনও আছে বোধ হয় সেটা।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে ডেকেছিলেন একবার।

আমাদের দেখেই হেসে বললেন, চিকিৎসার জন্যে নয়, শেষ দেখা করবার জন্য ডেকেছি। এবার আর মকদ্দমায় জেতবার আশা নেই। মহাকালের শমন এসেছে, যেতেই হবে। ডাক্তারের সার্টিফিকেটে কাজ হবে না—

তারপর একটু থেমে বললেন, যাওয়ার আগে আপনাকে একটা অনুরোধ করে যাচ্ছি, যদি পারেন কিছু ব্যবস্থা করে দেবেন। এখানে রমজান বলে একটা গরিব লোক আছে। ভেড়া আছে তার একটা। ভেড়াটা আগে খুব ভাল লড়ত। রমজান ওকে লড়িয়ে রোজগার করত কিছু। কিন্তু গত দু'বাজিতে হেরে গেছে ভেড়াটা। রমজান বলছে, ও দানা হজম করতে পাচ্ছে না, তাই কম-জোর হয়ে গেছে। এখানে কাছে-পিঠে তো ভাল পশুচিকিৎসক নেই। আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন কিছু? লোকটা গরিব, ওই ভেড়া লড়িয়েই রোজগার করত—

বললাম, আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

[illegible]' দিন পরে খবর পেলাম মিশিরজি মারা গেছেন।

[illegible]লাম ভেড়াটাকে। বাজি জিতেছে যখন, উপকার [illegible]

মনে হচ্ছে, চম্পা [illegible] যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালী [illegible] ভেদ ছিল না যাদের কাছে?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, শরবতিয়া লেবুর গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে। গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।